বাংলাদেশের (১৯৭১-২০০০) মহিলা রচিত ছোটগল্পে নারীজীবনের স্বরূপ

এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. সৌমিত্র শেখর
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক
শরমিন নাহার মৌরী
এম.ফিল. গবেষক
সেশন: ২০০৩-২০০৪
রেজিস্ট্রেশন নং ৪৮৬(পুনঃ)
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

449601

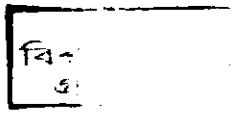

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের (১৯৭১-২০০০) মহিলা রচিত ছোটগল্পে নারীজীবনের স্বরূপ

449601

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, শরমিন নাহার মৌরী, এম.ফিল. গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের নিমিত্তে 'বাংলাদেশের (১৯৭১-২০০০) মহিলা রচিত ছোটগল্পে নারীজীবনের স্বরূপ' -শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটির কাজ আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছে। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা অংশ-বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি / ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

ড. সৌমিত্র শেখর
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা ০১

প্রথম পরিচ্ছেদ ০৪

ছোটগল্প এবং পুরুষতন্ত্র, নারীবাদ: তাত্ত্বিক পটভূমি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৫১

বাংলা ছোটগল্পে নারীজীবন: সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১০৬

মহিলা ছোটগল্পকারদের গল্পে পুরুষের পৃথিবীতে নারী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৫২

মহিলা ছোটগল্পকারদের গল্পে সনাতন নারী ভাবনা বনাম আধুনিকতার দ্বন্দ্ব

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১৭৭

মহিলা ছোটগল্পকারদের গল্পে নারীর নিজের ঘর নিজের পৃথিবী

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ২১১

মহিলা ছোটগল্পকারদের গল্পে নারীর পরিসর: গৃহ ও বাইরের জগতের দ্বন্দ্ব

সপ্তম পরিচ্ছেদ ২৩৭

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে মহিলা ছোটগল্পকারদের গল্পে নারীর আর্থ-সামাজিক জীবন

উপসংহার ২৬০

পরিশিষ্ট ২৬৩

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানবীয় সম্পর্কের দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা টানাপোড়েনই সাহিত্যের, বিশেষ করে কথাসাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়। ছোটগল্পও অনুসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় স্বল্প পরিসরে জীবনের দ্বিধারক্তিম সম্পর্ককে উপজীব্য করে। নারী-পুরুষের সম্পর্ক তাই ছোটগল্পের একটি প্রধান অবলম্বিত বিষয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নারীর অবস্থানকে এখন আগের যে-কোন সময়ের তুলনায় আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আর তাই সাম্প্রতিক কালে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে নতুনভাবে আবিষ্কার ও উপলব্ধি করার চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশের মহিলা ছোটগল্পকারদের গল্পে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কীভাবে উঠে এসেছে তার স্বরূপ অন্বেষণ করাই এই অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য। পুরুষ নারীকে কী চোখে দেখে,কিংবা পুরুষ সম্পর্কে নারীর উপলব্ধি কী, জেণ্ডার বা নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে। সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশেরও ব্যাপক রূপান্তর ঘটে গেছে। নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবন বা অন্যান্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। আকাশ-সংস্কৃতি, তথ্যপ্রযুক্তি, বিশ্বায়ন ও নারী অধিকার আন্দোলনের প্রভাবে বাংলাদেশের নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে নতুন নতুন উপাদান। বাংলাদেশের সচেতন শিক্ষিত নারীরা আগের তুলনায় এখন নিজেদের অধিকার, অবস্থা ও অবস্থান সম্বন্ধে অনেক বেশি সচেতন। এসবেরই প্রভাব কথাসাহিত্যে, বিশেষ করে ছোটগল্পে লক্ষ্যযোগ্য হচ্ছে। পূর্বের তুলনায় এখন যেমন অনেক নারী লেখালেখি বা ছোটগল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করছেন, তেমনি নারীর নিজস্ব বিষয় আশয় বা নারী-পুরুষের সম্বন্ধের নানা দিক তাদের গল্পে অধিক মাত্রায় স্থান করে নিচ্ছে। এখানে সমকালীন নারী লেখকদের ভাবনাসূত্র, নারী-জীবন ও

Dhaka University Institutional Repository

নারী ভাবমূর্তির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মহিলা ছোটগাল্পিকদের গল্পগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে না করে বিষয়বস্তুর আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। সমাজে নানা অসমতার মাঝে নারী-পুরুষ অসমতা প্রকট হয়ে আছে। নারীর অবস্থান সমাজে সামগ্রিকভাবে এখনও অবহেলিত। সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের টানাপোড়েনে নারীকেই দিতে হয় চরম মূল্য। ঐতিহ্যিকভাবেই একজন নারী সনাতনী গৃহকোণের ধারাবাহিকতায় তার মা-চাচীদের দেখে শেখে কিভাবে পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে সমাজের বৃহত্তর পরিসরে তাকে অভিযোজিত হতে হয়। আধুনিক জাতি বা সমাজ গঠনে আগের তুলনায় ইদানিংকালের নারীরা অনেক বেশি সক্রিয়। সভ্যতার ক্রম বিকাশে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদান অনস্বীকার্য। ভারসাম্যপূর্ণ এবং প্রশান্তিময় সমাজ বিনির্মাণে নারী-পুরুষের সহাবস্থান এখন সময়ের দাবী। তাই নারী-পুরুষ উভয়েরই কল্যাণকর ও সহযোগী মনোভাব থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাদের মনো-চিন্তা-চিন্তায় উদার নৈতিকতা বোধ জাগ্রত হলেই একটি সুন্দর পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্র গড়া সম্ভব। সমাজের অর্ধেক অংশ নারী যখন নানা সমস্যায় জর্জরিত হতে থাকে তখন সম্ভব না সমাজের উন্নয়ন কিংবা অগ্রগতি। সমাজের বিচিত্র সনাতনী মূল্যবোধের আর কুসংস্কারের দ্বারা নারী যখন আক্রান্ত হয় তখন কোনো কোনো নারীজীবন নিরবে ঝড়ে যায় আবার কেউবা হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। পরিবারে-সমাজে নারীর এই অবস্থা ও অবস্থান কিংবা তাদের যাপিত জীবনের নানা বিষয়-আশয় বাংলাদেশের মহিলা ছোটগল্পকারদের রচিত ছোটগল্পে তার শৈল্পিক রূপবন্ধে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নারীর আত্মধ্যান বা নারীর এই আত্ম-উন্মেষ মহিলা ছোটগাল্পিকদের গল্পে কিভাবে উঠে এসেছে তা এই অভিসন্দর্ভটিতে তুলে ধরা হয়েছে। নারীর উপর পুরুষের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব সমাজের গভীর শেকড় পর্যন্ত প্রোথিত হয়ে আছে। সময়ের ধারাবাহিকতায় বহু শতাব্দি আগে থেকেই বিকশিত হওয়া ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি বা রাজনীতি নারীর চেয়ে পুরুষকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে ক্ষমতাবান করেছে। এই ক্ষমতাবলেই পুরুষ কর্তৃক নারী হচ্ছে নির্যাতিত। পুরুষ হয়ে উঠছে পৌরুষদীপ্ত আর নারী হয়ে উঠছে নিপিড়িত রমণী। সমাজের পুরুষ দ্বারাই ঠিক করে দেয়া হয় নারীর

Dhaka University Institutional Repository

জীবনাচরণ। সমাজের নিয়মনীতি পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব দ্বারা নির্মিত, নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় নারীরা সহজেই এর শিকার হয়ে যায়। পিষ্ট হয় নারীর জীবনবোধ। আবহমান নারীজীবনের এই রূপ-সৃষ্টিতে মহিলা ছোটগল্পকারদের গল্পগুলো হয়ে ওঠে ঝলসিত আলোক প্লাবন। তাদের লেখায় পুরুষ কি দৃষ্টিতে নারীকে দেখে এবং নারী কিভাবে নারীকে দেখে তা এই অভিসন্দর্ভে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে উঠে এসেছে নারীর সনাতনী ও আধুনিক ভাবনা, নারীর নিজস্ব জগৎ-বর্হিজগৎ, নারীর গৃহ ও বাইরের দ্বন্দ্ব সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বর্তমানকালে নারীর অবস্থা ও অবস্থান। এখানে উঠে এসেছে পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা দ্বারা কিভাবে শৃঙ্খলিত হয় নারী-জীবন, তারই সমাজস্থিত বাস্তব চিত্র। পুরুষের সুযোগ-সুবিধাকে প্রলম্বিত করতেই সমাজে নারী হয় অবহেলিত এবং পুরুষের প্রতিপক্ষ। চিরকালীন নীতি, 'সবলের উপর দুর্বলের নির্যাতন' তা সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের নীতি নির্ধারণের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়। পুরুষ সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করে নারীকে গৃহবন্দী করে, আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করে রেখেছে। আর এ কারণেই ঘটেছে নারীর ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ নিয়েছে সমাজের কর্তৃত্ব এবং নারী হয়ে পড়েছে পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন। নারী-পুরুষ সম্পর্কের এই অসম যাত্রা আর অসঙ্গতি সময়ের প্রেক্ষাপটে রূপায়িত হয়েছে মহিলা ছোট গল্পকারদের গল্পের শরীরে। এ অভিসন্দর্ভটি বাংলাদেশের মহিলা ছোটগাল্পিকদের রচিত ছোটগল্পগুলোরই এক ভিন্ন মাত্রিক অনুভব ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছোটগল্প এবং পুরুষতন্ত্র, নারীবাদ : তাত্ত্বিক পটভূমি

Dhaka University Institutional Repository

ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটি নতুন শিল্পাঙ্গিক রূপে বাংলা ছোটগল্পের যাত্রা শুরু। সাহিত্যের জগতে ছোটগল্প এক নতুন রূপ-সৃষ্টি। ছোটগল্পের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় জীবনেরই খণ্ডাংশ। এটি 'যুগ-যন্ত্রণারই শিল্পিত ফসল'। ছোটগল্পের অবয়ব ছোট হলেও এর আবেদন বহুমাত্রিক। এখানে গল্পকার তার ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটান অত্যন্ত সহজ-সরল ভাব-গাম্ভির্য নিয়ে। মানব জীবনের কোন একটি বিশেষ মুহূর্ত কোন বিশেষ পরিবেশের মধ্য দিয়ে লেখক কিভাবে উপলব্ধি করেন তারই পর্যবেক্ষন এবং বিশ্লেষণের শৈল্পিক প্রকাশ ছোটগল্পে দেখা যায়। ছোটগল্পের ছোট্ট অবয়বের ভেতর দিয়ে জীবনের বিশেষ কোন রূপ-বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে লেখকের শিল্পী কুশলতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

রেনেসাঁস পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের জীবনে যে বহুমাত্রিক রূপ-বিচিত্র জটিলতা দেখা যায় তা সহজেই ছোটগল্পে স্থান করে নেয়। উনিশ শতকের শেষের দিকে ছোটগল্পের শিল্প-আঙ্গিক যথার্থরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট দিকপাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) হলেন ছোটগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের এ যাত্রা পথকে আরও বহুবর্ণিল করতে হেঁটেছেন অনেকেই আর তাঁদের শৈল্পিক লেখনিতে ছোটগাল্পিক ভুবন হয়েছে আজ সমৃদ্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ প্রসূত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, রহস্যময়তা এবং সূক্ষ্মমনস্তাত্তিক জটিলতার শিল্পিত বিকাশ দেখা যায় ছোটগল্পগুলোতে। এর সার্থক প্রবর্তক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেই ঘটে বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহাসিক মুক্তি। ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলার গ্রাম পর্যায় যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয় তার প্রভাব এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদ এই দু'য়ের সম্মিলনের ফলে বাংলার সংস্কৃতিতে দেখা দেয় এক নতুন জীবনবোধ, তারই প্রভাবে ছোটগাল্পিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকে তরান্বিত করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভিখারিনী' গল্প দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটগাল্পিক হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। এই যাত্রার শেষ-অবধি তিনি লিখেছেন অসংখ্য ছোটগল্প। তাঁর ছোটগল্পের ভেতর ছিল 'মানবজীবনের আনন্দ-বেদনা আর সংগ্রাম-সংক্ষোভের ছবি'। জীবনবোধ ও শিল্পরীতিতে তিনি ছিলেন অনন্য। বাংলা ছোটগল্পের জগতে তিনিই প্রথম আধুনিক শিল্পী। যাঁর লেখনির শানিত ধারায় বাংলা ছোটগল্পের দৃষ্টিকোণ, পরিচর্যা, ভাষারীতি এবং প্রকরণ-প্রকৌশলে ঘটে উজ্জ্বল মুক্তি। রবীন্দ্র-ছোটগল্পের 'মটিফ' অর্থাৎ শিল্প-উপাদান ও প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁর সতর্ক ছোটগাল্পিক প্রতিভার চারিত্র্যনির্দেশক। তাঁর ছোটগাল্পিক ভাষাশৈলীও এক অনন্য কৃতির স্বাক্ষর। রবীন্দ্রনাথের পথ ধরে অনেকেই ছোটগল্পের জগৎকে করেছেন অনিবার আলোকিত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), প্রথম চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯০৫), তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) প্রমুখ ছোটগল্পকারগণ ছোটগাল্পিক হিসেবে প্রত্যেকেই তাদের নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন।

উনিশ্‌শ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ; বাংলাদেশের সাহিত্য-বিশেষ করে ছোটগল্পের অন্তর্লোকে এনেছে এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন। স্বাধীনতাত্তোর বাংলা ছোটগল্পের ভূবনকে ঋদ্ধ করেছেন অনেক মহিলা ছোটগাল্পিকও। তাঁদের আবির্ভাব ছিল সুসংহত এক অনুভূতির সঞ্জীবন। জীবন চেতনায় যাঁরা ছিলেন অগ্রগণ্য। বিষয় বৈচিত্র আর শৈল্পিক-উৎকর্ষে যাঁদের লেখা আত্ম জাগরণে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে তারা হলেন, মালিহা খাতুন, হেলেনা খান, মাফরুহা চৌধুরী, রাবেয়া খাতুন, মকবুলা মন্‌জুর, খালেদা এদিব চৌধুরী, জুবাইদা গুলশান আরা, ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ, নাসরীন জাহান, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, রিজিয়া মাহবুব, লায়লা সামাদ, হেলেনা খান, রাজিয়া মজিদ, দিলারা হাশেম, সেলিনা হোসেন, পূরবী বসু, ঝর্ণা রহমান, পাপড়ি রহমান,

Dhaka University Institutional Repository

অনামিকা হক লিল, নাজমা জেসমিন চৌধুরী প্রমুখ ছোটগাল্পিকগণ। ঋদ্ধিক এই ছোটগাল্পিকদের লেখনিতে ধরা পরে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে চিত্রিত অবয়বে নারীজীবন। তাদের রচনাশৈলীর শৈল্পিক ভাব-ভাষা-আঙ্গিক-প্রকরণ-ঘটনার অনুষঙ্গ সর্বক্ষেত্রেই রয়েছে শিল্পিত ব্যঞ্জনার উদ্ভাসন।

একাত্তরের যুদ্ধোত্তর ছোটগল্পে দেখা যায়, জীবন-জটিলতার শাব্দিক রূপায়ণ। জীবন-জিজ্ঞাসার এক নতুন রূপচিত্র। এ সময়কার ছোটগল্পে উদ্ভাসিত হয়েছে মানব-মনের বিচ্ছিন্নতাবোধ, একাকিত্ব, নর-নারীর মূল্যবোধের বিচিত্রতা, ব্যক্তিত্বের সংঘাত, দাম্পত্যজীবনের নৈরাশ্যময়তা, নারীর একাকিত্ব, ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহ, অহংবোধ, নারী সত্তার মুক্তি সাধনা, প্রচলিত প্রথা আর ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী নারীর নিরব বিদ্রোহ।

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে দেখা যায়, আদিম কাল থেকেই চলে আসছে মানুষের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। এ লড়াই প্রথমে ঘটে প্রকৃতির সাথে, তারপর পশু-পাখির সাথে। এরপরই আসে মানুষে-মানুষে দ্বন্দ্ব। এসব যুদ্ধ শেষে ঘরে ফিরে পুরুষ দেখে তার সমান জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন একই প্রজাতির মানুষ অর্থাৎ নারী। শুরু হয় পুরুষের অস্তিত্ব ও বড়ত্ব প্রমাণের বিভিন্ন কৌশল। পুরুষ তখন নারীর জন্য সৃষ্টি করে নানা আইন-কানুন-শৃঙ্খলা-নিয়ম-নীতি। অস্তিত্ব রক্ষার এ লড়াই চলতে থাকে মানব-জীবনের বিবর্তনের ধারায় অজ্ঞাতে-অলক্ষে। বিকির্যমান এই ধারায় এক সময় নারীরা লক্ষ করে পুরুষ বলয় তাকে কতটা ঘিরে আছে। যুগে যুগে এ বলয় ভাঙ্গার জন্য কিছু মুক্ত হৃদয়ের নারী চিন্তা করে স্বাধীনভাবে পথ চলার। অবশ্য কিছু কিছু নারী এ বলয়িত নিয়ম-নীতি আত্মস্থ করে নেয় পুরুষ কর্তৃক বিনির্মিত সমাজ ব্যবস্থা-প্রবর্তিত সংস্কার অনুযায়ী। এ শিক্ষা যুগ-পরম্পরায় পারিবারিক গণ্ডিতে বড় হওয়ার সময়ই অতি যত্নসহকারে হাতে-কলমে সনাতন নিয়ম অনুযায়ী শিখে নেয় একজন নারী। সনাতনী গৃহকোণ-ই একটি নারীকে জড়িয়ে ফেলে আষ্টে-পৃষ্ঠে, ভাব-ভাবনায়, চিন্তা চেতনায়। পারিবারিক উদ্যোগেই একটি নারীকে পঙ্গু বানানো

Dhaka University Institutional Repository

হয় মানসিকভাবে। তাকে শেখান হয় না স্বনির্ভরতা অর্জনের দৃপ্ত বাণী। পরিবারে মেয়ে শিশুকে পাশ কাটিয়ে প্রাধান্য দেয়া হয় ছেলে শিশুকে। তাই ধীরে ধীরে মেয়ে শিশু হারিয়ে ফেলে তার অহংবোধকে, ভুলে যায় তার স্বকীয় অস্তিত্বকে। নারী হয় তখন, কোমল-অবলা-শিশুসুলভ-পরনির্ভরশীল-সেবিকা-সহনশীল-ইত্যাদি নানা ধরণের বিশেষণে বিশেষায়িত। পুরুষ কর্তৃক এগুলো নারীকে দাবিয়ে রাখার নানা কৌশল। নারীর স্থান গৃহে নির্দিষ্ট করে দিয়ে তার জীবনকে করে তোলে পুরুষ কেন্দ্রিক। জন বার্জারের ভাষায়ঃ

> 'পুরুষ দেখে নারীকে। নারী নিজেকে দেখে দ্রষ্টব্য হিসেবে। নারীর নিজের মধ্যেও দর্শক তাই পুরুষ; নারী দর্শনীয়। নারী এভাবে নিজেকে রূপান্তরিত করে একটি বস্তুতে আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে একটি দর্শনীয় বস্তুতে, একটি দৃশ্যে.....।[১]

নারীর সামাজিক প্রেক্ষাপটে এভাবেই বিলুপ্ত হয় তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। নারী হয়ে যায় পুরুষের অবোধ্য শক্তিরাশির ক্রীড়নক। নারী সৃষ্টি করতে পারেনি নারীর নিজস্ব মূল্যবোধ। নারীর স্বকীয়তা অর্জনে বাঁধা দিয়েছে পুরুষ কর্তৃক প্রবর্তিত সামাজিক-রাষ্ট্রিক নিয়ম-কানুন-আইন। তাইতো যুগ-যুগান্ত ধরে পরাধীনতার শেকলে বন্দি হয় নারী। জীবনের স্পন্দন নিয়েইতো গড়ে উঠে সমাজ। আর এই সমাজ সমগোত্রীয় এবং একই শারীরিক গঠন সম্পন্নদের মধ্যেই গড়ে ওঠে। সমাজের উৎপত্তি তাই জীবনের উৎপত্তিরই মাঝে নিহিত। পরিবার হচ্ছে সমাজেরই একটি প্রাথমিক রূপ। সাধারণত দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা সাধারণ একটি বন্ধনে আবদ্ধ থেকে পরিচ্ছন্ন আবেগ দ্বারা চালিত হয়ে সৃষ্টি করে অন্তরঙ্গতা। এরই ধারাবাহিকতায় পিতা-মাতা-সন্তান চক্রের আবর্তনে গড়ে ওঠে পরিবার। তৈরী হয় কিছু রীতি-নীতি নৈতিকতা আচার ব্যবহার। এখানেই বাহ্যিক এবং অন্তর্নিহিত শক্তির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে পুরুষ। সব কিছুর কর্ণধার হয়ে ওঠে পুরুষ। শক্তিশালী-ক্ষমতাধর হতে পুরুষ হয় ক্রমাগত কৌশলী। ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতার অনুভূতির পরিতৃপ্তি পুরুষকে করে তোলে ভয়ংকর। হুমায়ুন আজাদ তাঁর দ্বিতীয় লিঙ্গ' বইতে লিখেছেন :

> 'পুরুষ চেয়েছে কালপরম্পরায় নিজেকে শুধু পুনরাবৃত্ত না করতেঃ চেয়েছে বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ভবিষ্যৎ গড়তে। পুরুষের কর্মকাণ্ড মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে গিয়ে অস্তিত্বকেই একটি মূল্যবোধে পরিণত করেছে; এ-কর্মকাণ্ড আধিপত্য বিস্তার করেছে জীবনের বিভ্রান্ত শক্তিগুলোর ওপর; এটাই পরাভূত করেছে প্রকৃতি ও নারীকে।'[২]

এভাবেই সমাজে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে পুরুষ। নারীর সমস্ত অযোগ্যতাই পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট। পুরুষ হচ্ছে একটি পরিবারের প্রধান। পরিবার-সমাজের ক্ষমতাধর ব্যক্তি। যে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে অন্যান্য সদস্যদের। এ নিয়ন্ত্রণের পথ ধরেই গড়ে ওঠে পিতৃতন্ত্র আর পিতৃতন্ত্রের আইনি বলয় দিয়ে সৃষ্ট হয় পুরুষতন্ত্র। আদিকাল থেকেই পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রধান পুরুষের একনায়কত্বের অধীনে সবাই ও সবকিছু পরিচালিত হয়। স্ত্রী-সন্তান-সম্পদ-সম্পত্তি-বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব বিষয়য়ের উপরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে পুরুষ কর্তাটি। তার আদর্শিত নিয়ম-নীতিতেই প্রতিষ্ঠিত হয় পুরুষতন্ত্র বা পুরুষতান্ত্রিকতা। নারীকে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি সম্ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এই পুরুষতান্ত্রিকতা। ফলে নারী তার বিস্তৃত জীবন থেকে বিযুক্ত হয়ে স্থান করে নেয় প্রথাগত সংকীর্ণতায়। তাই পুরুষতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়েই টিকিয়ে রাখা হয়েছে পুরুষাধিপত্য ও নারীর-অধীনতা। নারীর কর্মজীবন-মন-মননশীলতা-চিন্তা-চেতনা-সমাজ-জীবন, আর্থিক-রাষ্ট্রিক-শিল্প-সংস্কৃতি সব কিছুতেই রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক নিয়ম-নীতির সরব উপস্থিতি। নারীর সার্বিক অবস্থা পরিবেষ্টিত করে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক আবর্তন। পুরুষ তার একাধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে নারী-জীবনের সর্বক্ষেত্রে। পুরুষই সমাজে সক্রিয় জীব হিসেবে নিজেকে পরিচালিত এবং পরিগণিত করে। 'পুরুষ অধিপতি, নারী তাই নির্যাতিত। যখন আদর পায় তখনো আধীনেই থাকে এবং

Dhaka University Institutional Repository

অর্জনের মাপকাঠি পুরুষই ঠিক করে দেয়। নারীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয়ের পর তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হয়েছে; সভ্যতা অগ্রসর হয়েছে কিন্তু নারী-পুরুষের বৈষম্য ঘোঁচেনি, অনেক সমাজে বৃদ্ধি পেয়েছে। অগ্রসর ইউরোপে ফরাসি বিপ্লব মানবমুক্তির ইতিহাসে একটি মাইলফলক, কিন্তু বিপ্লবের পরে ১৭৯৩-তে যে শাসনতান্ত্রিক সম্মেলনে মানুষের সর্বজনীন অধিকার স্বীকৃতি পেলো তাতে মেয়েদের ব্যাপারে কিছুই বলা হল না। ১৮৬৭-তে ইউরোপের কোথাও কোথাও এবং আমেরিকায় সর্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু সেটা শুধু পুরুষদের জন্যই, মেয়েরা তখনও ওই অধিকার পায় নি। ১৮৭১-এর প্যারিস কমিউনিটিতেই প্রথম দেখি নারী ও পুরুষ সমান গুরুত্ব পাচ্ছে। ইংলন্ডে মেয়েরা ভোটাধিকার পায় ১৯১৮-তে, তাও সীমিত সংখ্যায়। ১৯২৮ সালে পৌঁছে তবেই সেখানে ২১ বছর ও তার উপরের মেয়েরা ভোটাধিকার পেলো। ভারতে এই অধিকার মেয়েরা পেয়েছে ১৯৫০-এ, বাংলাদেশে আরো বিশ বছর পরে, ১৯৭০-এ।'[৩] পুরুষকেই মনে করা হয় সমাজের বার্তাবাহক। পুরুষই সমাজের সর্বত্র শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে। বস্তগত সমস্ত ক্ষমতাই পুরুষ তার অস্তিত্ব রক্ষাকল্পে আইনগত বিধিবিধান দিয়ে করায়াত্ত করে রেখেছে। সে সর্বত্র বিচরণ করে স্বতন্ত্র সচেতন সত্ত্বা হিসেবে। পুরুষতান্ত্রিকতার শেকড় তাই প্রোথিত রয়েছে প্রকৃতির গভীরতায়, আদি ও অনাদি দেবতার সমীকরণে। নারীকে প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল এবং অধীনস্ত মনে করে পুরুষ বা পুরুষতন্ত্র। তাইতো দেখা যায়, পুরুষতান্ত্রিক মেরুকরণে নারীর সামাজিক প্রেক্ষাপট নারীকে ক্ষমতাহীন করে দিয়েছে। নারীর আত্মপরিচয়ের যে অনিবার্য রূপ তা হয়েছে ভুলুণ্ঠিত। প্রকৃতিগতভাবে অর্থাৎ জৈবিক কারণেই কেউ পুরুষ বা কেউ নারী হয়ে জন্মায়। যৌন ও পুনরুৎপাদনের এই পার্থক্য ছাড়া নারী-পুরুষ সর্বক্ষেত্রেই সমান। সমাজ ও সংস্কৃতি নারী-পুরুষের মধ্যে কিছু বিভেদকারী বৈশিষ্ট্য আরোপ করে নারীকে করে রেখেছে পুরুষের অধীন। সমাজ এই সামাজিক লিঙ্গকে বৈষম্যের প্রাচীরে আবদ্ধ করে নারী এবং পুরুষে পরিণত করেছে। এসব লিঙ্গীয় পার্থক্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক সৃজিত:

Dhaka University Institutional Repository

'পুরুষতন্ত্র নারীকে নিয়োগ করেছে একরাশ ভূমিকায় বা দায়িত্বে। নারীকে নিয়োগ করেছে কন্যা, মাতা, গৃহিনীর ভূমিকায়; এবং তাকে দেখতে চায় সুকন্যা, সুমাতা, সুগৃহিনীরূপে।'[৪]

সাধারণভাবে পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্র বলতে পরিবারে পিতা বা বয়োজেষ্ঠ্য পুরুষের শাসনকেই বুঝে থাকি। তবে বর্তমানে অবকাঠামগতভাবেই শব্দটির পরিবর্তন ঘটে গেছে। পুরুষতন্ত্র শব্দটিকে এখন একটি সামাজিক ব্যবস্থা বা একটি আদর্শবাদ মনে করা হয় যেখানে পুরুষদেরই শ্রেষ্ঠ বা আদর্শ বলে দাবী করা হয়। তারাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয় অর্থাৎ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি-এমন কি সমাজের নারীও কিভাবে পরিচালিত হবে সে সিদ্ধান্ত এককভাবে পুরুষই গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে। নারীকে তারা জড় বস্তুতে পরিণত করে সম্পদ মনে করে থাকে। অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক কর্মকাণ্ডে, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। পুরুষতান্ত্রিক আদর্শবাদে প্রণোদিত হয়ে এভাবেই সমাজ সৃষ্টি করে লিঙ্গিয় বৈষম্য। সমাজ বেঁধে দেয় মেয়েলী ও পুরুষালী বৈশিষ্ট্য। শুধু নারীর উপরই বেঁধে দেয়া হয় ধর্মীয় অনুশাসন। সমাজই নারী-পুরুষের স্বভাবের উপর কতিপয় বৈশিষ্ট্য আরোপ করে 'পৌরুষ' বা 'নারীত্ব' কিংবা 'পুরুষ সুলভ' 'নারীসুলভ' আখ্যা দিয়ে থাকে। এসব লৈঙ্গিক রাজনীতি সর্বজনীন স্বীকৃতি পায় সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে। পুরুষতন্ত্রের ভাব-ভাবনা হুমায়ুন আজাদ তাঁর বইতে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন:

'পুরুষতন্ত্র আপন স্বার্থে লিঙ্গ-অনুসারে পরিকল্পিত বিশেষ ছকে বেঁধে দিয়েছে নারী-পুরুষের ব্যক্তিত্বকে; স্থির হয়ে গেছে যে পুরুষ হবে আক্রমনাত্মক, বুদ্ধিমান, বলশালী ফলপ্রদ, আর নারী হবে নিষ্ক্রিয়, মূর্খ, বশমানা, সতী ও অপদার্থ। এর প্রকাশ দেখা যায় নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক ভূমিকায়। পিতৃতন্ত্র তাদের জন্যে তৈরী করেছে বিশদ বিধিমালা, স্থির ক'রে দিয়েছে কিভাবে আচরণ করে নারী-পুরুষ: কেমন অঙ্গভঙ্গি করবে, ও পোষণ করবে কি

Dhaka University Institutional Repository

প্রবনতা। স্থির করে দিয়েছে যে নারী দেখবে ঘরসংসার, পালন করবে সন্তান; আর পুরুষ অর্জন করবে অন্যান্য সাফল্য। এতে নারী রয়ে গেছে পশুর স্তরেই, পশুরাও সন্তান লালন-পালন করে; আর পুরুষ উন্নীত হয়েছে মানুষের স্তরে; যে-সব কাজ বিশেষভাবেই মানবিক, তা সবই রাখা হয়েছে পুরুষের জন্যে। পুরুষকে দেয়া হয়েছে উচ্চ অবস্থান, যা তাকে করেছে প্রভু; আর তার ভূমিকা যেহেতু প্রভুর তাই তার মেজাজও হয়ে উঠেছে প্রভুর অর্থাৎ আধিপত্যবাদী।'[৫]

সমাজের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় প্রাধান্য বিস্তার করে আছে পুরুষতন্ত্রের পরাক্রমশালী আধিপত্যবাদ। পিতৃতন্ত্রের এই সামাজিক ব্যবস্থা এতই শেকড়স্থিত যে, তা নারী নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই আত্মস্থ করে নেয়। প্রতিবাদ করার মত স্পর্ধা নারী দেখাতে পারে না। এই সুযোগ গ্রহণ করেই পুরুষ ধৃষ্টতাপূর্ণ নির্যাতন চালায় নারীর উপর। নারীর মানবিক অস্তিত্ব হয়ে পড়ে হুমকির সম্মুখীন। নারীর বুদ্ধি-মন-মনন বা মানস্ বিকাশকে করে দেয় স্তব্ধ। নারীকে শোষণ করা, নারীর উপর প্রভুত্ব করার জন্যই সৃষ্টি হয় পুরুষতন্ত্র বা পুরুষতান্ত্রিকতা। তাই পুরুষের স্বার্থকে সমুন্নত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট বিধি-বিধানই হল পুরুষতন্ত্রঃ 'জন-জগৎ (Public world) এবং ব্যক্তি-জগৎ (Privat world) উভয়ের উপর পুরুষের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকে পিতৃতন্ত্র আখ্যা দেওয়া যায়। পিতৃতন্ত্র এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে পুরুষ নারীর উপর প্রভুত্ব করে, নরীর উপর নির্যাতন চালায় এবং নারীকে শোষণ করে। (A system of social structures and practices in which men dominate, oppress and exploit women.")– Sylvia Walby, Theorising Patriarchy.

পিতৃতন্ত্রের মূল মতাদর্শ এই যে, "নারী পুরুষের পরে, পুরুষ থেকে এবং পুরুষের জন্য সৃষ্ট পুরুষের অধীন একটি নিকৃষ্ট জীব"। (Women was made

Dhaka University Institutional Repository

after man, of man and, for man, an inferior being, subject to man.")। Elizabeth Cady stanton, the Woman's Bible

পিতৃতন্ত্রের ভিত্তি পুরুষ প্রাধান্য। সমাজের সর্বক্ষেত্রে পুরুষ প্রভুত্ব বিস্তার করে রেখেছে এবং নারীকে অধস্তন ভূমিকা পালন করতে বাধ্য করেছে। পিতৃতন্ত্র এমন পরাক্রমশালী যে নারী সকল নির্যাতন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে; সকল নির্যাতন নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়ে প্রতিবাদ থেকে বিরত থেকেছে। নারীর এই জবরদস্তি মান্যতাকে আপাততঃ সম্মতি ধরে নিয়ে পুরুষ তার উপর নির্যাতন চালায়।'[৬]

মূলতঃ নারী নির্যাতন করার স্থির ধারণা নিয়েই পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব। নারীকে অবহেলা করা, দমিয়ে রাখা, দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ রাখা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সীমাবদ্ধ করা, সামাজিক-আর্থিক আচার-আচরণে অংশ গ্রহণ করতে না দেয়া সবই পিতৃতন্ত্রের সক্রিয় এক তীর্যক বার্তা। পুরুষতন্ত্রের মূলমন্ত্রই হল জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীকে অধিনস্ত করে রাখা। এই-সবকিছুর ভিত্তির গভীরে প্রোথিত আছে যে বাণী তা হল পুরুষ প্রাধান্য। যুগে যুগে তাই কেবলই উচ্চারিত হয়-সরবে কখনো নিরবে পুরুষ-ই শ্রেষ্ঠ, পুরুষই উত্তম। নেতৃত্ব প্রভূত্ব তাদেরই। বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবী খুব দ্রুত সব মানুষের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে গেছে। আজকাল ঘরে বসেই জানা যাচ্ছে পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় তাই নারীকে হতে হবে একাত্ম। কারণ নারীরাই তাদের জন্য রুদ্ধ করে দেয়া দ্বার উন্মোচিত করতে পারছেনা তাদের নিজেদের ঐক্যের অভাবে। নারীর শত্রু কিংবা নির্যাতনকারী শুধু যে পুরুষ একা তা নয়, পুরুষতান্ত্রিকমন্ত্রে দীক্ষিত একপাল নারীও এ জন্য দায়ী। ঐতিহ্যিকভাবেই নারীরা তাদের অজ্ঞাতসারেই এ প্রবণতার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। দেখা যায়, একটি পরিবারে যখন একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয় তখন খেলার সরঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্র থেকে শুরু করে তাদের খাওয়া-দাওয়া শিক্ষা-সামাজিক রীতি-নীতি পালন, ব্যবহারিক জীবন-যাপনের সর্বক্ষেত্রেই এর প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। খেলনা হিসেবে ছেলেটিকে দেয়া হয় বল, গাড়ী, প্লেন, বন্দুক ইত্যাদি পাশাপাশি

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েটাকে দেয়া হয় হাড়ি-পাতিল, পুতুল ইত্যাদি। শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা হয় ছেলেটি পরবর্তী জীবনে সংসার দেখবে বংশ পরম্পরা ধারাটি ধরে রাখবে সুতরাং ছেলেটির জন্য শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবার পালন করে নেতিবাচক ভূমিকা। তাদের মতে মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে চাকুরী করে সংসার চালাবে না। কিংবা বংশ রক্ষায়ও তাদের কোন গুরুত্ব নেই। বিয়ে হলে চলে যাবে অন্যের ঘরে। সুতরাং মেয়েদের শিক্ষার জন্য কোন সম্পদ নষ্ট করা যাবে না। মেয়েদের জন্য ঘরের চার দেয়ালে বন্ধিত্ব নির্দিষ্ট হয়ে যায়। পরিবারের খাওয়া-দাওয়া ক্ষেত্রেও ছেলে মেয়ের মধ্যে বৈমষ্য করে। খাবার ক্ষেত্রে বড়টা, ভালটা কিংবা বেশির ভাগ অংশ দেয়া হয় ছেলেকে আর মেয়ের জন্য বরাদ্ধ থাকে খাবারের খারাপ এবং ছোট অংশ যার কারনে ছেলেটি শারীরিকভাবে সুস্থ ও বলশালী হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে মেয়েটি হয় রুগ্ন এবং অপুষ্ট। সামাজিকভাবে ছেলেটির বিরচণ ক্ষেত্র থাকে সর্বত্র অন্যদিকে মেয়েটিকে বরণ করতে হয় গৃহের চার দেয়ালে বন্দীত্ব জীবন। জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা উন্মোচন করতে ছেলেটিকে উৎসাহিত করা হয় অপরদিকে মেয়েটির জন্য তা ধরা বা চিন্তা করাও হয় নিষিদ্ধ। নারীর প্রতি এই যে প্রথা, নীতি, বিধি-বিধান যুগ-যুগান্ত ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে। 'সেই আদি-গুহামানবের যুগ থেকেই নারীর শ্রেণী মর্যাদার উগ্র বিচ্যুতি ঘটে, পুরুষের স্থান হয় নারীর উপরে, তৈরি হয় 'পুরুষ/ নারী' যুগ্ম- বৈপরীত্যটির। এই যুগ্ম- বৈপরীত্য গ্রাহ্য করে ভাষায় ক্রমাগতভাবে আরো অনেক কাঠামোগত যুগ্ম- বৈপরীত্য স্থান করে নেয় এবং প্রতিটি যুগ্ম- বৈপরীত্যে নারী হয় অবেহেলিত। সূর্য পুরুষ হলে নারী চাঁদ; আলো যদি হয় পুরুষ, তবে নারী অন্ধকার; পুরুষের স্থান যদি হয় উপরে, নারী থাকবে নিচে; বাহির যদি হয় পুরুষের তবে ঘর হবে নারীর,- এমন সব ভাষাকেন্দ্রিক যুগ্ম- বৈপরীত্য নারীকে অবহেলা করেছে বারবার। আমরা যে আদি-সাম্যবাদী সমাজের চিন্তা করি, যেখানে ছিল সম্পদের সুষম বন্টন, সেখানেও 'নারী' হয়ে গিয়েছিল 'প্রথম সম্পদ'; কারণ যে পুরুষের শক্তি ছিল বেশী, তার নারীকে স্পর্শ করার ক্ষমতা অন্য কারো ছিল না। আসলে নারী সম্পদ হয়েছিল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি যৌনতাকে কেন্দ্র করে। যৌন- ক্রিয়ার সময় নারীর অবস্থান,

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষাঙ্গ দিয়ে নারীকে বিদ্ধ করার ক্ষমতা ইত্যাদি ছিল প্রাথমিকভাবে নারীর শ্রেণীমর্যাদা পতনের প্রধান কারণ। ভাষার বিবর্তনের সাথে সাথে, সেই আদিম যুগ্ম-বৈপরীত্যগুলোর প্রসার ঘটে এবং নারী আর কখনো তার সামাজিক মর্যাদা উদ্ধার করতে পারেনি। কখনো-সখনো নারী দেবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বটে, কিন্তু তা হয়েছে আদিম যাদু- বাস্তবতার (magic realism) ফলে। আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন একটি নারীর গর্ভ থেকে অন্য এক নারী বা পুরুষের জন্মগ্রহণের বিচিত্র চিত্র দেখত, তখন তা তাদের জন্য এক ধরণের যাদুবিদ্যাজাত উপলব্ধি নিয়ে আসত,এবং পরবর্তীকালে নারীকে তারা গ্রহণ করত একজন জীবনরক্ষাকারী সত্তা হিসেবে, মা হিসেবে। কখনো যৌন উত্তেজনায় তারা নারীকে আনত স্বপ্নের চরিত্র হিসেবে, দেবী হিসেবে। আমরা দেবী হিসেবে ভেনাস, আফ্রোদিতি, দুর্গা, কালী এবং অন্য যে সত্তাগুলোকে চিহ্নত করেছি, তা আসলে এক ধরনের কামনা/ বাসনা কিংবা যাদুবিদ্যাজাত উপলব্ধির ফসল।'[৭] সনাতনী এই প্রথার সাথে একাত্ম হয়ে নারী-পুরুষের আভিধানিক অর্থও শাব্দিক আকার পায় এরকমভাবে-

মহিলা-অর্থ (বি.) নারী; (বাং) ভদ্র বা সম্ভ্রান্ত রমণী এখানে 'রমণী' শব্দটি এসছে 'রমণ' থেকে। যার অর্থ রমণ$_১$-ক্রীড়া, কেলি, প্রমোদ-বিহার; মৈথুন, রতিক্রিয়া। রমণ$_২$- পতি, বল্লভ (রাধারমণ), কন্দর্প। যেখানে কন্দর্প অর্থ মদন, কামদেব, রমণের বিশেষণ হল প্রিয়, সন্তোষ বিধায়ক। এখানে 'সন্তোষ বিধায়ক' অর্থাৎ সন্তুষ্টি বিধানকর্তা বা সম্পাদনকারী বা ব্যবস্থাপক-এ শব্দগুলো দিয়ে কেবল পুরুষের আধিপত্যই নির্দেশ করে। অন্যদিকে 'রমণ' থেকে যে 'রমণী' শব্দটির উৎপত্তি তার অর্থ হয় সুন্দরী, নারী, পত্নী, (বিণ.) প্রিয়া, সন্তোষ বিধায়িত্রী । এখানে 'রমণী' দ্বারা শুধুই একজন সাধারণ নারীকে প্রকাশ করা হল। তার সাথে কোন ক্ষমতার ব্যবহার থাকল না। সে হবে শুধুই পুরুষের মনোরঞ্জনকারী। ঠিক এরকমই- 'নর$_২$' অর্থও হয় মানুষ, পুরুষ মানুষ, ঋষিবিশেষক কিন্তু 'নারী' অর্থ হল, রমণী, স্ত্রীলোক, পত্নী, পর-নারী এবং 'নারীধর্ম' মানে সতীত্ব, মমতা, বাৎসল্য-প্রভৃতিগুণের আধিক্য।

Dhaka University Institutional Repository

একটি নারীর সাথে 'সতীত্ব' জুড়ে দেয়া হয় কিন্তু এই 'সতী' বা 'সতীত্ব' শব্দগুলো পুরুষ শব্দটির সাথে নেই। 'নরদেব'-হল মানুষরূপী দেবতা, ব্রাহ্মণ। 'নরপুঙ্গব' অর্থ-মানবশ্রেষ্ঠ কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে এসব শব্দের অবতারণা হয় না। পুরুষ নিজেই বলছে সে মানব জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠত্ব যেন জগতের জন্ম লগ্ন থেকে শুধু তারই প্রাপ্য। আবার 'নর সমাজ' হল মানুষের সমাজ, মানব-সম্প্রদায় কিন্তু 'নারী সমাজ' মানে হল শুধুই 'নারীগণ'। নারীর তাই নেই কোন সমাজ বা সম্প্রদায়, নারী শুধুই 'নারী'। অন্যদিকে 'পুরুষ' অর্থ (বি.) নর, মনুষ্য (মহাপুরুষ), পুংজাতীয় প্রাণী। 'পুরুষ আত্মা' মানে ঈশ্বর, পরব্রহ্ম, (বাং) বংশের এক স্তর (সাত পুরুষের ভিটা) বংশানুক্রম (পূর্বপুরুষ, উত্তম পুরুষ, প্রজন্ম, সাতপুরুষ), (বি.) পুরুষকার মানে পৌরুষ, দৈবনিরপেক্ষ প্রযত্ন বা উদ্যম 'পুরুষত্ব' অর্থ হল, পৌরুষ, উদ্যম, তেজ, পুরুষের রতিশক্তি। 'পুরুষালি' শব্দটিতে দেখা যায় সরাসরি উদাহরণ-পুরুষের ভাব, পুরুষ-পুরুষ ভাব (স্ত্রী লোকের পুরুষালি অসহ্য)। 'পুরুষ প্রকৃতি' হল (১) বি. সাংখ্যদর্শনের চৈতন্যময় পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি; ঈশ্বর ও মায়া, পুরুষ ও স্ত্রী, যুগল, মিথুন; পুরুষের স্বভাব। (২) বিণ. পুরুষের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট। বিশেষ্য 'পুরুষ মানুষ' হল-পুরুষ, নর পৌরুষপূর্ণ ব্যক্তি। বিশেষণ 'পুরুষসুলভ' অর্থ পুরুষোচিত। 'পুরুষার্থ' (বি.) পুরুষের প্রয়োজনীয় চতুবর্গঃ ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ; সুখ; মুক্তি। 'পুরুষোচিত' পুরুষের অর্থাৎ মরদের উপযুক্ত বিশেষ্য 'পুরুষোত্তম' হল-শ্রেষ্ঠ পুরুষ, নরব্রহ্ম, বিষ্ণু, জগন্নাথদেব। অভিধানে পুরুষদের জন্য এত পৌরুষ দীপ্ত আভিধানিক শব্দ রয়েছে সেখানে পুরুষোত্তমের বিপরীতে 'নারীত্তোম' বলেও কোনো শব্দ নেই।' নারীরত্ন' অর্থ হল রমণীকুলের শ্রেষ্ঠ. অপূর্ব সুন্দরী বা গুণবতী নারী। এই অর্থের সাথে কোন শৌর্য, বীর্য বা ক্ষমতার সম্পর্ক নেই। স্বাধীন, অধীন, পরাধীন কিংবা স্বামী-স্ত্রী এসব শব্দগত অর্থও পুরুষতান্ত্রিকতা অর্থাৎ পুরুষকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যেমন, স্বাধীন অর্থ-বিণ. কেবল নিজের অধীন, স্ববল, অনন্যপর (স্বাধীন চিন্তা বা জীবিকা), অবাধ, স্বচ্ছন্দ (স্বাধীন গতি) অধীন (বিণ.) আয়ত্ত; বশীভূত; আশ্রিত; বাধ্য; অন্তর্ভূক্ত শাসনের অন্তর্গত; অপেক্ষাকৃত নিরাপদস্থ, নির্ভরশীল [সং অধি+ইন (=প্রভু)]। বিণ.

Dhaka University Institutional Repository

বি.(স্ত্রী.) অধীনা. অধীনী-বশীভূতা রমণী। পরাধীন মানে হল (বিশেষণ) পরের অধীন, পরবশ, বিণ. (স্ত্রী) পরাধীনা। পরাধীন শব্দের সাথে নারীর পরাজয়ের সংযোগ তৈরী করে দিয়েছে। এখানে পুরুষ শুধুই ক্ষমতাধর, স্বাধীন এবং প্রভুত্বকারী। স্বামী অর্থও তাই প্রকাশ করে। যেমন, স্বামী (-মিন্)-বি. পতি, প্রভু, মনিব, অধিপতি, মালিক (গৃহস্বামী, ভূস্বামী); পরমহংস বা বিদ্বান্ [সং স্ব+আ মিন্) বি. (স্ত্রী) স্বামিনী (গৃহস্বামিনী)। বি. স্বামিত্ব-মালিকানা (স্বত্ব-স্বামীত্ব)। অপরদিকে স্ত্রী শব্দের অর্থ বি. পত্নী, জায়া, বধু (পুরস্ত্রী), নারী, রমণী, বামা, কামিনী (স্ত্রীধর্ম, স্ত্রীশিক্ষা, এয়োস্ত্রী) । অভিধানের এই দ্বৈধপূর্ণ অর্থ নারীর পরাধীনতাকেই কেবল প্রকাশ করে। নারীর স্বকীয় অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয়।'[৮]

সংবেদনশীল এসব অভিধানগত শব্দার্থ সমাজ কর্তৃক প্রাপ্ত নারী এবং পুরুষের রূপ-রূপান্তর। যদিও সামাজিক উন্নয়ন, অগ্রগতি, শান্তি সব কিছুই নারী-পুরুষ উভয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফসল। তাদের সমঝোতা আর সহযোগীতার ভিত্তিতেই গড়ে তোলা সম্ভব একটি সুষ্ঠু ও আদর্শিক সমাজ ব্যবস্থা। এই সমাজ ব্যবস্থা শুধু পুরুষ প্রাধান্যে বা পুরুষ কর্তৃক এককভাবে পরিচালিত হওয়ায় সমাজে শুরু হয় নারীর প্রতি বৈষম্য। পুরুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যই নারীর মধ্যে সামাজিকভাবে এমন কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে; যা পুরুষকে, নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়। নারী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্যকে পুঁজি করে নারীর মানবিক অস্তিত্ব বা সত্তাকে অস্বীকার করে তৈরী করা হয় সমাজ কর্তৃক জেণ্ডার পার্থক্য। লিঙ্গ নিরপেক্ষ এ 'জেণ্ডার' শব্দটি দ্বারা নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ককে বুঝিয়ে থাকে। নারী-পুরুষের মধ্যে জৈবিক (biological) পার্থক্য আছে, যার নাম সেক্স (Sex)। এই Sex দিয়েই চিহ্নিত হয়ে থাকে কে পুরুষ আর কে নারী। প্রকৃতিগতভাবেই সন্তান ধারণ করার ক্ষমতা একমাত্র নারীর আছে যা পুরুষের পক্ষে সম্ভব না। তবে সন্তান উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুরুষের ভূমিকা থাকে। এই সন্তান পালনের দায়িত্ব নারী-পুরুষ উভয়ই করতে পারে কিন্তু সামাজিকভাবে নারীরই উপর

Dhaka University Institutional Repository

এ কর্তব্যভার অর্পণ করা হয়। সন্তান উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করে পিতা অর্থাৎ পুরুষের কাছে থেকে। কারণ সমাজ কর্তৃক প্রাপ্ত সব সম্পদ এবং সম্পত্তির কর্তৃত্ব নিয়ে নিয়েছে পুরুষ। জৈবিক কারণেই কেউ পুরুষ বা কেউ নারী হিসেবে পরিচিত হবে। সমাজ নারী-পুরুষের এই জৈবিক পার্থক্যকে ভিত্তি করে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আরোপ করে যা 'পুরুষ সুলভ' এবং 'নারীসুভল' বলে আখ্যায়িত হয়। এ শব্দ দুটিই আরেকটু অগ্রসর হয়ে হয়-পুরুষত্ব বা পৌরুষ এবং নারীত্ব। পুরুষত্ব-নারীত্ব এগুলো হল সমাজগত পার্থক্য। এটাই জেণ্ডার পার্থক্য নারী এবং পুরুষের মধ্যে। জেণ্ডার হল নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট পার্থক্য। মাহমুদা ইসলাম এর-ই সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন-

> 'সেক্স নারী ও পুরুষের জৈবিক পরিচয় বহন করে; কিন্তু জেণ্ডার নারী ও পুরুষের উপর আরোপিত সামাজিক পরিচয় বহন করে। জেণ্ডারের শিকড় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রোথিত। জেণ্ডার সমাজে এমন প্যাটার্ন উৎপন্ন করে যা নারী ও পুরুষের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কের কাঠামো গড়ে তোলে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুবিধাজনক ও অসুবিধাজনক অবস্থান নির্ধারণ করে দেয়। পরিচয় হিসেবে জেন্ডার শিক্ষা দিতে হয়, শিখে নিতে হয় অর্থাৎ জেণ্ডার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ নিজের এবং অপরের জেণ্ডার দ্বারা চিহ্নিত পরিচয় নিরূপণ করে।'[৯]

তাই বলা যায় জেণ্ডার অর্থসমৃদ্ধ শব্দচিত্র। যা পুরুষ বা নারীকে সামাজিক বিশেষণে পরিচিতি দান করে। প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে সমাজগতভাবে সৃষ্ট শব্দে শব্দায়িত করে। জেণ্ডার সব সময়ই পরিবর্তনযোগ্য এবং সমাজ কর্তৃক আরোপিত। নারী ও পুরুষের গৎবাঁধা বৈশিষ্ট্যগুলো সমাজ বার বার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। তাদেরকে উপস্থাপিত করা হয় দুই প্রকৃতির হিসেব কষে। প্রকাশ করা হয় এভাবে, পুরুষের হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব, সাহসী, নর, উদ্যমী, তেজদীপ্ত, উদ্যোগী, বহির্মুখী, রোমাঞ্চ প্রিয়, মনুষ্য, ঈশ্বর, কর্তা আরও কত কী বিশেষণ। অন্যদিকে,

Dhaka University Institutional Repository

নারী কোমল, পুরুষনির্ভর, অবলা, লজ্জাবতী, মায়াবী, রমণী, রমণীয়, কামিনী, কমনীয়, সতী, পত্নী, সতীত্ব, প্রসাধনপ্রিয়, গৃহমুখী, পতিতা, সর্বংসহা, ঋতুবতী, যৌবনা, বামা, লজ্জাশীলা, লাজুক, নারীত্ব এরকম অসংখ্য নারীর অবমূল্যায়ন সূচক শব্দ বা শব্দালঙ্কার ব্যবহার করা হয় নারীর ক্ষেত্রে। পুরুষতান্ত্রিকতায় নারী উপস্থাপিত হয় দেহসর্বস্ব বা বুদ্ধিহীন হিসেবে।

'Man' অর্থ মানুষ আবার পুরুষকেও চিহ্নিত করা হয় 'Man' হিসেবে। নারীকে 'Woman' হিসেবে। অর্থাৎ এ দিয়ে বোঝা যায় একমাত্র পুরুষই মানুষ; নারী নয়। নারীর ক্ষেত্রে 'Man' এর আগে 'Wo' যুক্ত হয়েছে। এগুলো সামাজিকভাবে পুরুষ জাতি কর্তৃক তার একাধিপত্য বিস্তারের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। এজন্যই নারী; সমাজের সর্বক্ষেত্র থেকেই নির্বাসিত হয়েছে। জেণ্ডার বৈষম্যই নারীকে পুরুষের অধীনতাপাশে আবদ্ধ করে রেখেছে। সমাজসৃষ্ট এ জেণ্ডার ভূমিকা পরিবর্তনযোগ্য কিন্তু Sex অপরিবর্তনযোগ্য। মাহমুদা ইসলাম তাঁর 'নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা' গ্রন্থে লিখেছেন:

> 'গর্ভ ধারণে নারীর ভূমিকা সেক্স ভূমিকা। রান্না-বান্না নারীর জেণ্ডার ভূমিকা। একইভাবে, সন্তান ধারণে পুরুষের সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু সন্তান লালন-পালন, সন্তানকে গোসল করানো, কাপড় পরানো, ঘুম পাড়ানো, বোতলে দুধ বানিয়ে খাওয়ানো ইত্যাদি কাজে পুরুষের কোনো জৈবিক সীমাবদ্ধতা নেই। কাজেই সন্তান ধারণ নারীর সেক্স ভূমিকা, সন্তান প্রতিপালন নারীর জেণ্ডার ভূমিকা। নারীর জেণ্ডার ভূমিকা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীর উপর চাপিয়ে দিয়েছে।'[১৩]

নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে গিয়ে প্রথমেই এই জেণ্ডার পার্থক্য নিরসন করতে হবে অর্থাৎ সমাজে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে যে অসমতা তা দূর করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

নারী-পুরুষের মধ্যে সমতাপূর্ণ সম্পর্কের সমন্বয় থাকতে হবে। নারীকে দিতে হবে মানুষ হিসেবে মানুষের অধিকার ও মর্যাদা। নারীর মন-মনন-মানসিকতার স্বীকৃতি দিতে হবে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে এবং পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিবর্তন করলে জেন্ডার বৈষম্য বা নারী সহিংসতা অনেক কমে যেত। মানুষের ধর্মীয় গোড়ামী, ফতোয়া, সমাজের অযৌক্তিক নির্দেশিকা, সর্বোপরি সম্পদের অসম বন্টন, আর পুরুষ কর্তৃক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকায় সামাজিক মানদণ্ডে নারীর অবস্থা ও অবস্থান পুরুষের চেয়ে দুর্বল। যে কারণে নারীর মানবাধিকার বারবার লংঘিত হয়। নারী পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকেও হয় বঞ্চিত। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণ পুরুষরাই করে থাকে। যার ফলে নারী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-শারীরিক-মনস্তাত্ত্বিক সর্বক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে জেণ্ডার ইস্যুতে গণসচেতনতা প্রয়োজন। উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন করে সমতার ভিত্তিতে আইন করতে হবে। নারীর প্রতি সংবেদনশীল সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক সর্বক্ষেত্রে সর্বকার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণকে সক্রিয় ও নিশ্চিত করতে হবে। 'সব মিলিয়ে সত্য এই যে, সমাজ মনুষ্য বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। একে মানবিক করতে হলে বৈষম্য দূর করা চাই, যেমন ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য তেমনি পুরুষ-নারীর বৈষম্য। সে-কাজ করবার সময় নারীত্বের আদর্শ সম্পর্কে অনুশাসনের উৎপীড়নকে যেন না ভুলি। ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম,রাষ্ট্র,সমাজ সবাই নিজের মেয়েদের বিপক্ষে কাজ করেছে, এই বিরূপতায় পরিবর্তন আনতে ব্যাপক ও মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে। সমাজ কাঠামোতে এবং আদর্শিক ধ্যান-ধারণায়। অগে-পরে নয়, এক সঙ্গেই।'[১১]

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই নারীরা তাদের অধিকারের কথা বলতে শুরু করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কর্তৃক নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে প্রতিবাদী হয়। ধীরে ধীরে এই প্রতিবাদই নারীমুক্তির আন্দোলনে রূপ নেয়। ক্রমান্বয়ে নারী তার ভাগ্য পরিবর্তনে সোচ্চার হয়ে ওঠে। নারীর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া কর্মক্ষেত্র গৃহকোণ

Dhaka University Institutional Repository

ছেড়ে নারীরা সক্রিয় পদচারণার অধিকার চাচ্ছে সর্বক্ষেত্রে। রাজনীতি-সমাজ নীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি জনজীবনের সর্বত্র, বহিরাঙ্গণের সর্ব কর্মকাণ্ডে নারী চায় পুরুষের মত সম-অধিকার। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করতে চায়। নারীদের মধ্যে এই যে সচেতনতা নারীদের মাঝে এর প্রথম স্ফুরণ ঘটান বাঙালী মুসলমান মহিয়সী নারী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনিই জানান দেন নারীদের মুক্তি দরকার এবং তার জন্য প্রয়োজনে লড়তেও হবে: 'আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না।' কিংবা সেই উক্তি যাতে আছে মুক্তির পথ: 'তাই বলিয়া জীবনটাকে রান্না ঘরেই সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়, 'যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব...।'[১২] নারী ও পুরুষ উভয়ই সমাজের গতিশীলতার জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকেরই আলাদা মূল্য, সম্মান ও অধিকার আছে। সমাজ পুরুষতান্ত্রিকতায় পরিব্যাপ্ত হয়ে নারীকে করে রেখেছে অসহায়, অধম আর নির্যাতিত। পুরুষ এগুলো করেছে ধর্মীয় আবরণে, কৌশলে। 'মধ্যযুগে চার্চের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে পিতৃতন্ত্র ও নারী অধীনতা চরমে পৌছে। মধ্যযুগীয় ইউরোপে নারীর অবস্থান নিম্নোক্ত প্রবাদে বিধৃত হয়েছে, "ভালো হোক মন্দ হোক, প্রত্যেক ঘোড়ার জন্য নাল আবশ্যক; ভালো হোক মন্দ হোক, প্রত্যেক নারীর জন্য প্রভু ও মনিব আবশ্যক এবং কখনও কখনও বেত আবশ্যক।" (A horse whether good or bad, needs a spur; a woman, whether good or bad, needs a lord and master, and sometimes a stick. Quoted by Christine de pison in her book, The city of Ladies, written in 15th century)। স্ত্রীকে প্রহার আইনসিদ্ধ ছিল। যতক্ষণ নিহত না হয় বা একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গহানি না হয়, ততক্ষণ স্ত্রীকে প্রহার বৈধ ছিল। এজন্য পুরুষের শাস্তি র ব্যবস্থা ছিল না। তবে কখনও যদি ধৈর্যের সীমা অতিক্রমের ফলে স্ত্রী স্বামীর গায়ে হাত তুলত, তবে দণ্ডযোগ্য অপরাধ (criminal offence) বিবেচিত হত এবং আইনবলে ঐ নারীর শাস্তি হত। এক্ষেত্রে স্বামীরও সামান্য সাজা হত; কারণ স্ত্রী

Dhaka University Institutional Repository

তাকে মারতে পারল, এটাই তার অপরাধ।'[১৩] এসব থেকে নারী, মুক্তির পথ খোঁজে। শুরু হয় পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীবাদী আন্দোলন। নারীবাদী আন্দোলন মূলতঃ প্রাধান্য দিয়েছে-নারীর সমতা, ক্ষমতায়ন, সম্মান ও স্বাধীনতাকে। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীরা যে শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত হয়, সেই অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতন পদক্ষেপই হল নারীবাদ। সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র সব ক্ষেত্রেই নারীর জন্য নিশ্চিত করতে হবে শিক্ষা। দিতে হবে পরিকল্পনা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। ধর্মীয় বিষয়ে, সম্পদ, বিয়ে জৈবিক বিষয়ে অর্থাৎ জীবনের গতিময় সব দিকেই কর্তৃত্ব করার অধিকার দিতে হবে নারীকে। নারীর গঠনমূলক ক্ষমতায়নকে সফল করতে নারীর অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে।

সামাজিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক অধিকার এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমতার দাবী নিয়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাই-নারীবাদ। নারীসত্তার সচেতনতা জাগ্রত করাই ছিল নারীবাদের প্রথম লক্ষ্য। সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর পশ্চাদপদতা, অনগ্রসরতা, নিরক্ষরতা, সংস্কারে জড়িয়ে যাওয়া, আর্থিক অধীনতা, সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব না থাকা এ সব কিছুই নারীর অসহায়ত্বের জন্য দায়ি। এ ক্ষেত্র থেকে নারীর উত্তোরণের পথ খোঁজে নারীবাদ। Spike peterson & Anne Sisson Runyan তাদের Global Gender Issues গ্রন্থে বলেন,

> 'নারীবাদ একটি দিক নির্দেশনা যা আজকের দুনিয়ায় জেণ্ডারকে একটি মৌলিক বিন্যাসকারী নীতি মনে করে, যা নারীর অস্তিত্ব নিরূপণ ও জ্ঞানলাভের বিভিন্ন উপায়গুলোকে মূল্য দেয় এবং যা জেণ্ডার ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষমতার পরম্পরাগুলোর রূপান্তরকে পরিবর্তন করে।'[১৪]

আঠারশ শতকের দিকে নারীর সামাজিক-রাষ্ট্রিক অধিকার, ভোটের অধিকার, রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের অধিকার, সব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা এ

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে আন্দোলনে নামেন নারীবাদী প্রবক্তগণ। 'সমাজ কর্তৃক নারীসত্তার স্বীকৃতি নারী অধিকার রক্ষা করার জন্য সহায়ক দিক বলে মনে করা হয়। পুরুষ আধিপত্য ও কর্তৃত্ব থেকে নারীর মুক্তি লাভের উপায় হচ্ছে নারীসত্তাকে জাগ্রত করা ও এ সম্বন্ধে সমাজকে সচেতন করা। নারীসত্তার বোধ তুলে ধরার কাজে পথিকৃৎ হয়ে আছে নারী আন্দোলন।'[১৫] বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক যে নারী আন্দোলন তারই ধারাবাহিকতায় সূত্রপাত ঘটে নারীবাদের। নারীবাদ বাস্ত বভিত্তিক ও সুসংগঠিত কিছু কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যায়। যার ফলে-

> 'নারীবাদে চোখে পড়ে বেশ কয়েকটি তত্ত্বাদর্শ, প্রতিটিই বিশ্বাস করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে দরকার নারীর স্বাধীনতা ও পুরুষের সাথে সাম্য; কিন্তু বিভিন্ন মৌল বিষয়ে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে নানা ভিন্নতা। প্রকৃত স্বাধীনতা ও সাম্য কী, মানুষ বা নারীর প্রকৃত স্বভাব বা প্রকৃতি কি, রাষ্ট্রের দায়িত্ব কি হবে, এসব বিষয়ে তাঁদের মধ্যে রয়েছে দার্শনিক ভিন্নতা।'[১৬]

নারী আন্দোলনের সাথে জড়িত নারীরা যদিও নারীমুক্তির একটি অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেন, তারপরও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নানা তাত্ত্বিক সূত্র ও মতবাদ। এরই ফলশ্রুতিতে নারীবাদী তত্ত্বাদর্শের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তত্ত্বগুলো হল:

১। উদারপন্থী নারীবাদ (Liberal feminism)

২। উগ্রপন্থী বা রেডিক্যাল নারীবাদ (Radical feminism)

৩। মার্কসীয় নারীবাদ (Marxist feminism)

৪। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ (Socialist feminism)

এছাড়াও আছে- 'রক্ষণশীল মতবাদ'। রক্ষণশীল মতবাদটি নারীর মুক্তি বিরোধী, অর্থাৎ এ মতবাদটি সমাজের পুরুষ কর্তৃক যে আইন-কানুন-শৃঙ্খলা আছে তা-ই বিশ্বাস করে এবং মেনে নেয়। এ মতবাদটি ছাড়া অন্য সবগুলো

Dhaka University Institutional Repository

মতবাদ বিশ্বাস করে নারীমুক্তিতে। এজন্য রক্ষণশীল মতবাদটি নারীমুক্তি আন্দোলনে পড়েনা কিন্তু এটি নারীবাদের উপর প্রত্যক্ষ এবং গভীর ভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ।

১। উদারপন্থী নারীবাদ (Liberal feninism)

উদারপন্থী নারীবাদকে মানবতাবাদী বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী নারীবাদও বলা হয়। একে সংস্কারধর্মী মতবাদও বলা যায়। এ মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন Mary Wollstonecraft (১৭৫৯-১৭৯৯), John stuart Mill & Harriet Taylor, Betty friedan এবং প্রাচ্যে বেগম রোকেয়া।

Mary Wollstonecraft তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন A Vindication of the Rights of Women (১৭৯২) গ্রন্থে। John stuart Mill লিখেন The subjection of Women (1869) এবং Harriet Taylor নারীমুক্তি বিষয়ক যে বই লিখেন তা হল Enfranchisement of Women (1851). Betty Friendan উদারপন্থী নারীবাদ প্রকাশ করেন The feminine Mystique (1974) এবং the second stage (1981) গ্রন্থদ্বয়ে। বেগম রোকেয়ার প্রতিটি লেখাই নারীমুক্তির জন্য লেখা হয়েছিল।

উদারপন্থী বা লিবারেল নারীবাদ মূলতঃ সমাজে নারীর ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি এবং নারী পুরুষের সমতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। প্রথমত, আইনি বাধা অতিক্রম করে নারীকে দিতে হবে সমস্ত ধরণের নাগরিক অধিকার। নারীকে উপলব্ধি করতে হবে তার নিজেকে এবং বিকাশ ঘটাতে হবে তার অহং বোধকে। এ জন্য সমাজে পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে

Dhaka University Institutional Repository

নারীকে। তাহলেই একজন নারী তার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে পারবে স্বাধীনভাবে। ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই উদারপন্থী নারীবাদ কাজ করে। পরনির্ভরশীলতা বা পুরুষ নির্ভরতা কমাতে হবে। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তবেই সম্ভব বৈষম্যহীন সমাজ এবং নারীরমুক্তি অর্থাৎ নারী স্বাধীনতা অর্জন। 'স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা নারীরও একটি গুণ হতে পারে যা আমাদের সামজ স্বীকার করতে চায় না। যুগ যুগ ধরে নারীকে অবলা ও পুরুষ-নির্ভর রেখে এক ধরণের শৃঙ্খল পরিয়ে রেখেছে সমাজ। লিবারেল নারীবাদ এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেতনা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা না থাকলে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো কখনো পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে না। নারীর ক্ষেত্রে পরিবারের ভিতর থেকেই ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বিনাশ করে দেয়া হয়। ফলে পুরুষের মতো সুযোগ-সুবিধা পায় না বরং তাকে পরনির্ভর ব্যক্তি হয়ে জীবনপাত করতে হয়। এমন অবস্থায় নারীর ব্যক্তিত্ববোধ নির্লিপ্ত থাকে। লিবারেল নারীবাদ তাই ব্যক্তি স্বাধীনতা ও পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা দাবি করে। লক্ষ্য করার বিষয় যে যুগ যুগ ধরে, সুযোগের সমতা পরিপূর্ণভাবে ভোগ করছে সমাজে একটি দল আর তা হল পুরুষ দল। সুযোগের অসমতাকে লিবারেল নারীবাদ একটি কৃত্রিম অবস্থা হিসেবে গণ্য করে।'[১৭] লিবারেল নারীবাদ তাই নারীর ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে। যে ব্যক্তিত্বের আলো নারীসত্ত্বা তার অধিকার আদায় করতে পারবে এবং সমাজে পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

২. উগ্রপন্থী বা রেডিক্যাল নারীবাদ (Radical feminism)

রেডিক্যাল নারীবাদ নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্যের জন্য দায়ি করেন লিঙ্গীয় বৈষম্যকেই। জৈবিক বা জেণ্ডার ইস্যু নারী নির্যাতনের প্রধান হাতিয়ার তাই সমাজ থেকে নির্মূল করতে হবে জেণ্ডার বৈষম্য। সমাজে নারী এবং পুরুষ হিসেবে পরিচিত

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া হল জৈবিক বা সেক্স ভিত্তিক। এর উপর ভিত্তি করে যখন সমাজ বিনির্মান করে জেণ্ডার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নারীসুলভ বা পুরুষসুলভ গুণ এবং নারীকে প্রতিস্থাপন করে তখনই নারীর প্রতি পুরুষের আচরণিক পার্থক্য প্রকট হয়ে ওঠে। 'যৌনতা বস্তু জীববিজ্ঞানের বিষয়; কিন্তু সমাজ এমন ধারণার সৃষ্টি করেছে যে, মানুষের কার্যকলাপ থেকে যৌনতার সৃষ্টি হয়। নারী ও পুরুষের শারীরতত্ত্বের (Physiology) কতিপয় বৈশিষ্ট্যের (chromosomes ক্রোমোসম, anatomy, শরীরস্থান, হরমোন) ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের উপর বিভেদমূলক নারীসুলভ ও পুরুষ সুলভ আচরণ ও বৈশিষ্ট্য আরোপ করে সামজ পুরুষকে শক্তিশালী ও নারীকে শক্তিহীন পদানত করে রাখে। এই তথাকথিত বিভেদ কার্যকর করার প্রক্রিয়ায় সমাজ সকলকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে, পিতৃতন্ত্র কর্তৃক নির্মিত সৃষ্ট নারী ও পুরুষ চরিত্র "সহজাত" (natural) এবং যে নারী বা পুরুষ সমাজ সৃষ্ট জেণ্ডার আচরণ ও বৈশিষ্ট্য সঠিক প্রদর্শন করতে সক্ষম সে "স্বাভাবিক" (normal) নারী বা পুরুষ। এভাবে সমাজ সেক্সকে জেণ্ডারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে জৈবিক সেক্সকে সামাজিক জেণ্ডারের ভিত্তি নির্ধারণ করে নারী পুরুষের মধ্যে ভেদ জন্মিয়ে নারীকে হেয় করে এবং তার উপর পুরুষের শাসন চালিয়ে দেয়।'[১৮]

সমাজ নারীর উপর আরোপ করে মাতৃত্ব অর্থাৎ জৈবিকভাবে একটি নারী সন্তান পুনরুৎপাদন করতে পারে কিন্তু পুরুষ পারেনা। এটাকে সমাজ নারী নির্যাতনের ভিত্তি হিসেবে কৌশুলী পদক্ষেপ নেয়। নারীর উপর প্রয়োগ করে 'নারীত্ব'। এই নারীত্ব বা মাতৃত্বই একজন নারীকে দুর্বল করে রাখে। পুরুষ হয়ে ওঠে সমাজের কর্ণধার। ক্ষমতার এ বলয়ে পুরুষ অপ্রতিরোধ্য নির্যাতন চালায় নারীর উপর। রেডিক্যাল নারীবাদ এর বিরুদ্ধেই সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাদের লক্ষ্য নারীর জৈবিক বিষয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার। 'তাঁরা মনে করেন নারীর দুরবস্থার মূল কারণ জৈবিক; গর্ভধারণ করতে গিয়েই নারী মেনে নিতে বাধ্য হয় পুরুষের অধীনতা। তাঁদের মতে পরিবারের উৎপত্তি ঘটেছে জৈবিক কারণে, পরিবার একটি

Dhaka University Institutional Repository

জৈবসংগঠন। তাঁরা মনে করেন ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে আদি ও মৌলিক পীড়ন হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক শারীরিকভাবে নারীকে নিজের অধীনে নিয়ে আসা। তাঁরা যেন মনে করেন যে দেহই নারীর নিয়তি, তবে নারীকে মুক্তি পেতে হবে এ নিয়তি থেকে। জৈবপরিবারে যে-শক্তির সম্পর্ক দেখা দেয় তাই শক্তির মৌল কাঠামো; তাঁদের মতে জৈবপরিবারই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মূল।' [১৯] র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ সমাজে নারীর উপর পুরুষের বৈষম্য হিসেবে জৈবিক লিঙ্গীয়ভিত্তিক বৈষম্যকে প্রাধান্য দেয়। তারা মনে করেন লিঙ্গীয় মূল্যাবোধে পুরুষ কর্তৃক নারীকে অবমূল্যায়ণ করা হয় বালেই পরিবারে, সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্য নির্যাতনের পর্যায়ে চলে গেছে। 'পরিবার প্রথা গড়ে উঠার সময় থেকেই নারী সন্তান সৃজনের কারিগর হয়ে পড়ে এবং বৌদ্ধিক সৃজনশীল কারিগরের মর্যাদা পায় পুরুষ। সন্তান, উৎপাদন করতে গিয়ে নারী সন্তান পালনের সাথেও যুক্ত হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় নারী বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং গার্হস্থ্য জীবনের সাথে তার সংশ্লিষ্টতা বেড়ে যায়, পুরুষের উপরও নির্ভরশীল থাকে নারী। এ পুরো অবস্থাটি নারীর জৈবিক অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত বলে ধারণা করা হয়। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ অনুসারে নারীর জৈবি-দৈহিক অবস্থা অর্থাৎ সন্তান পুনরুৎপাদন ক্ষমতাকে পুঁজি করে সন্তান লালন-পালন করা ও গৃহস্থালীর কর্মাদি নারীর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। নারী-পুরুষের লিঙ্গভূমিকা ক্ষমতার কাঠামোতেও অধস্তন ও উর্ধ্বতন বৈষম্যমূলক স্ত রায়ণের জন্ম দিয়েছে।'[২০]

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী প্রবক্তাগণ হলেন, কেট মিলেট, টাই-গ্রেস অ্যাটকিনসন, শুলামিথ ফায়ারস্টোন, মেরিলিন ফ্রেন্স, মেরি ডেলী এবং সিমোন দ্য বোভোয়ার। কেট মিলেট (Kate Millet) ১৯৭২ সালে Sexual Politics গ্রন্থ লিখে তাঁর র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী মতামত প্রকাশ করেন। কেট মিলেট মনে করেন, নারী নির্যাতনের মূলে রয়েছে সেক্স বা জেণ্ডার। তাঁর মতে, 'পুরুষ প্রাধান্য মানেই পিতৃতন্ত্র: কাজেই পিতৃতন্ত্র নির্মূল না করলে পুরুষ প্রাধান্য নির্মূল হবে না এবং নারী

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তি আসবে না। অপর পক্ষে, পুরুষ প্রাধান্য নির্মূল করতে হলে জেণ্ডার ব্যবস্থা নির্মূল করতে হবে-যৌন অবস্থান, ভূমিকা ও মেজাজ (Status, role and temparament) বিনাশ করতে হবে। পুরুষের প্রাধান্য তথা পুরুষসুলভ ভূমিকা এবং নারীর অধস্তন তথা নারীসুলভ ভূমিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ নারী ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক পার্থক্যগুলোকে অতিরঞ্জিত করে। ফলে পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ এমন শক্তিশালী যে পুরুষ নির্যাতিত নারীর আপাত: সম্মতি নিয়েই যেন নারীর উপর নির্যাতন চালায়। সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান বস্তুত জ্ঞানের সকল শাখা নারীর পুরুষ অধীনতা সমর্থনও জোরদার করে, যার ফলে নারী নিজ হীনতাকে আত্মস্থ করে ফেলে এবং প্রতিবাদ করে না।'[২১] পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ সমাজ-সংস্কৃতির এত গভীরে শিকড়ায়িত যে এর বৃত্তবদ্ধ বলয় থেকে নারী নিজেকে রক্ষা করতে পারেনা। তখন আত্মস্থ করে নেয় পুরুষ অধিনতা বা পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা।

শুলামিথ ফায়ারষ্টোন (Shulamith Firestone) নারী মুক্তির জন্য জৈবিক ও সামাজিক বিপ্লব ঘটানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেন তাঁর The Dialectic of sex (১৯৭০) গন্থে। তিনি নারী নির্যাতনের কারণ ব্যাখ্যা করেই থেমে থাকেননি, চেয়েছেন এর থেকে উত্তোরণের জন্য প্রয়োজনে বিপ্লব। অর্থাৎ জৈবিক যে প্রজননের কারণে নারী পুরুষের অধীন হয় তা থেকে নারীকে বেরিয়ে আসতে হবে। স্বাভাবিক প্রজননের পরিবর্তে কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা করতে হবে যদি মানব ধারাকে অব্যাহত রাখতে হয়। মেরিলিন ফ্রেন্স (Marilyn French) এর মতে, 'নারীর উপর পুরুষের স্তর বিন্যাস সকল শ্রেণীর স্তর বিন্যাসের সূচনা করে; একটি অভিজাত শ্রেণী জনগণের উপর আধিপত্য করে। (Stratification of men above women in time leads to stratification of classes: an elite rules over people- Marilyn French "Beyond power: on women, Men and Morals".) । আধিপত্য তথা প্রাধান্যের পেছনে চালিকা

Dhaka University Institutional Repository

শক্তি হল, আধিপত্য তথা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ধ্বাংসাত্মক ক্ষমতা, যাকে তিনি বলেছেন "Power over"। এই ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার আস্ফালন থেকে উদ্ধারের উপায়: এক গোষ্ঠী কর্তৃক অপর সকল গোষ্ঠীর পক্ষ সমর্থন করে কথা বলার সামর্থ্য যাকে তিনি বলেছেন "pleasure with"।'[২২] ফ্রেনস তাঁর Beyond power : on women, Men and Morals গ্রন্থে পুরুষের আধিপত্যকে ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা বলেছেন। তিনি একে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, পুরুষ সুলভ Power-over বৈশিষ্ট্য ধ্বংসাত্মক বাসনা না হয়ে power-to অর্থাৎ সৃষ্টি করার বাসনায় পরিণত করতে। 'power-to, মেরিলিনের মতে, হচ্ছে পুরুষ সুলভ power- over এর নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য, রূপান্তরিত সংশোধিত রূপ। Power-to হচ্ছে সৃষ্টি করার বাসনা সৃজনশীলতা; Power-over হচ্ছে ধ্বংস করার বাসনা ধ্বংসশীলতা। মেরিলিন বিশ্বাস করেন, মানুষের মধ্যে ক্ষমতা ও সুখ উভয়ের জন্য বাসনা থাকা মঙ্গলকর। তবে এ ক্ষমতাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা অর্থাৎ Power-over নয়, বরং সৃষ্টি করার ক্ষমতা অর্থাৎ Power-to হিসেবে গ্রহণ করলেই ক্ষমতা ও সুখ ঈপ্সিত মঙ্গল বয়ে আনবে। কাজেই androgynous ব্যক্তিতে পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশের আগে পুনঃ ব্যাখ্যা করতে হবে। Power-over কে পুনঃ ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করে Power-to তে রূপান্তরিত করতে হবে যাতে পুরুষসুলভ Power-over বৈশিষ্ট্য ধ্বংসাত্মক বাসনা না হয়ে Power-to সৃষ্টি করার বাসনায় পরিণত হয়। যখন নারী ও পুরুষে নারীসুলভ Pleasure-with বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যের আলোকে পুনঃব্যাখ্যা ও রূপান্তরিত পুরুষসুলভ Power-to গুণ সমন্বিত হবে, তখন নারী-পুরুষ androgynous ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে। নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব সহযোগিতার মনোভাবে বদলে যাবে। নারী, পুরুষ প্রাধান্য থেকে মুক্তি পাবে এবং অনিবার্য ফলশ্রুতিতে পিতৃতন্ত্রের অচলায়তন ভেঙ্গে পড়বে।'[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষের মধ্যে যখনই নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য প্রভাব বিস্তার করবে তখনই কেবল সম্ভব নারীর সার্বিক মুক্তি। 'কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, বরং হয়ে ওঠে নারী' নারী সম্পর্কে এই বিখ্যাত ও তাৎপর্যপূর্ণ বাণীটি ঔপন্যাসিক, দার্শনিক ও প্রাবন্ধিক সিমোন দ্য বোভোয়ারের। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'ল্য দ্যজিয়েম সেক্স' বা 'দি সেকেন্ড সেক্স' (১৯৪৯)-এ আধুনিক নারীবাদের এক বিপ্লবাত্মক রূপ দেখিয়েছেন। তাঁর পুরোনাম সিমোন লুসি এর্নেস্তিন-মারি-বেরত্রাঁদ্য বোভোয়ার (১৯০৮-১৯৮৬)। তিনি মনে করেন, নারীরা লৈঙ্গিক বৈষম্যের কারণেই মাতৃত্বের দাসত্ব আত্মগত করে নেয় আর এর পথ ধরেই পুরুষ চালায় নারীর উপর নির্যাতন। নারীর সম্পূর্ণ সত্তাটিকে জড়িয়ে চলে মাতৃত্বের অনুরণন। যে কারণে পুরুষতান্ত্রিকতা অস্বীকার করে নারীর নিজস্বতাকে। নারীকে পুরুষের 'অপর' রূপে তৈরি করা হয়েছে। তাঁর অস্তিত্ববাদী পরিভাষায়, পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শ নারীকে 'সীমাবদ্ধ' আর পুরুষকে করে রেখেছে 'অসীম'। 'নিজ' এবং অপর এই দুইয়ের মধ্যে সংঘাত। পুরুষ যেহেতু 'নিজ' হিসেবে নিজেদেরকে মূল্যায়ন করে এবং নারীকে 'অপর' হিসেবে করে অবমূল্যায়ন সেজন্যই নারী-পুরুষ দ্বন্দ্ব অনিয়ন্ত্রিত এবং অবধারিত। তাই নারীকেই অর্জন করতে হবে নিজ অস্তিত্বের স্বাধীনতা,প্রতিষ্ঠা করতে হবে স্বকীয়তা। তবেই সম্ভব নারী মুক্তি। পুরুষ নারীকে বঞ্চিত করে তার স্বার্থ থেকে। সিমোন দ্য বোভোয়ার তাই নারীমুক্তির কয়েকটি পথের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

- নারীকে প্রবেশ করতে হবে কোন অর্থকরী কর্মজীবনে, যা তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে।
- নারীকে চিন্তা করতে হবে সর্ব বিষয়ে এবং তা নিয়ে গবেষণা ও মতামতও প্রকাশ করতে হবে।
- নারী নিজেই প্রতিষ্ঠিত করবে তার স্বকীয়তাকে তবেই তার নিজ অস্তি ত্বরক্ষা করা সম্ভব। পুরুষের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়া 'অপর' হয়ে না থেকে স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. মার্কসীয় নারীবাদ (Marxist feminism)

মার্কসীয় নারীবাদের উদ্ভব হয় এঙ্গেলস এর The Origin of the family, Private Property and the state (1884) গ্রন্থটিকে ঘিরে। মার্কসবাদ অনুসারে নারী নির্যাতন শুরু হয়ে যায় পরিবার প্রথা চালু হওয়ার পর থেকেই। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় পুরুষ আধিপত্য বিস্তার শুরু করে 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' নীতি উদ্ভব হওয়ার পর থেকে। প্রকৃতির বলয় থেকে পুরুষ ক্রমান্বয়ে অধিকার গ্রহণ করে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি এবং সৃষ্টি করে পরিবার প্রথা। এরপর থেকে পুরুষ সম্পত্তির সাথে সাথে অধিকার গ্রহণ করে নারীর উপরও। যার ফলশ্রুতিতে নারী হয়ে পরে গৃহবন্দী এবং হারায় তার স্বকীয়তা। নারী তখন শুধুই সন্তান পুনরুৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত হয়। এভাবেই নারীকে পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষের অধীন করে রাখে এবং গৃহের অভ্যন্তরেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ফলে অর্থনৈতিকভাবে নারী হয়ে পরে পরনির্ভরশীল অর্থাৎ এর দ্বারা পুরুষ প্রভূত্ব মজবুত ভীত তৈরি করে। আর্থ-সামাজিক গঠন বিন্যাসই নারী-পুরুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। পরিবারে পুরুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নারীকেও তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। তাই মার্কীয় নারীবাদে নারীমুক্তির সম্ভাব্য কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করেন যে, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার প্রথা ভেঙ্গে দিতে হবে। রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে আর্থিক ভিত্তি। মার্কসীয় নারীবাদ যে মূলনীতিতে বিশ্বাসী তা হল:

১। 'অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের অস্তিত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। পরিবারের তথাকথিত আর্থিক ভিত্তি ধ্বংস করে প্রেম, প্রীতি ভালবাসার ভিত্তিতে পরিবারের পুনর্গঠণ করতে হবে।

২। নারীকে জন-শিল্পে বহিরাঙ্গনে কলকারখানায়, অফিস আদালতে কর্ম গ্রহণ করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩। গৃহকর্ম ও সন্তান পালন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে সামাজিকভাবে সংগঠিত করতে হবে; সমাজ গৃহকর্ম ও সন্তান পালন অধিগ্রহণ করে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সেবা শিল্পে পরিণত করবে।

৪। নারীর অর্থনৈতিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারী মুক্তির পূর্বশর্ত।'[২৪]

মার্কসীয় নারীবাদ সমাজে-রাষ্ট্রে কোথাও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখার বিপক্ষে। এতে পুরুষগণ সম্পত্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করে নারীকে অধস্তন করে রাখে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশ গ্রহণের অধিকার চায়। পুরুষদের অধস্তন নীতিতে নারীকে মনে করা হয় আশ্রিত বা অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ নারীরা তাদের অধীন, নিম্ন পদস্থ বা বাধ্য এই চিন্তা-চেতনা থেকেই সমাজে শোষিত হচ্ছে নারী। তাই মার্কসীয় নারীবাদ নারী মুক্তি, নারীর কল্যাণ চায় পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে ফেলে। মার্কসীয় নারীবাদীদের মতে, পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতন হওয়ার মূলে প্রোথিক আছে আর্থিক-সামাজিক রাষ্ট্রিক কাঠামোগত ত্রুটির মধ্যে। তাই পুঁজিবাদী ধনিকতন্ত্র বিলুপ্ত হলে নারী বা পুরুষ উভয়েই হবে শুধু শ্রমিক। সেক্ষেত্রে পুরুষ আর নারীর-উপর শাসন-শোষণ কিংবা প্রভূত্ব করতে পারবে না। নারী-পুরুষ হবে এক সম্প্রদায় এবং এক বলয় যেখানে নারী-পুরুষের মধ্যে থাকবে না প্রভূ-দাসী মনোভাবের অস্তিত্ব।

৪. সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ (Socialist feminism)

মার্কসীয় নারীবাদের সীমাবদ্ধতা, রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয়ান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে নারী শোষণ-নির্যাতন বন্ধ না হওয়া-এসব কারণেই উদ্ভব ঘটে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা মনে করেন, ধনিকতন্ত্র এবং পুরুষতন্ত্রের যৌথ ভূমিকাই নারী নির্যাতনের মূল কারণ। তাই পিতৃতান্ত্রিক ও ধনিকতান্ত্রিক মতাদর্শকে উচ্ছেদ করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের বক্তারা

Dhaka University Institutional Repository

হলেন, Juliet Mitchell, Iris young ও Alison Jaggar প্রমুখ নারীবাদী প্রবক্তাগণ। পুরুষের মন-মনন-চেতনার গভীরে লুকিয়ে রয়েছে নারী নির্যাতনের ভিত। পুরুষ নারীকে অধীন এবং অভ্যস্ত ভাবতেই বেশি ভালবাসে। তাই যতদিনে পুরুষতান্ত্রিকতা ও ধনতান্ত্রিক আদর্শ নির্মূল না হবে ততদিনে পর্যন্তনারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব না । নারীর পরাধীনতা আবহমান কালের মত সমাজের প্রতি পরতে পরতে থেকেই যাবে।

মার্কসবাদীদের মত সমাজতান্ত্রিক নারীবাদও মনে করে, ধনিকতন্ত্রের বিলোপ অবশ্যই দরকার তবে তার সাথে যুক্ত হবে পিতৃতন্ত্রও। অর্থাৎ ধনিকতন্ত্র আর পিতৃতন্ত্র সমাজ থেকে উচ্ছেদ করতে পারলেই নারীমুক্তি সম্ভব। নারী নির্যাতনের জন্য দুয়ের-ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে চিহ্নিত করেছেন। তাদের অভিমত হল পিতৃতন্ত্র ধ্বংস হলেই ধনিকতন্ত্রের নির্মূল সম্ভব নতুবা এরা একে অপরে মিলে শক্তিশালী অবস্থানে স্থিত থাকবে। তাতে করে নারীদের উপর পুরুষদের আধিপত্য থেকেই যাবে এবং নারী নির্যাতন চলতেই থাকবে। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা নারীকে স্বাধীন-স্বাবলম্বী ভাবতে চায়না। তারা নারীকে শুধু মমতাময়ী মা, স্ত্রী বা প্রেমিকা হিসেবে দেখতে চায়। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের প্রবক্তা Juliet Mitchell তার 'Women's Estate' এ বলেছেন যে, মার্কসবাদীরা পরিবার বিলোপ করে এবং নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণে আহব্বান জানিয়েছেন মাত্র কিন্তু এতে পরিবার প্রথা বিলোপ হলেও নারীমুক্তি সম্ভব না। কারণ পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব নারীদের মননে গেঁথে যাওয়ায় নারীরা নিজেদের পুরুষের অধিনস্ত ভাবতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। এর ফলে পুরুষদের ভেতর প্রভূত্ব ভাব সর্বদাই জাগ্রত থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নির্যাতিত হয় নারী। তাই তাঁর মতে, ধনিকতন্ত্রের সাথে সাথে পিতৃতন্ত্রের বিলোপ ঘটলে নারী-পুরুষের মধ্যে থেকে এই চেতনা গড়ে উঠবে যে, তারা একে অন্যের অধীন নয়। তারা পরস্পর সমান এবং একে অন্যের সম্পূরক। পরিপূর্ণভাবে পুরুষরা এই ভাবনায় উন্নিত হলেই সার্বিকভাবে নারীর অবস্থা ও

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। তারা বলেন সমাজতান্ত্রিক কাঠামোগত বিন্যাসের মধ্যেই গাঁথা থাকবে মানবিক মূল্যবোধের ধারা। যার ফলে সমাজ থেকে নারী নির্যাতন, নারীকে দাবিয়ে রাখার সব ধরনের কৌশলেও আইন বন্ধ হবে।

Iris young এর মতে, ধনতান্ত্রিক পিতৃতন্ত্রে নারীকে 'শ্রম বিভাজনে' বিভাজিত করে রেখেছে। এতে নারী 'গৌণ' শ্রমশক্তি এবং পুরুষকে 'মুখ্য' শ্রমশক্তিতে ভাগ করেছে। ধনতান্ত্রিক পিতৃতন্ত্রে নারী-পুরুষ এই দুয়ে বিভক্ত করে জেন্ডার ভিত্তিতে কাজ নির্ণয় করেছে। তাদের মন-মানসিকতার শেকড়ে গেঁথে আছে যে, নারী গৃহকর্মে এবং পুরুষ বর্হিকর্মে দক্ষ। যার ফলে নারীকে রিজার্ভ শ্রমিক হিসেবে বর্হিকর্মে যেমন-যুদ্ধ হলে কিংবা উৎপাদন বৃদ্ধির জরুরী অবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লাগান হয়। এতে নারী তার যোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়। শ্রেণী ও জেণ্ডার কাঠামো যুগে যুগে ধনিকতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্রের মধ্যে একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় নারী হচ্ছে অধিনস্ত, নারী হচ্ছে নিস্পেষিত। তাই Iris young মনে করেন ধনিকতন্ত্রকে ও পিতৃতন্ত্রকে একই সাথে ধ্বংস করতে পারলে নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব হবে।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের আরেক প্রবক্তা Alison Jaggar তিনি তার 'Feminist Politics and Human Nature' এ নারীর যাপিত জীবনে সব সমস্যার মূলে চিহ্নিত করেছেন নারীর বিচ্ছিন্নতাবোধকে। আর এ 'বিচ্ছিন্নতা-বোধের' জন্য তিনি ধনতান্ত্রিক এবং পিতৃতান্ত্রিক চেতনাকে দায়ী করেছেন। নিজেদের অর্থহীন কিংবা অযোগ্য ভাবনা থেকেই নারীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম। নারীর সমস্ত ধরণের কাজকর্মে পুরুষের আধিপত্য থাকায় এবং নারীর কাজ পুরুষকেন্দ্রিক হওয়ায় নারী এক সময় তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলে এবং সে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন-আত্মকেন্দ্রিক। নারীর এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি একই সাথে ধনিকতন্ত্র এবং পিতৃতন্ত্রের বিলোপের কথা বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫. রক্ষণশীল মতবাদ ঃ

রক্ষণশীল মতবাদ; নারীবাদ নয়। এটি বরং নারীবাদেরই বিরুদ্ধে পুরুষতান্ত্রিক মতবাদের আদর্শিক বাস্তব রূপ। নারীবাদের পরিপন্থি একটি সাধারণ মতবাদ। এ মতবাদ যুগ যুগ ধরে ছড়িয়ে আছে ঐতিহ্যে-সমাজে-মানুষের মন মানসে। এর ধারাগুলো সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে নানা ধর্মগ্রন্থে-দর্শন-আইন ও সংস্কৃতিতে। একেই পুরুষতান্ত্রিক মতবাদে বলে চিরন্তন শাশ্বত রীতি-নীতি-আদর্শ। তারা মনে করেন নারী পুরুষের কাজের ধরণ এক নয় এবং এর অবস্থান প্রকৃতি গত ভাবেই নির্ধারিত হয়ে আছে। রক্ষণশীল মতবাদ শেখায় কিভাবে নারীত্বের বৈশিষ্ট্য ধরে রাখার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে একটি নারীর কৃতিত্ব। সমাজে একজন নারীকেই প্রমাণ করে দেখাতে হয় নারীটি সর্বংসহা, ধৈর্যশীলা, সতীসাধ্বি কি-না। সমাজের শেকড়ে এটা প্রোথিত হয়ে আছে যুগ-যুগান্তরের ধারা পরিক্রমায়। তাইতো এর মূলোৎপাটন করা সহজে সম্ভব নয়। বংশ পরম্পরায় এটি নারী নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নারীবাদী আন্দোলন মূলতঃ এর বিরুদ্ধেই বেশি সোচ্চার। রক্ষণশীল মতবাদ নারীদেরকে গৃহের চার দেয়ালের ভিতর বন্দী দেখতেই ভালবাসে। গৃহের সমস্ত ধরণের কর্ম যেমন সন্তান উৎপাদন, সন্তান ধারন, লালন-পালনের দায়-দায়িত্ব শুধু নারীর উপরই বর্তিয়ে থাকে। আর পুরুষ হবে বহির্মূখী এবং স্বাধীন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ছিন্নপত্রের' একটি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ

> 'মেয়েদের কথাবার্তা বেশভূষা চালচলন আচারব্যবহার এবং জীবনের কর্তব্যের মধ্যে একটি অখণ্ড সামঞ্জস্য আছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, যুগ-যুগান্তর থেকে প্রকৃতি তাদের কর্তব্য নিজে নির্দিষ্ট করে দিয়ে তাদের আগাগোড়া সেইভাবে সেই উদ্দেশ্যে গঠিত করে দিয়েছে। এ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন, কোনো রাষ্ট্রবিপ্লব, সভ্যতার কোনা ভাঙন-গড়নে তাদের সেই ঐক্য থেকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়নি; তারা বরাবর সেবা করেছে, ভালো বেসেছে, আদর করেছে, আর-কিছু করেনি।' [২৫]

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত মন্তব্যে নারীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখা যায়। তার মতে নারীরা যে চিরন্তন ভাব ভাষায় বলেছে চলেছে তা প্রকৃতি নির্দিষ্ট। তাই নারীর ভেতর তিনি কোন ভাঙ্গা-গড়ার অস্তিত্ব দেখেন-নি। পাশাপাশি তিনি পুরুষদের চিত্র অঙ্কন করেছেন এভাবে,

> '....পুরুষরা কিছু খাপছাড়া .....পুরুষের চরিত্রের মধ্যে বিস্তর উঁচুনিচু; তারা যে নানা কার্য নানা শক্তি নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তৈরী হয়ে এসেছে, তাদের অঙ্গে এবং স্বভাবে তার যেন চিহ্ন রয়ে গেছে। .... স্ত্রীলোককে প্রকৃতি মা করে দিয়ে তাকে একেবারে ছাঁচে ঢালাই করে ফেলেছে; পুরুষের সেরকম কোনো স্বাভাবিক আদিম বন্ধন নেই, সেইজন্যে একটি ধ্রুবকেন্দ্র আশ্রয়ে পুরুষ সর্বতোভাবে তৈরী হয়ে যায়নি-সে চিরকাল ধরে কেবলই বিক্ষিপ্ত হয়ে হয়ে এসেছে, তার শতমুখী উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি তাকে একটি সুন্দর সমগ্রতায় গড়ে তোলে-নি।' [২৬]

রবিন্দ্রনাথের এ চেতনা রক্ষণশীল মতবাদকেই প্রশ্রয় দেয়। তাঁর ভাষায় তাইতো মেয়েদেরকে চিরকাল সংগীত কবিতা-ফুল-লতা-পাতা-নদী-পাখি অর্থাৎ প্রকৃতির সৌন্দর্যের সাথে ছন্দোবদ্ধ করা হয়। নারীর মধ্যে তিনি কোনা চিন্তা-চেতনা-দ্বিধা-দ্বন্দ্বের টানাপোড়েন কিংবা তর্কের অব্কাশ দেখেন নি। কিন্তু পুরুষের মধ্যে অবলোকন করেছেন 'বন্ধনহীন এবং সৌন্দর্যহীন' আগাগোড়া 'ছাঁদহীন' এক অদম্য ভাব।

রবীন্দ্রনাথের নারী-পুরুষ বিষয়ক এ ভাবনা দর্শন-সাহিত্য-আইন-সমাজ রাষ্ট্র সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে এবং যা কঠোরভাবে নারীর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। জীবন-ভয়ে নারী তা আত্মস্থ করে নেয়। এভাবেই যুগ থেকে যুগে ঐতিহ্যিক মোড়কে রক্ষণশীল মতবাদ সমাজে টিকে আছে। এরই বিরুদ্ধে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর লেখনি দিয়ে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছিলেন। নারীদের প্রবক্তাগণও নারীদের

Dhaka University Institutional Repository

উপর পুরুষদের চাপিয়ে দেয়া সব বৈষম্য থেকে উত্তোরণের পথ খুঁজেছে। 'বস্তুত নারীবাদের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করি যে নারীবাদী মতাদর্শগুলো নারী-পুরুষ বৈষম্যমূলক আচরণের দিকগুলো তুলে ধ'রে কী উচিত এবং কী উচিত নয় এমন দিকে আমাদের দৃষ্টিকে নিয়ে যায়। ভালো কী, মন্দ কোনো অগ্রহণযোগ্য, কর্তব্যমূলক কাজ কোনগুলো ইত্যাদি বিষয় নৈতিকতার অন্তর্ভূক্ত। সমাজ ব্যক্তির কাছে এমন আচরণ আশা করে যা ভালো বা উচিত জাতীয়। মানুষ উত্তম জীবনের আকাঙ্খা করে, সমাজে প্রচলিত নৈতিক নিয়ম-কানুন সে আকাঙ্খা পূরণ করতে সাহায্য করে। ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ব্যক্তিকে বিচার করা যায় না। এমন অবস্থায় ব্যক্তির নৈতিক আচরণ তার নিজের উত্তম জীবন গঠনের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সমাজের অন্যান্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই নৈতিকতা ব্যক্তি বিশেষের একক কোনো বিষয় নয়। সমাজ বিভিন্ন মানুষের এক সামষ্টিক রূপ; সকল মানুষকে এক বন্ধনে ধরে রাখার জন্য নৈতিক নিয়ম-কানুনের ভূমিকা রয়েছে। ...সমাজে নারীর জন্য এক রকম নৈতিক মূল্যবোধ ও পুরুষের জন্য ভিন্ন রকমের নৈতিক মূল্যবোধ প্রচলিত রয়েছে। নারীবাদ নৈতিক মূল্যবোধের এমন বৈষম্যকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করে।'[২৭] নারীবাদ তাই নারীর অন্তরীন অবস্থা থেকে নারী স্বাধীনভাবে বিরচণ করতে পারবে এমন ক্ষমতার অধিকার চায়। সমাজে পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা দাবী করে। আধিপত্যবাদী পুরুষের বলয় থেকে নারীমুক্তিকে প্রাধান্য দেয়। যে সমাজব্যবস্থায় নারী নির্যাতিত হয় সেই নিপীড়নমূলক সমাজকাঠামোর বিলোপ এবং নারী ব্যক্তিত্বের জাগরণ ঘটাতে চায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১. গীতি আরা নাসরীন, বিটিভি বিজ্ঞাপনের রাজনৈতিক অর্থনীতি : একটি লৈঙ্গিক বিশ্লেষণ, রাজনীতি অর্থনীতি জার্নাল পঞ্চম সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন ১৯৯৯, রাজনীতি গবেষণা কেন্দ্র, কক্ষ নম্বর- ১০৪৬, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ-২২

২. সিমোন দ্য বোভোয়ার, দ্বিতীয় লিঙ্গ (হুমায়ুন আজাদ অনূদিত), ২০০২,আগামী প্রকাশনী, ঢাকা। পৃ-৭২

৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাঙালির সংস্কৃতিতে নারী, ডিসেম্বর ১৯৯৮, পৌষ ১৪০৫, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ষষ্ঠ দশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ-০৩

৪. সিমোন দ্য বোভোয়ার, দ্বিতীয় লিঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ-১৫

৫. হুমায়ুন আজাদ, নারী, ডিসেম্বর-২০০৪, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ-২৮

৬. মাহমুদা ইসলাম, নারীবাদী চিন্তা ও নারীজীবন, এপ্রিল-২০০২, জে,কে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা। পৃ-৯

৭. মঈন চৌধুরী, ভাষাভিত্তিক সাহিত্য-সমালোচনাতত্ত্ব প্রসঙ্গঃ সাহিত্যে তার প্রয়োগ, উলুখাগড়া, প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১২ ফেব্রুয়ারী ২০০৬, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, মিরপুর, ঢাকা, পৃ-৪৬

৮. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক সঙ্কলিত, সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান (চতুর্থ সংস্করণ), পুনমুদ্রন, জানুয়ারি-১৯৯৮, সাহিত্য সংসদ্, কলকাতা। পৃ-১২৭,৩৬৬, ৩৭৩, ৪৩১, ৪৩২, ৫০৪, ৫৬৭, ৬০৫, ৭০২, ৭০৮।

৯. নারীবাদী চিন্তা ও নারীজীবন, প্রাগুক্ত, পৃ-৬

Dhaka University Institutional Repository

১০. মাহমুদা ইসলাম, নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪, মাওলা ব্রাদার্স ঢাকা । পৃ-১১৬

১১. বাঙালির সংস্কৃতিতে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৩০

১২. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া রচনাবলী,ডিসে-১৯৭৩,আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ-২১

১৩. মাহমুদা ইসলাম, নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৪-৭৫

১৪। নারীবাদী চিন্তা ও নারীজীবন, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৩-৫৪

১৫. রাশিদা আখতার খানম, নারীবাদী চিন্তা ও মতিজানের মেয়েরা উলুখাগড়া, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১২ ফেব্রুয়ারী ২০০৬, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, মিরপুর, ঢাকা,। পৃ-১৭৩-১৭৪

১৬. হুমায়ুন আজাদ, নারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৭২

১৫. মাহমুদা ইসলামনারীবাদী চিন্তা ও নারীজীবন জে,কে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০২, এপ্রিল ঢাকা। পৃ-৫৬

১৬. হুমায়ুন আজাদ নারী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৪, পৃ-৩৭২

১৭. রাশিদা আখতার খানম, নারীবাদী চিন্তা ও মতিজানের মেয়েরা, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৫

১৮. নারীবাদী চিন্তা ও নারীজীবন, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৯

Dhaka University Institutional Repository

১৯. নারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৭৫

২০. রাশিদা আখতার খানম, নারীবাদী চিন্তা ও মতিজানের মেয়েরা, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৭

২১. নারীবাদী চিন্তা ও নারীজীবন, প্রাগুক্ত, পৃ-৭০

২২. প্রাগুক্ত, পৃ-৭৫

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ-৭৬

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ-৮৯

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্র, শ্রাবন-১৩৬৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থনা বিভাগ, কলকাতা, পৃ-১৯২

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ-১৯২

২৭. রাশিদা আখতার খানম, নারীবাদী চিন্তা ও মতিজানের মেয়েরা, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সমালোচনায় নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীজীবন

সাহিত্য এবং মানবজীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাহিত্যে তাই অনিবার্যভাবেই সমাজস্থিত নর-নারীর জীবন ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অবস্থান শৈল্পিক ঋদ্ধিতে ঠাঁই করে নিয়েছে। কিভাবে নারী জীবন সাহিত্যের গভীরে উঠে এসেছে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তা সমালোচনা করার ধারা প্রবর্তন করেন নারীবাদীরা। নারীজীবনের রূপ-রূপান্তর বিশ্লেষণ করা হয় এসব- সমালোচনা সাহিত্যে। প্রচলিত জীবন ধারাকে নারীবাদী তত্ত্বের ছকে কথাসাহিত্যে উপস্থাপিত নারীর স্বরূপ পর্যালোচনা করেন অনেক সমালোচক। বিশ শতকে এসে নারীবাদী দর্শন ও তত্ত্বের প্রসার ঘটে। সিমন দ্য বোভেয়া, বেটি ফ্রাইডেন, কেট মিলেট, জুডিথ ফেটারলি, এলিন শোয়াল্টার, সাণ্ড্রা গিলবার্ট, সুসান গুবার, জুলিয়া ক্রিস্টিভা, টরিল মোই, কেলি অলিভার প্রমুখ হলেন আধুনিক নারীবাদের প্রবক্তা। মূলত পুরুষের সামন অধিকার চেয়ে নারীবাদী দর্শন- তত্ত্বের প্রসার ঘটলেও, পরবর্তী পর্যায়ে নারীবাদী দর্শন বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। ফরাসি নারীবাদে, নারীর অবমূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে অবস্থানরত মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলোর উপর জোর দেয়া হয়। কিছু তত্ত্বে ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং সিদ্ধান্ত আসে যে ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন আসলে প্রকাশের সময়ই পুরুষতন্ত্রের পক্ষে উপস্থাপিত হয়েছিল। নারীবাদের একটি শাখা নারীদের অধীকার আদায়ের তত্ত্ব উপস্থাপন করার সাথে সাথে জরায়ুর স্বাধীনতা, অবাধ যৌন সম্ভোগের অধিকার এবং নারী সমকামিতার পক্ষেও বক্তব্য রেখেছে। বাংলা সাহিত্যেও নারীবাদকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা এসেছে বিশ শতকের প্রথম থেকেই। প্রথম দিকে নারী স্বাধীনতার বক্তব্য/ বিবরণ সীমাবদ্ধ ছিল ঘর ও পরিবারকে কেন্দ্র করে, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে নারীবাদী চিন্তা- চেতনা ঘর ও পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে সামাজিক আন্দোলন হিসেবেই উপস্থাপিত হয়। নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব দিয়ে আমরা তাই এসব সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন অবশ্যই করতে পারি।'[১] বিশ শতকের কয়েকজন বাঙালী মুসলিম লেখকদের লিখনিতে পুরুষতান্ত্রিক চেতনাগত ভাবনার বিশ্লেষণ দেখা যায় 'বিবি

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বেগম' গ্রন্থটিতে। এখানে দেখান হয়েছে নারীরা তাদের জীবন কিভাবে পুরুষদের দেয়া পুরুষতান্ত্রিক ছকে পরিচালিত করেছেন তারই নির্মোহ শব্দচিত্রঃ

> 'পতিপ্রভুরা পত্নীদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিধায় অভিহিত করেছে। উদ্ভবকালে যার পরিচয় ছিলো বিবি, ক্রমশ সে অভিহিত হতে থাকে বেগম বলে। ক্রমে ওই বেগম হয়ে ওঠে মিসেস এবং এখন তার প্রভু তাকে উল্লেখ করে 'আমার ওয়াইফ' বলে। বিবি বা বেগম বা মিসেস বা 'আমার ওয়াইফ' যা-ই তাকে বলা হোক না কেন, সকল সময়েই তার অবস্থা ছিলো অভিন্ন।'[২]

অর্থাৎ চিরদিনই 'শৃঙ্খলিত বিকলাঙ্গ জীবন' যাপন করতে হয়েছে নারীদেরকে। পুরুষতন্ত্রের এ দীক্ষা থেকে উত্তোরণের কোন পথই যেন পাওয়া যাচ্ছে না। লেখক এখানে বলেছেন যে নারীদের এ অথর্বতার জন্য তারা নিজেরাও অনেকটা দায়ী কারণ,

> 'নিজের বিকলঙ্গতা ও অথর্বতার জন্যে এখন নারী নিজেও সমান দায়ী। তার সুবিধাবাদিতাও তাকে করে এমন ঘৃণ্য পরজীবী।'[৩]

নারীরা হয়ে আছে পুরুষদের স্বেচ্ছাদাসী। কারণ নারীরা আরাম-আয়েশ এবং ভোগের মধ্যেই নিজের জীবন সীমাবদ্ধ রাখতে বেশি পছন্দ করে। যে কারণে নারীদের এই বিকলঙ্গতা বা অথর্বতা। লেখক অন্য এক জায়গায় এ বিষয়টিকে প্রকাশ করেছেন এভাবে :

> 'নারীরা এই পরজীবী ভাবনায় অভ্যস্ত হওয়ায় পুরুষতন্ত্র বিশ্বাস করে নারীর জীবন পুরুষের জন্যে।'[৪]

Dhaka University Institutional Repository

কথা সাহিত্যের নানা ধারায় রূপায়িত হয়েছে নারীর স্বরূপ। বিভিন্ন কালের বিভিন্ন রূপের চিরায়াত নারীর ভাবমূর্তি বিচিত্র বুননে সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। বাস্তব জীবনেও এর প্রভাব কম পড়েনি। সমাজে নারী-পুরুষকে আলাদা আলাদা সত্তায় উপস্থাপন করা হয়। এখানে দেয়া হয়না সার্বিকভাবে একজন মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা। নারী শুধুই নারী, সে পুরুষের অংশ, কিংবা স্বাধীনসত্তা না এই বিশ্বাস মানুষের মনে গেঁথে দেয়া হয়। নারীকেও এই দীক্ষায় দিক্ষিত করে পুরুষতন্ত্র। তাই সমাজে আজ নারী-পুরুষ অসমতা একটি বড় বিপর্যয়ের মত দেখা যায়। এই অসমতা সমাধান কল্পেই গড়ে ওঠে নারীর প্রতিবাদী আন্দোলন। নারীসত্তার বোধ জাগ্রত করতেই এই সচেতন পদক্ষেপ। সাহিত্যে বিভিন্ন লেখকদের লিখনিতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্জাত হয়ে নারীভাবমূর্তি কিভাবে ধরা পড়েছে তা নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনায় বিশ্লেষিত হয়েছে। 'সাহিত্যে নারীর অবস্থান এবং নারী ভূমিকার মূল্যায়নের নেতিবাচক দিক নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনায় প্রবলভাবে উত্থাপিত হয়েছে। নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনায় নারীবাদীরা লিঙ্গ ও জেণ্ডারের পার্থক্য তুলে ধরেছেন।'[৫]

পুরুষতন্ত্রই নারীমূর্তি তৈরি করেছে তাদের সুবিধামত। নারী কর্তৃক নারীর ভাবমূর্তি তৈরীর সুযোগ বা অধিকার কোনটাই নারী পায়নি। পুরুষতন্ত্র যা মনে করে তাই তাকে চিরদিন মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। তাদের তৈরি ওই বলয় থেকে নারী মুক্ত হতে চেষ্টা করলেই সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানে তার টুঁটি চেপে ধরেছে কঠোর শক্তিতে। নারীর জন্য যে সংসার তৈরি করে দেয়া হয়েছে সেখানেও সে সর্বময় কর্ত্রী হয়ে ওঠার যোগ্যতা রাখেনা। পছন্দ করে পুরুষ কিংবা সমাজ কিংবা পুরুষ তান্ত্রিক দীক্ষায় দিক্ষিত কিছু নারী। তাই নারীবাদী তত্তগুলো অন্বেষণ করছে কোথায় কোথায় নারী-পুরুষ বৈষম্যের শিকড় রয়েছে। মানবিক মূল্যবোধ থেকেই উৎসারিত হয়েছে নারীবাদী তত্ত্বগুলো। ষাটের দশকেই নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনার দিকটি উন্মোচিত হয়। পুরুষ-নারীকে কিভাবে এবং নারীর দৃষ্টিকোণেও কিভাবে ধরা পড়েছে নারী-নারীরমন, নারীজীবন তা বিশ্লেষণ করাই এর প্রধান লক্ষ্য। এ ধারার

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান বক্তারা হলেন মেরিওলস্টোন ক্রাফট। বেটি ফ্রিডান, কেইন্ট মিলেট প্রমুখ সচেতন ব্যক্তিগণ। বাংলা সাহিত্যে এর পথিকৃৎ ডঃ হুমায়ুন আজাদ। মানবীয় জীবনযাপনের মধ্যে নমিত নানা অনুষঙ্গ তাদের আলোচনায় উঠে আসে। পুরুষের ভাবনার ছকে কিভাবে নারীর জীবন আবর্তিত হয় তার বিচিত্র রূপ দেখা যায় তাদের আলোচনায়। 'বিবি থেকে বেগম' গ্রন্থে আকিমুন রহমান বলেন:

> 'পুরুষতন্ত্র ভঙ্গুরতা ও নির্ভরশীলতাকে নারীত্ব বলে রটনা করে মহাসমারোহে; আবার অতি আড়ম্বরতার সঙ্গে প্রচার করে যে, বদ্ধপরিকরতাও থাকা চাই নারীর স্বভাবে। একই সঙ্গে নারীর বদ্ধপরিকর হবার এলাকা ও সীমানাও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে দেয় পুরুষতন্ত্র। জানায় যেহেতু নারীর জীবন শুধু পতিপুরুষের জন্যে, তাই নারী বদ্ধপরিকর বা মরিয়া হবে শুধু পতির জীবন রক্ষার জন্যে। আর নারী তার নিজের জীবন কাটাবে গভীর অবগুণ্ঠনের ভেতর এবং কখনো কোনো অবস্থাতেই নারী নিজের কথা ভাবার মতো স্পর্ধা দেখাবে না। নিঃশব্দে সেবা দিয়ে যাবে সে এবং থাকবে চিরলজ্জাশীল, অসূর্যসম্পশ্যা পর্দানশীন, মুক, খঞ্জ ও বধির। ...তবে নারীর নিজের জন্যে এমন হবার কোনা অধিকার নেই।'[৬]

পুরুষতন্ত্র তাঁর অনমনীয় প্রভূত্ব দিয়েই নারীকে করে রেখেছে অবলা, লাজুক, শক্তিহীন, দাসী আর পুরুষাধীণ। পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা শেকড়স্থিত করা আছে-পুরাণে, ধর্মগ্রন্থে, সমাজে পরিবারে-রাষ্ট্রে এমনকি সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন সর্বক্ষেত্রে, নারীর জীবনের ছক বা মূর্তী তারাই করে দিয়েছে-নারীকে হতে হবে সতীসাধ্বী স্ত্রী, স্নেহময়ী মাতা, স্নেহার্দ্র কণ্যা, যত্নশীলা বোন কিংবা হৃদয়সর্বস্ব প্রেমিকা। নারীর এই ভাবমূর্তিগুলো পুরুষকর্তৃক প্রদত্ত বিধান। এর ব্যাত্যয় তাই পুরুষ বরদাস্ত করেনা। নারীর নেই কোন আলাদা সত্তা কিংবা আলাদা মত প্রকাশের যোগ্যতা। মানব হওয়া কিংবা মানবতা বোধ মানবিকতা তাদের জন্য নিষিদ্ধ পুরুষতান্ত্রিক এই ভাবাদর্শগুলোই নারীত্বের মধ্যে সমাহিত করা হয়। তাই কিছু নারী এই

Dhaka University Institutional Repository

পুরুতান্ত্রিকতা নিজের মধ্যে এমনভাবে গ্রোথিত করে নেয় যে নারীই তখন নারীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়।

পুরুষতন্ত্রের এ এক নতুন মাত্রা। অর্থাৎ তারা আছে সর্বক্ষেত্রে সর্ব বলয়ে সর্ব পরিস্থিতিতে। যখনই কোন নারী আত্মস্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে চাইবে তখনই যেন তার সর্বস্ব কেড়ে নেয়া যায় তার জন্য পুরুষতন্ত্র এক বৃহৎ কৌশলী মানদণ্ড তৈরী করে নেয় যার ফলে নারীর 'আত্ম' বা 'অহং' বলতে কোন কিছুই স্বীকার করেনা পুরুষতন্ত্র। নারীর এই আটপৌঢ়ে জীবন তাই সাহিত্যের ভূবনে কতখানি স্থান করে নিয়েছে নাকি কিছু প্রতিবাদও চলছে তা নিরিক্ষা করে নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা। তারা বিশ্লেষণ করে লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের চিন্তা চেতনা মনন শাসিত অধ্যায়গুলো। নারীর বহুমাত্রিক জীবন তাদের লেখনিতে উঠে এসেছে, পাওয়া যাচ্ছে নারীজীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবি। সেই সাথে তারা চেষ্টা করেছেন নারীকে তার অন্ধকার পথ থেকে আলোর পথে নিয়ে অসতে। সর্বোপরি তাদের সচেতন করতে যে 'নারী তোমরাও মানুষ' নারীকে করছে তারা অধিকার সচেতন। নারীরা তাই আজ সচেতনভাবেই সমাজের কাছে রাষ্ট্রের কাছে 'নারী প্রশ্নকে' তুলে এনেছেন।

> 'কেননা নারী প্রশ্ন সমাজে, মনোজগতে পুরুষের অবস্থান এবং নারী-নারী, নারী-পুরুষ এবং পুরুষ-পুরুষ সম্পর্ক বিচার করে, টেনে আনে সমাজকে। নারী প্রশ্ন নারী নামে পরিচিত মানুষদের নিছক কিছু অধিকার বা আর্তনাদের বিষয় নয়। এই প্রশ্ন অন্তর্ভূক্ত করে, টেনে আনে এমন অনেক বিষয় যেগুলোকে কুয়াশার আড়ালে ঢেকে রাখার জন্য সমাজ প্রভূরা যুগ যুগ ধরে প্রাণান্ত করছেন।'[৭]

সমাজ, পরিবার, পুরুষ কর্তৃক নির্যাতিত অসংখ্য নারী আজ এই নির্যাতন অবরোধ ভাঙার লড়াইয়ে নেমেছেন। পুরুষদের 'পৌরুষত্বে' জ্বালা ধরাতে, সামাজিক বিধি

Dhaka University Institutional Repository

বিধানের 'ঐশীত্ব' ভাঙতে, সমাজের ক্ষমতাবানদের 'আভিজাত্য' বা 'কর্তৃত্বকে' বিপর্যস্ত করতে সাহিত্য সমালোচনা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে :

> 'নারীর পূর্ণ মুক্তি নারী-পুরুষের সমান অধিকার আমাদের শেষ লক্ষ্য, পৃথিবীতে কোনো শক্তিই তাকে ঠেকাতে পারে না..... আর সেই লক্ষ্য পূরণ হওয়া সম্ভব তখনই যখন কিনা মানুষের উপর মানুষের শাসনের অবসান হবে।'[৮]

নারীর এই যে অধিকার বুঝে নেয়ার আন্দোলন তা তখনই স্বার্থক হবে যখন সমাজে এক শ্রেণীর দ্বারা অন্য শ্রেণী শাসিত হবে না। নারীর উপর থাকবে না পুরুষের প্রভূত্ব। আসলে নারী তার ন্যায্য অধিকার চায় সমাজের কাছে, রাষ্ট্রের কাছে। তার আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠা করতে চায়। নারীর এ সংগ্রাম নিজের প্রাপ্য বুঝে নেয়ার সংগ্রাম। সমাজে নারী, পুরুষে সমান অধিকার ভোগ করলেই একের উপরে অপরের আধিপত্য বিস্তারের মনোভাব বন্ধ করা সম্ভব হতে পারে। এজন্য নারী এবং পুরুষ উভয়েরই জীবনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আনতে হবে। হুমায়ুন আহমেদ 'নারী' বইতে পুরুষদের এই বোধকে ব্যঙ্গত্মক পরিচর্যায় এভাবে তুলে ধরেন:

> 'বাঙালী পুরুষ, সব জাতির পুরুষদের মতোই, নারী সাহিত্যিককে অনুমোদন করেনি, নারী সাহিত্যকে দেখেছে রান্না-বান্না বা সংসার সেবারূপে; নারী লেখকদের মধ্যে তারা খুঁজেছে আদর্শ স্ত্রীকে। নারী লেখক, বা তার লেখা মূল্যবান নয় পুরুষের কাছে; তাই বাঙালি নারী সাহিত্যের কোনো ইতিহাস আজো লেখা হয়নি। তাদের প্রতিভার প্রকৃতি বিচার ও মূল্যায়ন হয়নি; এমনকি তাঁদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্যও বেশ দুষ্প্রাপ্য।'[৯]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ পুরুষরা নারীদের লেখায় কোনো শৈল্পিকতা খোঁজেনি। সাহিত্যেও দেখতে চেয়েছে 'নারী সুলভ' বলে আখ্যায়িত সমাজের জেণ্ডারিক ভাবাদর্শ। হুমায়ুন আজাদ অন্যত্র পুরুষদের এই মনোভাবকে আরও সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষায়,

> 'ঝাঝ সৃষ্টির অধিকার শুধু পুরুষের; নারী ঝাঝ সৃষ্টি করবেনা, এমন কিছু করবে না যা পুরুষের অহমিকাকে পীড়িত করতে পারে। নারী যদি সাহিত্য সৃষ্টি করতেই চায় তাহলে সে এমনভাবে করবে, যা উপাদেয় হবে পুরুষের রসনায়।'[১০]

অর্থাৎ নারীরা সাহিত্য সৃষ্টিতে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করবে নারী তা-ও সমাজে অবস্থানকারী পুরুষদের মেনে নিতে কষ্ট হয়। 'নারী সম্পর্কে কল্পনার ভাবমূর্তি (image) এবং কল্পনার ফানুস (fantasy) কীভাবে গড়ে উঠল? নারী ও পুরুষের মধ্যে বাস্তব, বস্তুনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্পর্ক কী- পুরুষ তা বুঝতে বা যাচাই করতে উদ্যোগ নেয়নি; বরং তারা "আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে" নারী ও পুরুষের মধ্যে উদ্ভট সম্পর্ক কল্পনা করেছে। নারী সম্পর্কে, নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে, তারা ঐ মনগড়া ভাবমূর্তিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে নারীকে চিত্রিত করেছে। তাই ইতিহাসে নারীর যতটুকু উপস্থিতি দৃষ্ট হয়, তা নারীর বাস্তবতা নয়; পুরুষ কর্তৃক কল্পিত, পুরুষ কর্তৃক চিত্রিত নারীর ধারণা।

ইতিহাসের অন্যতম উপকরণ সমকালীন নাটক, নভেল, কবিতা, যাত্রা, গান, লোককাহিনী ও folklore। এ-সকল উপকরণের নারীর উপস্থিতি সনাতন ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ-নারী মা, বধূ বা প্রেয়সী হিসেবে চিত্রিত। গ্রিক ও রোমান নাট্যকার ও সাহিত্যিকদের রচনায় নারীকে পুরুষ প্রধান সমাজ কর্তৃক নির্দিষ্ট চরিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে; নারীর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশের অবকাশ রাখা হয়নি। এমনকি, শেকসপিয়ার, টলস্টয়, দান্তে বা শরৎচন্দ্র সনাতন সংস্কারের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। ফলে, সাহিত্যে নারীর আত্মপ্রকাশ ঘটেনি; পুরুষের কল্পনা প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছে। নারীর রূপায়ণে পুরুষের ইচ্ছা রূপায়িত হয়েছে এবং এই ইচ্ছা পুরুষের নিজস্ব ইচ্ছা; নারীর প্রকৃত পরিচয় নয়। সাহিত্যিক, কবি, গীতিকার নিজ নিজ কল্পনায় নারীকে উপস্থাপন করেছেন এবং ঐ উপস্থাপনে তাকে দিকনির্দেশনা দিয়েছে তৎকালীন পুরুষ প্রধান নারী-বিরোধী সামাজিক মূলবোধ ফলে সাহিত্যে আমরা যে-নারীকে পাই, সেই নারী নয়; নারী সম্পর্কে পুরুষের সৃষ্ট ভাবমূর্তি (man's image of women)। পুরুষ প্রধান সমাজ নারীর যে মূর্তি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কবি, কাব্যিক, গীতিকার, নাট্যকার, লোককবি সেই পুরুষসৃষ্ট মূর্তিকে প্রচার করেছে।'[১১]

এভাবেই নারী সমাজে-সাহিত্যে বিনির্মিত হয়েছে পুরুষ দৃষ্টিকোণ থেকে। পুরুষ তাদের সামাজিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করতেই নারীকে মেয়ে, মাতা, পেয়সী কিংবা বধূ হিসেবে সন্নায়িত করেছে। এটা করেছে তারা নারীর উপর কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আরোপ করে। অর্থাৎ সমাজে মাতার কি ভূমিকা হবে, বধূর কি ভূমিকা, মেয়ে কিংবা প্রেয়সীর কি ভূমিকা বা আচরণ থাকবে তা পুরুষ কর্তৃক ঠিক করে দেয়া হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় যেমন, সাহিত্যে, দর্শনচিন্তায়, রাষ্ট্রনীতিতে, শিক্ষানীতিতে, অর্থনীতিতে, ধর্মনীতিতে, সমাজনীতিতে, আইনী বলয়ে কিংবা ইতিহাসে সর্ব ক্ষেত্রেই নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে পুরুষের ইচ্ছাধীন করে। নারীবাদ নারীর এই দুর্বল আর একপেশে উপস্থাপনের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। নারীকে তার জৈবিক, মানবিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করার প্রচেষ্টা চালায়। সাহিত্যে নারীকে কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য সমালোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। এর মাধ্যমে সমালোচকগণও নারীসত্তার বোধ ও স্বরূপ উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। সাহিত্যে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবকে উচ্চকিত করা হয়েছে পক্ষান্তরে নারীর ভূমিকাকে করা হয়েছে অবমূল্যায়ন। পুরুষতন্ত্র যা করেছে অর্থাৎ আধিপত্য বিস্তার, এই আধিপত্য নারীর কাম্য নয়। নারীদের এই ভাবনাগুলোই সাহিত্য সমালোচনার পাতায় হার্দ্যিক উচ্চারণে উচ্চকিত হয়ে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১. মঈন চৌধুরী, ভাষাভিত্তিক সাহিত্য-সমালোচনাতত্ত্ব প্রসঙ্গঃ সাহিত্যে তার প্রয়োগ, উলুখাগড়া, প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১২ ফেব্রুয়ারী ২০০৬, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, মিরপুর, ঢাকা, পৃ-২৪২-২৪৩

২. আকিমুন রহমান, বিবি থেকে বেগম, অঙ্কুর প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী-২০০৫, ভূমিকা।

৩. প্রাগুক্ত, ভূমিকা

৪. প্রাগুক্ত, পৃ-৪২

৫. রাশিদা আখতার খানম, নারীবাদী চিন্তা ও মতিজানের মেয়েরা, উলুখাগড়া, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ২০০৬। পৃ-১৭৮

৬. বিবি থেকে বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৬

৭. আনু মুহম্মদ, নারী পুরুষ ও সমাজ, বই মেলা-১৯৯৭, সন্দেশ বই পড়া, ঢাকা, ভূমিকা

৮. আগস্ট বেবেল, পূর্বাভাষ, নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে, অনুবাদঃ কনক মুখোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ, এপ্রিল-১৯৯০, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃ-২০

Dhaka University Institutional Repository

৯. হুমায়ুন আজাদ, নারী, ডিসেম্বর-২০০৮, আগামী প্রকাশনী তৃতীয় সংস্করণ দশম মুদ্রণ ঢাকা। পৃ-৩৩৫

১০. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩৪

১১. মাহমুদা ইসলাম, নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪১০, ফেব্রুয়ারি-২০০৪, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ-১৫-১৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা ছোটগল্পে নারীজীবন : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

Dhaka University Institutional Repository

'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়ই ভুসুকু অহেরী ॥'[১]

আপন মাংসের জন্যই হরিণ সকলের শত্রু। এক মুহূর্তের জন্যও শিকারী ভুসুকু তাকে ছাড়েনা। অর্থাৎ হরিণ তার আপন মাংসের জন্যই নিজেই নিজের শত্রু।

চর্যাপদের এক পদকর্তার এই অপূর্ব কল্পচিত্রের হরিণকে নারীর রূপকার্থে ব্যবহার করলে সমাজ-জীবনে নারীর অবস্থানের রূপটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে। হাজার বছরের পুরোন বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদের' এ চিত্র আধুনিক সভ্যসমাজেও বিরাজমান। যুগে যুগে তা প্রথা হয়ে সমাজে বিচরণ করছে। সমাজের প্রতিবিম্ব স্বরূপ সাহিত্যেও এর প্রভাব তাই অনস্বীকার্য। বাংলা ছোটগল্পও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। এখানেও ফুটে উঠেছে নানা বিচিত্রতায়, নানা বর্ণিলতায় নারী জীবনের নির্বেদ। ছোটগল্পকারদের গল্পে নারী ও নারী বিষয়ক চিন্ত-চেতনার ভিন্ন মাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সময়ের যে বিবর্তন ধারা যার প্রভাব মানুষের জীবনে-মননে কঠিন ছাপ ফেলে যায়, তারই শিল্পিত চিত্রায়ণ ছড়িয়ে আছে ছোটগাল্পিকদের গল্প ভুবনে।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে ইউরোপীয়ানদের মাঝে যে ছোটগল্পের উদ্ভব তা কালক্রমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য এই সাহিত্যের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাভাষায়ও কিছু ছোটগল্প রচিত হয় যা শিল্পের বিচারে সার্থক না হলেও সার্বিক বাংলা সাহিত্যে একটি গভীর প্রভাব ফেলে যায়। উনিশ শতকের শেষ দশকে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের যাত্রার অভিযাত্রীগণ ছিলেন-সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯), স্বর্ণ কুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) তাঁদের হাতে ছোটগল্পের যাত্রা শুরু হলেও শিল্পীত রূপ-রূপান্তরে বাংলা ছোটগল্পের মুক্তি ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) হাতেই। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প 'মধুমতী' ১২৮০ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশের মধ্য

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েই ছোটগল্পের রূপ উঠে আসে। এরপর স্বর্ণকুমারী দেবীই প্রথম ছোট-ছোট গল্পের সংকলন বের করেন যার নামও দেন-'নব কাহিনী বা ছোট ছোট গল্প (১৮৯২)। যা বেশির ভাগ 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপা হত। 'গহনা' 'সন্ন্যাসিনী', 'প্রতিশোধ', 'যমুনা' 'অমরগুচ্ছ' 'আমার জীবন' 'লজ্জাবতী' এই গল্পগুলো উল্লেখযোগ্য হলেও এগুলো সর্বোপরি শিল্প সার্থক হতে পারেনি। তবুও বাংলা সাহিত্যে তার এ অবদান অবশ্যই স্বীকার্য। কালিক ধারায় উপাখ্যান বা রূপকথার পথ ধরে ছোটগল্পের সার্থক উত্তোরণ ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ভাবনায়। ঊনবিংশ শতকের রেনেসাঁস বলয় উন্মেষ ঘটায় ব্যক্তি স্বাতন্দ্র্যের। ব্যক্তিক উপলব্ধি থেকে ব্যক্তি নিজেকে জানতে বা বুঝতে শেখে। সেখান থেকেই তৈরী হয় ব্যক্তির মনন জাগরণ। তখনই ব্যক্তি জড়িয়ে যায় দ্বৈরথ দ্বন্দ্বে। শুরু হয় আভ্যন্তর ও বহিরান্ত র জগতের টানাপোড়েন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকাশ পায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের। এই বোধ ও বোধোদয় ছোটগল্পের নির্মাণ শৈলীতে পরিলক্ষিত হয়। যার সার্থক প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলোতে লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে। বাংলা ছোটগল্পের ধারা তাঁর হাতেই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর জীবনবোধ ও জীবনদৃষ্টি শৈল্পিক রূপ-রেখায় ছোটগল্পের জগৎকে করেছে ঋদ্ধ। ছোটগল্পের রূপ বৈচিত্র সৃষ্টিতে তাঁর অবদান ছিল তুলনাহীন। তাঁর রচিত গল্পগুলোতে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ভাব-ভাবনা প্রাতিস্বিক রূপ লাভ করেছে সার্থক ছোটগাল্পিক ছাঁচে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছোটগল্পে সমকালীন গ্রামীণ মধ্যবিত্ত জীবনের নানা দিক নানা মাত্রায় চরিত্রগুলোর মধ্যদিয়ে বিস্ময়করভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর প্রথম গল্প 'ভিখারিনী' থেকে 'পণরক্ষা' প্রতিটি গল্পেই বিধৃত হয়েছে সেই সময়ের নর-নারীর জীবন ও জীবনাবেগ। বিশেষ করে নারীর জীবন। বোধ-মনন-চেতন-নারীর হার্দ্য-হৃদয়িক জটিলতা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অঙ্কন করেছেন তিনি।

ঊনিবিংশ শতাব্দীর সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে সমাজে নানা কুসংস্কার আর নানা প্রথার চালু হয়। তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় এগুলোর দ্বারা নিগৃহীত হয় নারীর জীবন। এ সবকিছুই উঠে এসেছে তার অনেকগুলো ছোটগল্পে।

Dhaka University Institutional Repository

এ ধারার গল্প যেমন 'দেনা-পাওনা' (১২৯৮) 'হৈমন্তী' (১৩২১) গল্পে উঠে এসেছে পণ প্রথার মর্মস্পর্শী চিত্র। দুটো গল্পেই লেখক নারীর অহংবোধের রূপটি সুন্দরভাবে এঁকেছেন কিন্তু তা স্থায়ী হতে পারেনি সমাজ বাস্তবতায় পুরুষতান্ত্রিকতার অবাধ বিচরণে। বেদনাদীর্ণভাবে নারীকে বরণ করতে হয়েছে সহজ মৃত্যুকে। তারপরও লেখক তাদের ভেতর দিয়ে যে আত্ম মর্যাদার বাণী শুনিয়েছেন তা হৃদয় ছোঁয়া। 'দেনা-পাওনা' গল্পে নায়িকা নিরূপমা পণপ্রথায় বন্দী জীবন যাপন করেছে শ্বশুর বাড়ীতে। বিয়ের সময় যে পণের চুক্তি হয়েছিল তা তার বাবা রামসুন্দর পরিশোধ করতে না পারায় নিরুপমা পিতার বাড়ি যাওয়ার অধিকার হারিয়ে ফেলে। তখন তার পিতা একমাত্র সম্বল বসতবাড়ি বিক্রি করে পণের টাকা শোধ করতে আসলে নিরুপমা নিজেই তাতে বাঁধা দিয়ে বলে:

> 'টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম! না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করো না।'[২]

যদিও এ টাকা নিরুপমা ফিরিয়ে দেয়ার কারণে মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে তাকে। তবুও তার অহংবোধ মৃত্যুর কাছে পর্যন্ত মাথা নত করেনি। আ-মৃত্যু সে তার নীতিতে ছিল অটল।

রবীন্দ্রনাথের আরও কিছু ছোটগল্প যেমন, 'দিদি' (১৩০১), 'মানভঞ্জন' (১৩০২) 'প্রতিহিংসা' (১৩০২), 'মনিহারা' (১৩০৫), 'দৃষ্টিদান' (১৩০৫), 'উদ্ধার' (১৩০৭) গল্পগুলোতে নারীর আত্ম-উন্মেষের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের প্রতিবাদের ভাষাও ছিল বেশ কঠিন এবং অভিনব। 'দিদি' গল্পে দিদি শশী ছোটভাইকে বাঁচাতে গিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে স্বামীর উপস্থিতিতেই সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেট-

Dhaka University Institutional Repository

সাহেবের কাছে নালিশ করেছে। তখন শশীর স্বামী 'জয়গোপাল বিবর্ণমুখে ছটফট্ করিতে লাগিল।' ভাই নীলমনিকে সাহেবের হাতে দিয়ে শশী বল্ল,-

> 'সাহেব, যতদিন নিজের বাড়ি ও না ফিরিয়া পায় তত দিন আমার ভাইকে বাড়ি লইয়া যাইতে সাহস করি না। এখন নীলমানিকে তুমি নিজের কাছে না রাখিলে ইহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।'[৩]

-এখানে শশীর মধ্যে নারীর ব্যক্তিত্বকে প্রতিবাদীরূপে তুলে ধরা হয়েছে। নারী যে কেবল পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার কাছে আত্মসমর্পণ করেনা, প্রতিবাদও করে তারই চিত্রায়ণ। যদিও এ গল্পের শেষে এবং ঘটনার কয়েকদিন পরেই দিদি শশীকে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে। সমাজে তার মৃত্যু নিয়ে এতটুকু গুঞ্জনও কেউ তোলেনি। কারণ, সমাজের নারী-পুরুষ পুরুষতান্ত্রিকতায় আত্মস্থ হয়ে এটাই ভেবেছে যে, যে নারী স্বামীর বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে সে নারীর মৃত্যু হওয়া উচিত।

'মানভঞ্জন' গল্পে গোপীনাথ শীল তার স্ত্রী গিরিবালাকে উপেক্ষা করেই দিনের পর দিন থিয়েটারের নটী নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করত। তাই একদিন গিরিবালা গোপনে থিয়েটার দেখতে যায়। তারপর তার অনুভূতির শেকল নড়ে ওঠে। সে ভাবতে শেখে- 'সে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তুচ্ছ সাধারণ নারীমাত্র নহে।' গোপিনাথ তাকে চরমভাবে অপমান করলে গিরি আত্মহত্যার চিন্তা করেছিল,

> 'কিন্তু তখনই মনে পড়িল, তাহাতে কাহারও কিছু আসিবে যাইবে না-পৃথিবীর যে কতখানি ক্ষতি হইবে তাহা কেহ অনুভবও করিবে না। জীবনেও কোনো সুখ নাই, মৃত্যুতেও কোনা সান্তনা নাই।'[৪]

Dhaka University Institutional Repository

তখন প্রতিবাদ স্বরূপ গিরিবালা নিজেই থিয়েটারের নটী সেজে অভিনয় শুরু করে। 'মনোরমা' যাত্রার অভিনয় করতে করতে গিরি-

> 'এক অনির্বচনীয় গর্বে গৌরবে গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া সমস্ত দর্শক মন্ডলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া সম্মুখবর্তী গোপীনাথের প্রতি চকিত বিদ্যুতের ন্যায় অবজ্ঞাবজ্জ্রপূর্ণ তীক্ষ্ম কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।'[৫]

তখন 'গোপীনাথ পাগলের মতো ভগ্নকণ্ঠে চিৎকার করিতে লাগিল, "আমি ওকে খুন করব, ওকে খুন করব।' গিরির এই প্রতিবাদ, নির্যাতনকারী সমাজের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ এক তীক্ষ্ম কটাক্ষ। গিরির জীবনবোধ মুক্তিবাদী নারীর যুগচেতনার স্বাক্ষর। 'নষ্টনীড়' গল্পে দেখা যায়, নায়িকা চারুলতা স্বামীর অবহেলায় ক্রমশঃ খেলার সাথী অমলকে নিজের অজান্তেই ভালবেসে ফেলে। স্বামী ভূপতি যখন বাইরের জগৎ গুটিয়ে চারুর কাছে আসে তখন চারুর মন অনেক দূরে চলে যায়। সে শুধু সমাজে আপন কর্তব্য পালন করে মাত্র। ভূপতি বুঝতে পারল চারুর হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করা হয়। তখন সে পালাতে চেয়েছিল। পরে চারুর অবস্থা দেখে ভূপতি তাকে সঙ্গে করেই নিতে চাওয়ায় চারু সর্বশেষে "না, থাক্" বলে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। দাম্পত্য জীবনের এই বিমুক্তভাব শুধু পরিচর্যার অভাবের কারণেই হয়েছে। স্ত্রী একজন নারী বা মানুষ হিসেবে তার যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, আছে মন তা অনেক পুরুষ স্বামীই বুঝতে চায়না। যার ফলে পরিবারে নির্যাতিত হয় নারীরা, ভেঙে যায় দাম্পত্য জীবনের সমস্ত বন্ধন। 'মধ্যবর্তিনী' (১৩০০) গল্পে দেখা যায়, সন্তান না হওয়া স্ত্রী হরসুন্দরী স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে দেয়। তখন নতুন বউ নিয়ে স্বামী নিবারণের উচ্ছ্বাস দেখে মনে মনে হরসুন্দরী নিজের জীবনের ফেলে আসা সময়ের পাতা উল্টিয়ে দেখেঃ

> 'আজ আর কী লইয়া তোতে আমাতে তুলনা হইবে। কিন্তু এক সময় আমারও তো ঐ বয়স ছিল, আমিওতো অমনি যৌবনের শেষ রেখা পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

ভরিয়া উঠিয়াছিলাম, তবে আমাকে সে কথা কেহ জানায় নাই কেন। কখন সে দিন আসিল এবং কখন সেদিন গেল তাহা একবার সংবাদও পাইলাম না।'[৬]

-এখানে শৈলবালাকে দেখে হরসুন্দরী নিজেকে নিয়ে ভাবতে শিখেছে। কোথায় তার অমর্যাদা হয়েছে তা বুঝতে পেরেছে। শৈলবালার মত তারও জীবনে যৌবন এসেছিল, যা স্বামী নিবারণ এমন করে তাকে বুঝিয়ে দেয়নি। স্বামীর প্রতি হরসুন্দরীর ভালোবাসার যে একনিষ্ঠতা তাই তার মধ্যে জন্ম দিয়েছে এক তীব্র আত্মঅহমিকার। যে অহংকারের ঔদ্ধত্যে সে নারী জীবনের সবচেয়ে কষ্টের যে অধ্যায় অর্থাৎ সতীন নিয়ে সংসার যাপন তা সে করতে পেরেছে। যদিও বাস্তব অবস্থা তাকে বারবার আঘাত করেছে। জীবনের একটা পর্যায়ে এসে সে এক সময় কঠিন বেদনাময় অভিজ্ঞতায় চেতনা ফিরে পেয়েছে। সতীন শৈলবালার ভেতর দিয়ে সে এতদিনে বুঝতে পারল-সংসার-যাত্রায় কি ঐশ্বর্য তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিল। তার এই আপন উপলব্ধিক চেতনার প্রকাশ বড় করুণ হয়ে হৃদয়ে বাজেঃ

'হরসুন্দরী একটা নূতন বেদনার পরিচয় পাইল। এ কিসের আকাঙ্খা, এ কিসের দুঃসহ যন্ত্রণা। মন এখন যাহা চায় কখনো তো তাহা চাহেও নাই। কখনো তো তাহা পায়ও নাই।'[৭]

হরসুন্দরী তার অতীতের যাপিত জীবনে দৃষ্টি দিয়ে দেখল কেবল দৈনন্দিনতায় কিভাবে সময় পার করেছে। তখন ছিল শুধুই লৌকিকতার কর্তব্য আলোচনা তাতে দুটো প্রাণে অন্তর্বিপ্লবের কোন স্থান ছিলনা। ভালবাসায় ছিল কেবল অনুজ্জলতার উত্তাপ। তাইতো আজ তার মনে হলো,

'জীবনের সফলতা হইতে যেন চিরকাল কে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদয় যেন চিরদিন উপবাসী হইয়া আছে। তাহার এই

Dhaka University Institutional Repository

নারীজীবন বড়ো দারিদ্র্যেই কাটিয়াছে। সে কেবল হাটবাজার পানমসলা তরিতরকারির ঝঞ্ঝাট লইয়াই সাতাশটা অমূল্য বৎসর দাসীবৃত্তি করিয়া কাটাইল, আর আজ জীবনের মধ্যপথে আসিয়া দেখিল তাহারই শয়নকক্ষের পার্শ্বে এক গোপন মহামহৈশ্বর্যভান্ডারের কুলুপ খুলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা একেবারে রাজরাজেশ্বরী হইয়া বসিল।'[৮]

শৈলবালার এই 'রাজরাজেশ্বরী' ভাব তার মৃত্যুর পরও থেকে গেল হরসুন্দরীর দাম্পত্যজীবনের মাঝখানে। নারী সে তার আত্মাধিকার সচেতন হলে এভাবেই বেঁচে থাকতে পারে সর্বত্র। ব্যক্তি সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আত্মজাগ্রত নারী প্রেম আর সংগ্রামের দ্বৈরথ মানতে রাজি নয়। 'নিশিথে' 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে এরই অতলান্ত শূন্যতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তিনসঙ্গী' পর্বের নারী চরিত্রগুলো জীবন-চেতনায় ভরপুর করে সৃষ্টি করেছেন। এখানকার নারী প্রাচীন সামাজিক রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করে নতুন ব্যক্তিত্বে জেগে উঠেছে। 'রবিবার' 'ল্যাবরেটরী' গল্পে দেখা যায় জ্ঞানবুদ্ধিতে উজ্জ্বল এবং আধুনিক মন-মানসিকতায় প্রাণবন্ত নারী চরিত্র। যারা তাদের পছন্দ অপছন্দকে প্রগতিশীল ভাবনায় রাঙাতে পেরেছে। তাইতো ল্যাবরেটরী গল্পের নীলা যৌবনের উদ্দামতায় উদ্দিপিত হয়ে সমাজ-ধর্ম-ঐতিহ্যকে সহজেই অবজ্ঞা করে বলতে পারে-

'এই দেহটার' পরে আমাদের তো কোনো মোহ নেই, আমাদের কাছে এর দাম কিসের-আসল দামি জিনিস ভালোবাসা, সেটা কি বিলিয়ে ছড়িয়ে দিতে পারি!' বলে চেপে ধরে রেবতীর হাত। রেবতী তখন অন্যদের বলেই মনে করে ভাবে ওরা ছোবড়া নিয়েই খুশি, শাঁসটা পেল না।'[৯]

Dhaka University Institutional Repository

সব মিলিয়ে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগাল্পিক ভূবনে সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলো বিচিত্র মন-মানসিকতার অধিকারী। আর্থ-সামাজিক-ঐতিহাসিক ধার্মিক ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপটে তাঁর নারী চরিত্রগুলোর ভেতর দিয়ে রচিত হয়েছে বাঙালি নারীর চিরন্তনী প্রতিচ্ছবি। বহুকৌণিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি রচনা করেছেন বাংলাদেশের নারীদের সামগ্রিক ছবি। সবুজপত্র (১৯১৪) যুগের গল্পগুলোতে দেখা যায় সনাতনী মূল্যবোধের বিরুদ্ধে নারীর ব্যক্তিক বিদ্রোহ।

'স্ত্রীরপত্র' 'পয়লা নম্বর', 'বোষ্টমী', 'পাত্র ও পাত্রী', 'নামঞ্জুর গল্প', 'চোরাইধন', 'হৈমন্তী', 'রবিবার', ল্যাবরেটরী', 'হালদার গোষ্ঠী' ইত্যাদি গল্পগুলোতো নারী-অধিকার ও নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনাকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃনাল-কে তাই সহজেই বলতে শুনি,

> 'আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ-নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।'[১০]

মৃণাল তর স্বামীর ঘরে পনের বছর নিগৃহীত বন্দী জীবন-যাপন করে। সে সময় জায়ে'র ছোটবোন বিন্দুর অপমৃত্যু তার কাছে অসহনীয় মনে হয়। সে তখন গৃহত্যাগ করে স্বামীকে চিঠি লিখে তার মর্মবেদনা জানিয়ে দেয়। এই জানিয়ে দেয়ার মধ্যেই তার উপলব্ধিক চেতনাগত বিদ্রোহী রূপটিও প্রকাশ পায়। হৈমন্তী দুঃখ ভোগ করেছে, প্রশ্ন তুলেছে কিন্তু প্রতিবাদ করেনি। মৃণালের ভেতরই পাওয়া গেল আত্ম-উন্মেষ। এখানেই ঘটল নারীর আত্মমুক্তি ও ব্যক্তিত্বের জাগরণ। জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি-অভিলাষী এক নারীর আপন উৎসে প্রত্যাবর্তনের শব্দচিত্র আছে 'পয়লা নম্বর' গল্পে। নায়িকা অনিলার স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া আর চিঠির ভাষায় সেই চিত্র দেখতে পাই:

Dhaka University Institutional Repository

'আমি চললুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করো না। করলেও খুঁজে পাবে না।' [১১]

'পয়লা নম্বর' গল্পের অনিলা তার স্বামী এবং প্রেমিককে একই বাণী দিয়ে চিঠি লিখে হয়ে যায় নিরুদ্দেশ। জগৎ-সংসার থেকে, 'স্ত্রী বলে একটা সজীব পদার্থ' এর ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় অনিলা। এভাবেই নারী তার অবস্থা ও অবস্থানকে নতুন করে চিনতে শিখে। চেতনার বিন্যাসে স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রাখে তাদের পথ চলা।

রবীন্দ্রযুগের সমসাময়িক আরেক দিকপাল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) আমাদের বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য অধ্যায়। যাঁর লেখনীতে বাংলার নারীরা উঠে এসেছেন বিভিন্ন বর্ণে চিত্রায়িত হয়ে। সনাতনী ভাব-ভাবনা কিংবা আধুনিকতার ছোঁয়ায় তার রচিত প্রতিটি নারী চরিত্র হয়ে আছে ভাস্বর। উপন্যাসের মতো তার ছোটগাল্পিক জগৎও নারীর সার্বিক উন্মোচনে ঋদ্ধশালী। জীবন-সন্ধানী শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখনিতে স্বাক্ষর রেখেছেন বাস্তবধর্মী চিত্র চিত্রায়ণে। তিনি অনেক নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যারা সমাজের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং আত্ম সচেতন। কখনোবা সমাজে উপেক্ষিত মানুষের জীবনপ্রেম তিনি পরম মমতায় অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। শরৎচন্দ্রের আঁকা নারী চরিত্রগুলোতে পাওয়া যায় সমাজ দ্বারা প্রভাবিত মানবমনের নানা দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ছবি। নারী-হৃদয়ের প্রণয় আকাংখা আর ধর্মীয় কিছু সংস্কার এ দুই শক্তির টানাপোড়েন নিয়ত তার চরিত্রগুলোতে একটা আদর্শ আবহ তৈরী করেছে। নারীর প্রতি রয়েছে তার অপরিসীম সহমর্মিতা। শাশ্বত বাঙালী নারীর মনোচেতনাগত জগৎ অনুপম ব্যঞ্জনায় উঠে এসেছে। আবেগ ও স্বপ্নের সম্পর্ক, নারীর অনুধ্যান, মোহ, ভালবাসা, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল অন্তর্দ্বন্দ্ব, নারীর রহস্যময়তা কালিক অভিজ্ঞতায় জ্যামিতিক পারিপাট্যে ছান্দসিক রঙের আভায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের ছোটগাল্পিক প্রতিভার প্রকাশ দেখা যায় তার অনেকগুলো ছোটগল্পে 'দর্পচূর্ণ,' 'মন্দির', 'বিন্দুর

Dhaka University Institutional Repository

ছেলে,' 'মহেশ', 'বিলাসী', 'পথ নির্দেশ,' 'ছবি', 'সতী', 'মামলার ফল', 'পরেশ', 'বোঝা', 'অভাগীর স্বর্গ', 'রামের সুমতি', 'অনুপমার প্রেম', 'বিন্দুর ছেলে', 'কালীনাথ' প্রভৃতি গল্পগুলো উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি গল্পেই নারী চরিত্রগুলো আপন আলোয় ভাস্বর আলোকিত হয়ে আছে।

জীবন সন্ধানী শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায় তার অনেক গল্পে। 'বিলাসী' গল্পে তার এই আবেদন অতি বাস্তবরূপ লাভ করে। বিলাসী চরিত্রে লেখক নারী-হৃদয়ের যে অনির্বচণীয় প্রেম তাকে চিরায়ত রূপে রূপদান করেছেন। বিলাসী নির্জন গৃহে বনের মধ্যে একটি রোগাক্রান্ত রোগী মৃত্যঞ্জয়কে পরম সেবায় যত্নে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে। এখানে বিলাসী মমতাময়ী এক নারীর প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। লেখক বিলাসীর মধ্যে নারীর সেবাপরায়ণ মনের ভাবটি ঐতিহ্যিকভাবে প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' গল্পটিতে তিনি অপর্ণার মন্দির প্রীতি বিশেষ করে তার শৈশবের প্রথম উপলব্ধি করা পিতা জমিদার রাজনারায়ণ বাবুর গড়া মন্দির। সে তার পিতার সাথে প্রতিদিনই 'ঠাকুরের আরতি দেখিতে আসিত এবং এই মঙ্গল-উৎসবের মধ্যে অকারণে বিভোর হইয়া চাহিয়া থাকিত।'[১২] তার এই বিভোর ভাব গল্পের শেষপর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকে। বয়স হলে স্বামীগৃহে যায় অর্পণা কিন্তু তার মন পরে থাকে আশৈশব লালিত মন্দিরটির প্রতি। তাই সে দৈনন্দিন ঘরকন্না করলেও-

> 'কেবলি তাহার মনে হইতে লাগিল, দিনগুলি মিছা কাটিয়া যাইতেছে। আর এই যে অলক্ষ্য আকর্ষণে তাহার প্রতি শোনিত-বিন্দু সেই পিতৃ প্রতিষ্ঠিত মন্দির-অভিমুখে ছুটিয়া যাইবার জন্য পূর্ণিমার উদ্বেলিত সিন্ধুবারির মত হৃদয়ের কুলে উপকুলে অহরহঃ আছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার সংযম কিসে হইবে? ঘর-কন্নার কাজে, না ছোট-খাট হাস্য-পরিহাসে?'[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

এজন্য স্বামীর আদর-স্নেহও তাকে জীবনের দিকে টানতে পারেনা। একদিন স্বামী অমরনাথ ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করল। এরপর অপর্ণা পিতার হাত ধরে 'দেবতার আহ্বানে' আবার সেই মন্দিরে ফিরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এখানে লেখক নারী-হৃদয়ে যে শাশ্বত ধর্মীয় অনুভূতির প্রগাঢ়তা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে তারই সংবেদী রূপ উন্মোচিত করেছেন।

নারীর অন্তহীন অন্তর্দ্বন্দ্ব আর, বহির্দ্বন্দ্ব কি নিদারুন যন্ত্রণায় পর্যবসিত করে তারই শব্দরূপ 'পথনির্দেশ' গল্পটি। শরৎচন্দ্রের 'ছবি' গল্পটিতে দেখা যায়, যে ছবির জন্য নায়ক বা-থিন একনিষ্ঠ-নিমগ্ন থেকেছে যার উপর বিরক্ত হয়ে নায়িকা মা-শোয়ে বা-থিনকে কাছে পায়নি-তাকে অপমান করেছে সেই ছবি অবশেষে বা-থিন বিক্রি করতে পারেনি কারণ,

> -'আর তাহার বুঝিতে বাকী নাই, এতদিন এই প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সে হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে যে সৌন্দর্য যে মাধুর্য বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে, দেবতার রূপে যে তাহাকে অহর্নিশি ছলনা করিয়াছে সে জাতকের গোপা নহে, সে তাহার-ই মা-শোয়ে।'[১৪]

অর্থাৎ বা-থিন দেবতার ছবি আঁকতে গিয়ে তার অগোচরেই তারই প্রণয়ীনি মা-শোয়ের মুখচ্ছবি এঁকেছে। এদিকে অভিমানাহত মা-শোয়ে বা-থিনকে পরিত্যাগ করে 'একবারে পাহাড়ের মত কঠিন ও অচল' হয়ে গেছে কিন্তু যখন বা-থিন অসুস্থ হল, তার ফ্যাকাসে মুখ দেখে মা-শোয়ের মধ্যে সেই চিরাচরিত নারীহৃদয় কেঁদে উঠল। সে তার ভালবাসার দুর্জয় শক্তি দিয়ে বা-থিনের পথ আটকাল। বা-থিন বিস্ময়ে চেয়ে দেখল মা-শোয়ের চেহারা একমুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে গেছে-

Dhaka University Institutional Repository

'সে-মুখে বিষাদ, বিদ্বেষ, নিরাশা, লজ্জা, অভিমান-কিছুরই চিহ্নমাত্র নাই, আছে শুধু বিরাট স্নেহ ও তেমনি বিপুল শঙ্কা। এই মুখ তাহাকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিল।'[১৫]

এভাবেই ভালবাসার ক্ষেত্রে নারী-মন বারবার বিগলিত হয়। লুটিয়ে পড়ে, ত্যাগ করে আপন সিংহাসন। শরৎচন্দ্র একেই অজস্র ধারায় প্রবাহিত করেছেন তার ছোটগল্পগুলোর নারী চরিত্রের ভেতর। তাঁর জীবন-চেতনা গল্পের গভীরে এমনভাবে আলোড়িত হয়েছে যার ফলে তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলো অনেকবেশি জীবন ঘনিষ্ঠ ও বাস্তবনিষ্ঠ। সমাজ ভাবনা আর মানবতাবোধ তাঁর রচনাকে আরো বেশি রসগ্রহী ও আবেদনময়ী করেছে।

'জাগো মাতা, ভগিনী, কন্যা-উঠ,
শয্যা ত্যাগ করিয়া আইস; অগ্রসর হও।'[১৬]

এই অমিয় আহ্বান জানিয়েছেন বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। যার চিন্তা-চেতনায় ছিল শুধুই নারীদের উন্নয়ন। নারী তার অধিকার সচেতন হোক, আপন ব্যক্তিত্বের আলোয় আলোকিত হোক। মনের জড়তা-সংস্কার কাটিয়ে জীবনবাদীরূপে সমাজ আত্মপ্রকাশ করুক- এই ছিল তাঁর জীবন সাধনা। নারীর মুক্তি ও তার ব্যক্তিত্ব-বিকাশকে তরান্বিত করার জন্য তার ছিল প্রাণান্ত প্রয়াস।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন লেখনী ধরেছিলেন বাঙালী নারীর সার্বিক মুক্তির কামনায়। তাঁর 'মতিচুর' ও 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থের কতগুলো গল্পে যা বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার বর্ণনা। যার মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন তৎকালীন সমাজে 'নারীর পর্দা' নামে যে নারীত্বের ও মনুষ্যত্বের অবমাননা চলছিল তার বিশদ ব্যাখ্যা। ঐতিহ্যিক ভাবেই সমাজে অবরোধের এ কুসংস্কার নারীকে অবহমানকাল ধরে পুরুষের

Dhaka University Institutional Repository

মুখাপেক্ষী করে রেখেছে। তাঁর পরিবেশিত গল্পগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে নারী সমাজের অবরুদ্ধ অবক্ষয়ি চিত্রের শিল্পরূপ। ধর্মের নামে সমাজ নারীদের কতটা দুর্দশাগ্রস্ত করে রেখেছিল তারই নির্মাণ সেখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'বাঙালী মুসলমান সমাজে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও নারী স্বাধীনতার জন্য লেখনি ধরেছেন, হয়েছেন প্রতিবাদী এক নারী।' সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি বহুমাত্রিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সেজন্য তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন নারী শিক্ষার প্রসারে। নারীর সার্বিক কল্যাণ সাধন-কল্পেই নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি এবং নারীর অবরোধ প্রথার অবসান করার জন্যই তিনি সমাজ সংস্কার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। যা আজও আমাদের নারীমুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রাখছে। আন্দোলনকে করছে গতিশীল এবং বেগবান। রোকেয়ার দেখান সেই পথ, তার চেতনা ও আদর্শ নারী সংগঠনকে আরো উদ্যমী ও অনুপ্রাণীত করছে।

> 'বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যে! আমরা জড় অলঙ্কার-রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ!'[১৭]

'আমরা মানুষ' -নারীর চিরন্তন এই যে প্রত্যাশা তা সমাজে পুরুষ কর্তৃক প্রতিমূহুর্তে ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে এটাই রোকেয়া সাখওয়াত হোসেন সহ্য করতে পারেন নি। তিনি নিরলস সবাইকে ডেকে গেছেন। বাঙালী নারীদের ঘোরলাগা সমাজের কুপমন্ডুকতা কাটিয়ে আপন শক্তিতে উঠে দাঁড়াবার আহবান জানিয়েছেন। তার 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থে বাঙালী সমাজে পর্দার নামে অবরুদ্ধ নারীর জীবন-যন্ত্রণা তাদের দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে। নারী নির্যাতনের নিষ্ঠুরতা, বীভৎসতাকে তিনি অত্যন্ত সহমর্মিতার ছোঁয়ায় তুলে এনেছেন। নারীকে তার অন্ধকার পরিবেশ থেকে মুক্তিদান এবং সমাজে নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে রোকেয়া একদিকে লেখনি দিয়ে অন্যদিকে স্বীয়

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে চেষ্টা করেছেন। 'অবরোধ-বাসিনী'র ভূমিকায় আবদুল করিম সাহেব লিখেছেন-

> 'অবরোধ-বাসিনী' লিখিয়া লেখিকা আমাদের সমাজের চিন্তাধারার আর একটা দিক খুলিয়া দিয়াছেন।....যে মুসলিম সমাজ এককালে সমস্ত জগতের আদর্শ ছিল, সেই সমাজের এক বিরাট অংশ এখন প্রায় সমস্ত জগতের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ...কোথায় বীরবালা খাওলা ও রাজিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক পুরুষ যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, আর কোথায় বঙ্গীয় মুসলিম নারী চোরের হস্তে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন।'[১৮]

'অবরোধ-বাসিনী'র প্রারম্ভে রোকেয়া বলেছিলেন যে, গোটা ভারতবর্ষে কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষদের বিরুদ্ধে নহে, মেয়ে মানুষদের বিরুদ্ধেও। এরই অবতারণা দেখি অবরোধবাসিনীর এক নং কাহিনীতে। যেখানে 'আ' খাতুন নাম্নী এক সাহেবজাদী কাবুলী স্ত্রীলোককে দেখে প্রাণপণে হাঁপাতে হাঁপাতে তার 'চাচী আম্মা' কে গিয়ে বল্ল 'পায়জামা পরা একটা মেয়ে মানুষ আসিয়াছে, তাতে চাচী ব্যস্ত হয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল তাকে দেখেছে কিনা সে স্ত্রীলোকটি তখন-

> "আ" সরোদনে বলিলেন "হাঁ!" অপর মেয়েরা নামাজ ভাঙিয়া শশব্যস্ত ভাবে দ্বারে অর্গল দিলেন-যাহাতে সে কাবুলী স্ত্রীলোক এ কুমারী মেয়েদের দেখিতে না পায়। কেহ বাঘ ভালুকের ভয়েও বোধ হয় অমন করিয়া কপাট বন্ধ করে না।' [১৯]

তৎকালীন সমাজে কুমারী মেয়েদের পর্দার এরূপ চিত্র লেখিকা দেখালেন যে, সামান্য এক স্ত্রীলোক কুমারী মেয়েদের দেখবে এই ভয়ে নামাজ ভাঙবার মত

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ কাজও তারা করে বসে। এ পর্দা সমাজিকভাবে প্রবর্তিত পর্দা। রোকেয়া বোঝতে চেয়েছেন এ পর্দা ধর্মীয় হতে পারে না। পর্দা প্রথার অতিরঞ্জন ৩নং গল্পে ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে। পর্দা নষ্ট হয় এই ভয়ে হাজী সাহেব তার সাথে থাকা বিবি সাহেবাদের মোটা কাপড়ের বোরকা পড়িয়ে ষ্টেশনের প্লাটফরমে উবু হয়ে বসালেন। তাতেও তার মন ভরেনা তিনি 'মস্ত একটা মোটা ভারী শতরঞ্জি দিয়ে তাঁহাদের ঢাকিয়া দিলেন। তদবস্থায় বেচারীগণ এক একটা বোচকা বা বস্তার মত দেখাইতেছিলেন'। এমন সময় ট্রেন এসে পড়লে এক ইংরেজ কর্মচারী হাজী সাহেবকে বল্ল যে তার আসবাবপত্র যেন সরিয়ে নেয়। কর্মচারীর এ কথায় সে তখন বোঝাতে চেষ্টা করে যে ওগুলো আসবাব না 'আওরত' অর্থাৎ বিবিরা। তখন কর্মচারীটি বিশ্বাস না করে জুতার ঠোকর দিয়ে বলে 'হা, হা- এই সব আসবাব হাটা লো' লেখকের ভাষায়-

'বিবিরা পর্দার অনুরোধে জুতার গুতা খাইয়াও টু শব্দটি করেন নাই।' [২০]

পর্দার নামে নারীর এই যে অবমাননা এর বিরুদ্ধেই রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর লেখনি শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন। অবরোধ বন্দিনীদের দুঃখে কাতর হয়ে তাই শেষে উচ্চারণ করেন-

> "কেন আসিলাম, হায়! এপোড়া সংসারে; কেন জন্ম লভিলাম পর্দা-নশীন ঘরে।"[২১]

তাঁর মতে পুরুষের মুখাপেক্ষিতাই নারী জাতিকে শারীরিকভাবে দুর্বল আর মানসিকভাবে আত্মবিশ্বাসহীন করে রেখেছে। যে কারণে নারীরা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হতে পারে না। এবং পুরুষরাও নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখেনা। শিক্ষার অভাবেই নারীদের হৃদয়বৃত্তিগুলো প্রসারিত হতে পারে না। নারী তাই হয়ে আছে নিস্তেজ, সঙ্কীর্ণমনা আর ভীরু। তিনি সুগৃহিনী প্রবন্ধে তাই লিখেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

'সম্প্রতি আমরা যে এমন নিস্তেজ, সঙ্কীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, ইহা ...শিক্ষার অভাবে হইয়াছে। সুশিক্ষার অভাবেই আমাদের হৃদয়বৃত্তিগুলি এমন সঙ্কুচিত হইয়াছে।'[২২]

শিক্ষার অভাবে নারীরা জানতে পারে না পর্দার সঠিক ব্যবহার। লেখক তাই বোরকাবৃত নারীদের এ দুর্দশার চিত্র এঁকে বোঝাতে চেয়েছেন কোথায় সমাজের বৃহৎ দুর্বলতা। ক্ষয়িষ্ণু ধর্মীয় চেতনাগত মানব জীবন কতখানি বিপন্ন। 'অবরোধবাসিনী'র এ খণ্ড খণ্ড জীবন-চিত্রগুলো অবরুদ্ধ বাঙালী সমাজ প্রতিবেশের বিপর্যস্ত মূল্য বোধের দিকে ইঙ্গিত করেছে।

'সবুজপত্র' (১৯২৩) যুগের মন-মনন ও বুদ্ধির অনুরণনে ব্যঞ্জিত ছোটগল্পের ধারা। এই পর্বে আবির্ভূত হলেন প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬২)। তাদের পরেই হাস্য কৌতুক আর ব্যঙ্গের রস ধারা নিয়ে ছোটগল্পের জগতে সার্থক বিচরণ সৈয়দ মুজতবা আলীর (১৯০৪-১৯৭৪)। ব্যঙ্গ ও কৌতুকের মাধ্যমে তিনি জীবনকে বিচিত্ররূপে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার লেখায় সামাজিক দায়বদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থের 'নোনামিঠা'-গল্পে নায়ক জাহাজের একজন খালাসী হলেও দেখা যায়, তার মধ্যেও রয়েছে নারীর জন্য সম্মানবোধ। তার জীবনের অনেক বড় বিপদে ভীনদেশী এক নার্স তাকে সাহায্য করায় সে তাকেই বিয়ে করে। খালাসী করীম মুহম্মদের দেশের লোকজন বউ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে যে, তার বউ দেশের লোককে করীম মুহম্মদের কাছে আসতে দেয়না। তাই গল্পের কথক যখন বল্ল যে, 'তোমার বউ দেশের লোককে তাড়া লাগায়'। এই উক্তির সে সুন্দর সমাধান টানে এভাবে:

'যেন একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'তা একটু আধটু লাগায় বটে, হুজুর, ওরা যে বলে বেড়ায় আমাকে রোমাঁর মা ভ্যাড়া বানিয়ে রেখেছে সে-খবরটা ওর

Dhaka University Institutional Repository

কানে পৌঁছেছে তাই গেছে সে ভীষণ চটে। আসলে ও বড় শক্ত প্রকৃতির মেয়ে, ঝগড়া-কাজিয়া কারে কয় আদপেই জানে না।'[২৩]

অর্থাৎ তার বউয়ের যে কোন দোষ নেই তা তিনি জানালেন। লেখক বা কথককে সে আরো জানালো যে, তার স্ত্রী উদার এবং মিশুক প্রকৃতিরও। একজন খালাসীও তার স্ত্রীর প্রতি এই যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে এর মধ্য দিয়ে লেখকের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। কথক করীম মুহম্মদের কাছে গিয়েছিলেন কারণ, দেশে করীম মুহম্মদের বৃদ্ধ মাতা একাকী অবস্থান করেছিল। এই বৃদ্ধ মাতার জন্যই কথক সামাজিক দায় অনুভব করেছিল। এখাবেই লেখকের লেখার ভেতর দিয়ে তার সামাজিক দায়বদ্ধতার চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের সম-সাময়িক লেখক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) বহুকৌণিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে জীবনকে উপলব্দি করেছেন। কৌতুকরস সমৃদ্ধ ছিল তার লেখা। তার উল্লেখযোগ্য গল্পগুলো হল 'ফুলের মূল্য,' 'রসমেয়ীর রসিকতা', 'কুড়ানো মেয়ে', 'খালাস', 'বিবাহের বিজ্ঞাপন', 'বলবান জামাতা', 'আদরিনী', নিষিদ্ধ ফল', বিষবৃক্ষের ফল' প্রভৃতি। এগুলোতে রয়েছে তার মননশীলতা আর সুক্ষ্মতার সমন্বয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অস্থির আবহে যারা আবির্ভূত হয়েছিলেন তারা হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), গোকুল চন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৬৭), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৭), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। এঁদের লেখনিতে ফুটে উঠেছে প্রথম যুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক অসঙ্গতি, বহুমাত্রিক জীবন-চেতনা আর বিপন্ন কালিক ভাঙ্গনের সুর। ব্যক্তি-জীবন কিংবা সমাজ-জীবন সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল বৈশ্বিক

Dhaka University Institutional Repository

বিপন্নতা-বিষন্নতা-হতাশা-স্বপ্ন-সংগ্রাম। জীবনের এই যে ভাব বিলাস তাদের লেখনিতে তা সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র দাম্পত্য-জীবন সমস্যা নিয়ে যে গল্পগুলো রচনা করেছেন তাতে তার শিল্প-প্রতিভার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'শৃঙ্খল' গল্পে 'সংসার সীমান্ত', 'সাগর সঙ্গম' কিংবা 'হয়তো' গল্পগুলোতে যুদ্ধোত্তর ভাঙ্গন কবলিত সমাজের অবক্ষয়ি সময়ের ছাপ দেখা যায় নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েনে।

বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পেও এই মনস্তাত্ত্বিক বিভঙ্গতা ছড়িয়ে আছে। তাঁর লেখায় নারীজীবনের সার্থকতা-ব্যর্থতা-মনোযন্ত্রণা শৈল্পিক সিদ্ধিতে পেয়েছে নতুন মাত্রা। সার্বজনীন মানবতাবোধ তার লেখায় রূপায়িত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক অবক্ষয় জর্জর বিচ্ছিন্ন মানব জীবন শাশ্বত মূল্যবোধে শুদ্ধ হয়ে তার গল্পগুলোতে স্থান করে নিয়েছে। বাংলা ছোটগল্পের বৈশ্বিক-চেতনায় জীবনোপলব্ধির নির্বেদ ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত হয়ে যে নামটি স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে তিনি হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)। বাংলা ছোটগাল্পিক জগতের একটি অনবদ্য নাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরের সময়ের যুগসংকটে সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর আবির্ভাব। যদিও যুগের অবরুদ্ধ বিস্তার তাঁর লেখনিতে কমই প্রভাব ফেলেছে। তাঁর লেখা হয়ে উঠেছে ইতিবাচক জীবনচেতায় সমৃদ্ধ। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলো সহজাত হৃদয় ধর্মের ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ, জীবন সম্পর্কে তাদের ছিল গভীর বিশ্বাস আর মানবিক বোধের ঋদ্ধ প্রকাশ। তিনি নির্মাণ করেছেন জীবন উপলব্ধির এক শাশ্বত অনুবিশ্ব। বিভূতিভূষণের নারীরা সমাজসত্য-আশ্রিত ও মননশাসিত। তাঁর গল্পগুলোতে অবলীলায় উঠে এসেছে অন্তজ শ্রেণীর নারীদের প্রাতিস্বিক জীবন ভাবনা, তাদের নিত্য দিনের সুখ-দুঃখ- হাসি-কান্না। অবজ্ঞাত এ শ্রেণীর এসব চিত্র তাঁর 'পার্থক্য', 'জলসূত্র', 'তুচ্ছ', 'পিদিমের নীচে' 'নসুমামা ও আমি', 'বিপদ' প্রভৃতি গল্পে সুন্দর সহজতায় উঠে এসেছে। 'জলসূত্র' গল্পে দেখা যায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাধন শিরোমনি তার পাগলী মেয়ে উমাকে প্রচন্ড ভালবাসেন। যে কারণে বিশ বছর আগে একটি মেয়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে মারা গেছে শুনে তিনি সে স্থানে মেয়ে উমাকে

Dhaka University Institutional Repository

কল্পনা করে উদার মানবিক চেতনায় উন্নীত হয়েছেন। 'তুচ্ছ' গল্পে একটি শুদ্র কামার কন্যার প্রতি ব্রাহ্মণ পরিবার কর্তৃক অনাদর অবহেলার চিত্র দেখা যায়। অবশ্য বাড়ির গৃহকর্তাটি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছে । যার মধ্যে মানবিক আচরণের চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে। তার মনোবেদনা প্রকাশ পেয়েছে এভাবে-

> 'আমার কষ্ট হল-ওকে কেউ আদর করে ওর সঙ্গে কথা বলচে না। ও সেটা আশাও করেনি। আমাদের গ্রামে তেমন ব্যবহার কামার-কুমোরদের মেয়েদের সঙ্গে কেউ করে না। ওরা ঘরে ঢুকে বসতে পেয়েচে এতেই ওরা অত্যন্ত খুশী আছে।'[২৪]

'নসুমামা ও আমি' গল্পে পুরুষ-আধিপত্যবাদী সমাজে নারীর অবস্থান প্রকটিত হয়েছে। 'পিদিমের নীচে' গল্পে ব্রাহ্মণ জামিদারের স্ত্রীকে কুপমণ্ডুক এবং অহংকারী হিসেবে দেখা যায়। এখানে সে বুনো বাগদিদের ঠাকুর নিম্নবর্ণের হওয়ায় তাকে তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞা করেন। নারী চরিত্রে এই অমানবীয় রূপ প্রত্যক্ষ করে গল্পের কথক প্রশ্ন তোলে তিনি বলেন,

> 'পাগল ঠাকুর যদি ঋষি নয়, তবে ঋষি কে?'[২৫]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিপদ' গল্পে একটি বারাঙ্গনা চরিত্রের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেছেন দেশে মন্বন্তরকালে গল্পের নায়িকা হাজু দারিদ্রের কষাঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এক পর্যায়ে তীব্র খাদ্যসংকটে পড়লে তিনি জীবন বাঁচাতে বাধ্য হন বারবণিতা হতে। যদিও সমাজ তার এ পরিণত মানতে নারাজ। ভারতীয় উপমহাদেশীয় সমাজ ব্যবস্থা অর্থাৎ বর্ণবাদী প্রথা নারীর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয় নারী কি হবে বা কি হতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলেই তাকে শুনতে হবে ঘৃণ্য কতগুলো সমাজ কর্তৃক বিনির্মিত হীন শব্দ। যেমন নারীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয় সে হবে- সতী, থাকতে হবে এক স্বামী, হতে হবে একনিষ্ঠ, পতিপরায়ণ, তাকে পালন করতে হবে সন্তান ধারনের সমস্ত কর্মযজ্ঞ, সে সন্তান লালন-প্রতিপালন, গার্হস্থ্য জীবন সম্পন্ন

Dhaka University Institutional Repository

করবে। অন্য দিকে এর কোন ব্যত্যয় ঘটলে কিংবা অবস্থা বিপাকে বা স্বভাবদোষে নারী চরিত্রে স্খলন ঘটলে তাকে শুনতে হবে কতগুলো অসম্মানজনক, নেতিবাচক শব্দসমষ্টি। যেমন, পতিতা, বেশ্যা, বারবনিতা, বারঙ্গনা, বারনারী, বারবণিতা, বারবধূ, বারবিলাসীনি, বারোভাতারী, কুলটা, গণিকা জনপদবধূ, দেবদাসী, সেবাদাসী, দাসী, দেহউপজীবনী, অসতী, উপপত্নী, বহু ভর্তৃকা, ব্যাভিচারিনী, ভ্রষ্টা, রক্ষিতা, রূপোজীবিনী, এরূপ নানা অভিধানগত শব্দ। যাইহোক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য তার লেখনিতে সমাজ কর্তৃক পতিত এসব নারীর ভেতর মানবীয় গুণের নিষ্কলুষ বৈশিষ্ট্য আরোপ করে তাকে একটি সম্মানজনক আসন দিয়ে উপস্থাপন করেন। তাই 'বিপদ' গল্পের হাজুকে সে সুন্দর এক মানবীয় চরিত্রে আর্দ্র করে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে দেখা যায় হাজুর মধ্যে তার জীবিকা অর্জনের পথ নিয়ে কোন গ্লানি নেই বরং গর্বিত এ কারণে যে, সে এখন স্বাবলম্বী। অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে তাকে জীবন যাপন করতে হয় না। সে এখন নিজে চলতে পারে এবং তার বৃদ্ধা মাকে সাহায্য করতে পারে।

গল্পের আবর্তনে দেখা যায়, একদিন কথক, হাজুর গ্রামের ব্রাহ্মণ ঘটনাক্রমে হাজুরই পতিতালয়ে উপস্থিত হয়। এতে প্রচণ্ড আত্মগ্লানিতে ডুবে যায়। অর্থাৎ তাকে হাজু দেখে ফেলেছে এই সংস্কার বসত সে আর সেখানে বসতে কিংবা খাদ্য গ্রহণ করতে সংকোচবোধ করে। কিন্তু হাজু তার আন্তরিকতা দিয়ে তাকে নিস্কলুষ আহ্বান জানালে কথক নব জীবনের এক মানবীয় প্রেরণা লাভ করে। এখানেই লেখকের মহত্ত্ব যে, হাজুর প্রতি কথকের আর কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকেনা বরং তার সামনে উন্মোচিত হয় ভদ্রসমাজের কিছু ব্যক্তির অনৈতিক মুখোশ। হাজু যে পরিস্থিতির শিকার তাই সবার কাছে উচ্চকিত হল।

'গিরিবালা' ও 'হিঙের কচুরি'-গল্প দুটোতেও ঐ একই মানুষদের চিত্র নানা বর্ণে চিত্রায়িত হয়েছে। 'গিরিবালায়' দেখা যায় বারবনিতা গিরিবালা যৌবনে বারাঙ্গণা থাকলে জীবনের একটা পর্যায় কৃষ্ণের পাথরমূর্তি পেয়ে যাপিত জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

আমূল পরিবর্তন ঘটে। নারীটি পতিতা হলেও সে-যে সারাজীবনের জন্য একই কালিমা লিপ্ত থাকে না তারই প্রকাশ দেখিয়েছেন। গিরিবালার এই অধ্যাত্ম চিন্তা ঈশ্বর সাধনা তাকে সমাজের উচ্চস্তরে পৌঁছে দেয়। লেখক এখানে এই পতিত নারীর ভেতর সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ দেখিয়ে তাকে অনেক মানবিক করে তুলে ধরেছেন। গল্প গ্রন্থে লেখকের অখণ্ড জীবনবোধ তাকে তাড়িত করে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আহ্বান' গল্পে একটি মুসলিম বৃদ্ধা স্ত্রীর সহানুভূতিশীল মন এবং স্নেহের যে রূপ দেখিয়েছেন তা অনন্য। গল্পের কথক তরুণ ব্রাহ্মণকে বৃদ্ধা পুত্রবৎ স্নেহ করত। আবার ঐ ব্রাহ্মণও সমাজের শত বাধা উপেক্ষা করেও তার পাশে দাঁড়াত। এখানে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণীগত মতের উর্দ্ধে উঠে এক মানবিক মনুষত্যবোধের জাগরণ দেখান লেখক। এভাবেই বিভিন্ন গল্পে তাঁর নারীচরিত্রগুলো জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়ে আছে উজ্জ্বল-আলোকিত। তিনি তাঁর ছোটগল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন চিরন্তন মানবানুভূতিকে, তার উপলব্ধির শেকড়ে জড়িয়ে আছে জীবনবীক্ষণের উজ্জ্বল সীমানা।

বুদ্ধদেব বসু কিংবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপধ্যায়ের জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কাজী নজরুল ইসলামের লেখনিতেও উঠে এসেছে। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) একজন ঋদ্ধিক কবি হলেও ছোটগল্পেও তিনি স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। নারী চরিত্র চিত্রনে দক্ষতার সাক্ষর রেখেছেন। তাঁর 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' (১৯২৪) ও 'শিউলিমালা' গল্পগ্রন্থগুলো ছোটগল্পের ভুবনে এক বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত। তাঁর গল্পে তিনি নারীদের নির্মাণ করেছেন এক চিরায়ত মানসীসত্তায়। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে তাঁর সমস্ত শিল্প সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নর-নারীর সাম্যপূর্ণ অবস্থানকে কামনা করেছেন। তাঁর কবিতায় এরই বহি:প্রকাশ দেখা যায়:

'বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

Dhaka University Institutional Repository

বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।'[২৬]

নজরুল এভাবেই নারীদের জাগাতে চেয়েছেন। নারীদের এই আত্মজাগরণের ডাক গল্পের ভেতরেও প্রতিভাসিত হয়ে আছে। 'রাক্ষসী' গল্পে দেখা যায় নায়িকা বিন্দি স্বামীর পরকীয়া প্রেম মেনে নিতে পারেনা তখন সে স্বামীকে হত্যা করে। এখানে বিন্দিকে এক বিদ্রোহী নারীররূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। বিন্দির ভাষায়-এর স্বরূপ অনেকটা স্পষ্ট:

'আর পুরুষেরা ও রকম চেঁচাবেই, কারণ তারা দেখে আসছে যে, সেই মান্ধ্যাতার আমল থেকে শুধু মেয়েরাই কাটা পড়েছে তাদের দোষের জন্যে। মেয়েরা পেথম্ পেথ্ম এই পুরুষদের মতই চেঁচিয়ে উঠেছিল কি-না এই অবিচারে তা আমি জানি না। তবে ক্রমে তাদের ধাতে যে এ খুবই সয়ে গিয়েছে এ নিশ্চয়। আমি যদি ঐ রকম একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসতুম আর যদি আমার সোয়ামি ঐ জন্যে আমাকে কেটে ফেলতে, তাহলে পুরুষেরা একটি কথাও বলত না। তাদের সঙ্গে মেয়েরাও বলত, হা, ও রকম খারাপ মেয়েমানুষের ঐ রকমেই মরা উচিত। কারণ তারাও বরাবর দেখে আসছে, পুরুষদের সাত খুন মাফ।'[২৭]

-এ উক্তির মধ্য দিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম চিরন্তন নারীর পরিমন্ডলকে প্রসারিত করেছেন প্রতিবাদের ব্যাপ্তিতে। এখানে সনাতনী নারী ভাবনার সাথে যোগ হয়েছে নারীমুক্তির মানবিক ধারা। নজরুল ইসলামের 'ব্যথার দানে'র বিদৌরা বা হেনা হল লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি। এরা অসম্ভব রোমান্টিক নারী চরিত্র। তবে বিন্দির মধ্য দিয়েই লেখকের প্রতিবাদী এবং বিদ্রোহী সত্তার সার্থক উন্মোচন দেখা যায়। বিন্দির এ উপলব্ধি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং সকল নারীর ভেতরই এ জাগরণ ঘটা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

তার রচিত অনেক চরিত্রে দেখা যায় চিরন্তন বাঙালী নারীর অনন্য অসাধারণ স্নিগ্ধ কল্যাণী মূর্তি। 'ব্যথার দান' নাম গল্প শুরুই হয়েছে মা-ছেলের 'শত অকারণ আদর-আবদার' এর কথা দিয়ে। নায়ক দারা তার মায়ের কথা স্মরণ করেছে এভাবে,-

'জননীর সেই স্নেহ বিজড়িত চুম্বন আর অফুরন্ত অমূলক আশঙ্কা, আমায় নিয়ে তার সেই ক্ষুধিত স্নেহের ব্যাকুল বেদনা।'[২৮]

'হেনা' গল্পের হেনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় এক দুঃসাহসী নারী চরিত্র। যে তার ভালবাসাকে দেশপ্রেমের কাছে বলী দিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয়নি। দেশের জন্য যুদ্ধ করুক সোহরাব এটা সে মনে প্রাণে চেয়েছিল। তাইতো সোহরাব যখন 'যুদ্ধে যাচ্ছি বল্ল', তখন নির্দ্বিধায় ভালবেসে বল্ল,

'সোহরাব, প্রিয়তম! তাই যাও! আজ আমার বলবার সময় হয়েছে, তোমায় কত ভালবাসি।' একথা শুনে সোহরাব গর্ববোধ করল,-

'ওঃ রমনী তুমি! কি ক'রে তবে নিজেকে এমন ক'রে চাপা দিয়ে রেখেছিলে হেনা? কি অটল ধৈর্য্যশক্তি তোমার! কোমলপ্রাণা রমনী সমরে কত কঠিন হ'তে পারে!--।'[২৯]

একটি নারী স্নেহে কোমল আবার কর্তব্যে কঠোর হতে পারে সহজেই। তাইতো লেখক নারীদের মনের এই বিচিত্ররূপ বিচিত্রভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'রিক্তের বেদন' গল্পে দেখি নায়ককে একটি বেদুইন যুবতী যার নাম গুল সে ভালবেসে ফেলেছে এবং তার প্রকাশও ছিল একরোখা। অর্থাৎ সে কিছুই বোঝেনা কিংবা বুঝতে চায়না। মেয়েটি কেবলই নায়ক বা কথককে বোঝাতে চায় যে সে

Dhaka University Institutional Repository

তাকে ভালোবেসেছে সুতরাং কথকও তাকে প্রশ্নহীনভাবে ভালোবাসবে। কথকের ভাষায়:

> 'আমাকে ভালোবেসেছে, আমাকেই তার জীবনের চিরসাথী ব'লে চিনে নিয়েছে ব্যাস! এই যথেষ্ট!' কোন ওজর আপত্তিই সে জানেনা তার একটাই কথা 'বা:-রে, আমি যে ভালবেসেছি, তা তুমি বাসবে না কেন ?'[৩০]

-নারীমন যেন অনেকটা এমনই। ভালবেসে গুল প্রাণ দিল তবুও ভালোবেসে গেল। 'মেহের নেগার' গল্পে নায়িকা মেহের-নেগারের ভালোবাসার প্রকাশের ধরণ ছিল বেশ গম্ভীর। এ গল্পে 'রিক্তের বেদনের' উল্টো কাহিনী লিখেছেন লেখক। এখানে বিদেশী যুবকই মেহের-নেগারকে ভালবেসে এবং খুব চটুল ভঙ্গিতে তা প্রকাশ করছে। তখন মেহের নেগার জানাল যে সে খুরশেদজান বাইজীর মেয়ে। ভালোবাসা তার জন্য অবরুদ্ধ। তবুও নারী-মন সে-তো কাঁদেই-

> '....ওঃ কেন তুমি আমার পথে এলে? কেন তোমার শুভ্র শুচি প্রেমের সোনার কাঠির পরশ দিয়ে আমার অ-জাগন্ত ভালবাসা জাগিয়ে দিলে?' তাইতো সে নির্লোভ হৃদয়ে বলতে পারল-
> 'যাকে ভালবাসি তারই অপমানত করতে পারিনে আমি।' [৩১]

'রাক্ষুসী' এবং 'স্বামীহারা' গল্প দুটোতে দেখা যায় সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত দুই নারীর যন্ত্রণাবিদ্ধ স্বগতঃ উচ্চারণ। 'স্বামীহারা' গল্পে নায়িকা বেগম জীবন চক্রে একে একে সবাইকে হারিয়ে ফেলেছে কালের আবর্তে। স্বামী-শাশুড়ীকে পেয়ে পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনা ভুলে গিয়েছিল কিন্তু একদিন কলেরা রোগে শিক্ষিত-মার্জিত স্বামীটি মরে গেলে-শাশুড়ি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। সে-ও ছেলের সাথে পরকালে পাড়ি জমাল। পড়ে থাকল দুঃখের অসীম ব্যথাভার নিয়ে শুধু বেগম। স্বামী-স্বাশুরী মারা যাওয়ার পর স্বামীর আত্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

স্বজন ঘর থেকে বের করে দিলে তার স্থান হয় গোরস্তানে। সেখানেই সে সইকে আত্মগত উচ্চারণে খণ্ড খণ্ড চিত্রকে এক জ্যোতির্ময়ী শব্দরূপে বলে গেছে। গল্পের শেষে বেগমও সব দু:খ যন্ত্রণার উর্ধ্বে নিজেকে সপে দিয়েছে:

> 'কি পিপাসী কি বুক ফাটা তৃষ্ণা। একটু পানি দেত বোন। না না, আর চাইনা। ঐ দেখতে পাচ্ছ 'শরবান্ তহুরা'-ভরা পেয়ালা হাতে আমার স্বামী হৃদয়-সর্বস্ব দাঁড়িয়ে রয়েছেন! কি সহানুভূতি আর্দ্রকরুণ স্নেহময় গভীর দৃষ্টি তার! আঃ মাগো! আঃ!'[৩২]

এভাবেই বেগম তার জীবনাবসানের মুহূর্তেও স্বামীকে ভালোবেসে, তাকে কল্পনা করে স্নেহার্দ্র হয়েছে। চিরকালই নারীকে তার পথ চলার সহজতা থেকে দাবিয়ে রেখেছে পুরুষশক্তি বা পুরুষতান্ত্রিকতা। পুরুষের মত নারীরও যে আলাদা সত্তা বা অস্তিত্ব আছে তা মানতে নারাজ পুরুষ সমাজ। নারীকে তার স্বাধীনতার অধিকার থেকে করা হয় বঞ্চিত। নারীর এ নিরব লাঞ্ছনা লেখককে পিড়িত করত, আহত করত তার হৃদয়কে। তাইতো লেখক তার লেখনিতে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। নারীর স্বাতন্ত্র্যিক মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে চান। 'পদ্ম-গোখ্‌রো'র নায়িকা জোহরার জীবনের নানা ধাপ লেখক তুলে ধরেছেন। জোহরা শ্বশুর বাড়ীকে স্বর্ণের মোহর পাইয়ে দেয় তাতে সে পরিবার দিনে দিনে উন্নতি লাভ করে কিন্তু একটা জায়গায় তাদের বিপত্তি ঘটে। তা হোল মোহরের সে কলসীটি যে দুটি পদ্ম-গোখ্‌রে এতদিন আগলে রেখেছিল তারা এখন জোহরাকে আঁকড়ে বেচে থাকতে চায়। এরই একপর্যায়ে তাকে তার বাপের বাড়ী পাঠালে সেখানে ঘটে অন্য ঘটনা। মেয়ে অনেক অলংকার নিয়ে পিতার বাড়ি যাওয়র পর তা তার পিতা-মাতা লোভ সামলাতে না পেরে চুরি করে নেয়। এ দৃশ্য শুধু তার স্বামী আরিফ দেখে ফেলে এবং তা প্রকাশ করতেই শাশুরী তাকে বিষ দেয়া খাবার খাওয়ায়। এতে আরিফ মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিন্তু দৈবক্রমে এক সার্জন ডাক্তারের মাধ্যমে সেরে ওঠে। এত ঘটনার পরও নায়ক আরিফ জোহরার উপর অত্যাচার কিংবা পিতা-মাতাকে কোথাও কিছু বলেনি।

Dhaka University Institutional Repository

এটা ছিল তার একটি বিরাট বদান্যতা। জোহরার ব্যাপারে তার মনোভাব ছিল সব সময়ই ইতিবাচক,-

> 'জোহরা! জোহরা! ঐ তিনটি অক্ষরে যেন বিশ্বের মধু সঞ্চিত। সে মৃত্যুকে স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, দৈবকে ভিন্ন কাহাকেও সে দোষী করিবে না! বাহিরেও না, অন্তরেও না।'[৩৩]

জোহরাও স্বামীকে প্রচন্ড ভালবাসে। আরিফ তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলার পর সে দ্বিধাহীনভাবেই তাই বলতে পারে- 'জোহরা স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল, "না, তুমি শাস্তি দাও। তোমরা আমায় ঘৃণা কর, মার!"[৩৪]

এ গল্পে জোহরার মধ্যে আরেকটি রূপ দেখা যায় তা হল, তার মাতৃহৃদয়। তার দুটো জমজ সন্তান মারা গেলে সে পদ্ম-গোখ্‌রোর মধ্যে তাদের ছাঁয়া খুঁজে পায়। তাই সে সাপ দুটোকে পুত্র স্নেহে লালন-পালন করে। শশুড়ী তাই একদিন ওদের 'বালাই' বল্লে-

> 'জোহরা আহত স্বরে বলিয়া উঠিল, "ষাট, ওরা বালাই হবে কেন মা? ওরা যে আমার খোকা!"[৩৫]

জোহরা ছয়মাস বাপের বাড়ি থাকলেও একদিনের জন্য ওদের ভুলতে পারেন নি। শ্বশুর বাড়ি ফিরেই তাই স্বপ্ন দেখলেন তার খোকারা খাবার চাচ্ছে। তখন সে ছুটে কবরস্থানে চলে যায়। ওখানে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। যখন জ্ঞান ফেরে তখন দেখে সেই পদ্ম-গোখ্‌রো তারই বুকে কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। জোহরা তখন উন্মত্তের মত চিৎকার করে উঠল-

Dhaka University Institutional Repository

'খোকা আমার খোকা, তোরা এসেছিস, তোদের মাকে মনে পড়ল? জোহরা আবেগে সাপ দুইটাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। সর্প দুইটাও মালার মত তাহার কণ্ঠ-বাহু জড়াইয়া ধরিল।'[৩৬]

এখানে জোহরার মানবতাবোধ স্পর্শ করে যায় সমস্ত হৃদয়কে। কাজী নজরুল ইসলামের ছোটগল্পের জগৎ এভাবেই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নারীর মহিমাময় রূপসৃষ্টিতে। তিনি সমাজে নারীর অবস্থানকে সমাজ সংসারের খুটিনাটি বিষয়াবরণে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক অস্থিরতাজনিত বিচ্যুতি যাঁর লেখায় অনবদ্য এক জীবনাবেগ সৃষ্টি করেছে তিনি হলেন মানিক বন্দোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় নাম। যাঁর লেখনিতে উঠে এসেছে কল্লোলীয় উচ্ছ্বাস আর ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন। বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বকে দিয়েছে দুর্ভিক্ষ- শোষণ-শাসন-হতাশা-মানবতার দুর্গতি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় এসবের নৈর্ব্যক্তিক অবয়ব ফুটে উঠেছে। তাঁর 'নমুনা' গল্পে দেখা যায় অনাহার আর মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য পিতা তার আত্মজাকে নারী ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পে নিজের ভাগ্য গড়ার জন্য স্ত্রীর সতীত্বকে বন্ধক রাখে অফিসের বড় কর্মকর্তার কাছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন দর্শন দুটো আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত তার মধ্যে একটি হল ফ্রয়েডীয় মনোদর্শন অপরটি হল মার্কসীয় সমাজ দর্শন। এই দুটো ধারার মিলিত বিশ্লেষণ তার গল্পগুলোর গভীরে আলোড়িত হয়ে আছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের বিষয় হিসেবে নেয়া হয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষয়িষ্ণুরূপ এবং নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মনোবিকার। অশিক্ষাজনিত বিভৎস আচরণ, হত-দারিদ্র্য জীবন, আর্থিক ও সামাজিক অসঙ্গতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় চেতনা এসব তাঁর গল্পে সাবলীলভাবে উঠে এসেছে। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অতসীমামী'র নাম গল্পে

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায় দাম্পত্য জীবন সীমাহীন দরিদ্রতার কারণে নিঃশেষ হয়ে যায়। 'নেকি' 'বৃহত্তর ও মহত্তর' 'প্রাণ' 'স্বামী-স্ত্রী', 'রাজার বৌ', গল্পগুলোতে দেখা যায় প্রচণ্ড আর্থিক কষ্টে দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন। 'প্রাগেতিহাসিক' গল্পে আছে ভিক্ষুক চরিত্রের রূপায়ণ। এখানে ভিখু চরিত্রে দেখা যায় জীবন উপভোগের এক প্রবল বাসনার শব্দচিত্র-

> 'আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে।...নদীর ধারে খ্যাপারমত ঘুরিতে ঘুরিতে মাঝে মাঝে তাহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে সব একা দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।'[৩৭]

এই চেতনাগত মনোবিকার থেকেই অস্বাভাবিক দেহের অধিকারী ভিখু এক হাত দিয়েই প্রতিদ্বন্দ্বি পুরুষসঙ্গীকে মাথার ভেতর লোহার রড ঢুকিয়ে মেরে ফেলে ভিক্ষুক পাঁচিকে নিজ অধিকারে নিয়ে নেয়। যদিও পাচিরও শরীর ছিল ঘায়ে ভরা তাতে যেন ভিখুর কিছু যায় আসেনা। নারীর ওপর একান্ত নিজস্ব অধিকার নেয়াতেই তার সার্থকতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ বাস্তবতার এক নিখুঁত চরিত্রাঙ্কন এই ভিখু চরিত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের সংবেদনশীল জীবন যাত্রার ছাপ অতিমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। 'প্যানিক' গল্পে প্রধান চরিত্র ধনেশের মধ্যে একাকিত্বের মনোগত প্রকাশ দেখা যায়। বাসে ট্রাকে রাস্তায় অজস্র মানুষের ভীড়ের মাঝেও ধনেশ নিজেকে একা এবং অসহায় হিসেবে আবিষ্কার করে,

> 'তার মনে হয় এতলোকের ভীড় তবু-'কেউ তার কথা ভাবিবে না, তার দিকে চাহিয়া দেখিবে না।'[৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর জীবনদৃষ্টির সমগ্রতায় আর অর্ন্তলোকের সমাজভাবনা মিলে ছোটগল্পগুলোর পরতে পরতে অনবদ্য এক অনুভবের শিল্পিত স্বাক্ষর রেখেছে। 'বৌ' গল্পগ্রন্থের কুষ্ঠরোগীর বৌ' গল্পে মহাশ্বেতার জীবন যন্ত্রণা জর্জর হয়ে ওঠে দাম্পত্য-জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাতে। মধ্যবিত্তজীবনের নানা অসঙ্গতি তাঁর অনেকগুলো গল্পে শৈল্পিকবোধের ছোঁয়ায় উন্মোচিত হয়েছে। মানব জীবনের বহুমাত্রিক জটিলতা তার স্বকীয় সমবেদনায় বিশ্লেষিত হয়েছে, যা তাঁর সাহিত্যকে দিয়েছে এক নতুন পরিচয়।

'কল্লোল' (১৩৩০), 'কালি কলম' (১৩৩৩) প্রগতি'র (১৩৩৪) ভাব ভাবনা থেকে যারা মানবজীবনের বেদনা কান্না হতাশাকে অন্বিষ্ট করে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন তাদের মধ্যে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বা বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) এর নাম উল্লেখযোগ্য। ছোটগল্পে তাঁর শিল্পীচেতনার স্ফুরণ ঘটেছে নারী চরিত্রের বহুমাত্রিক শৈল্পিক রূপায়ণে। তাঁর অনেক অনেক গল্পের জগৎ ঋদ্ধ হয়ে আছে জীবনসত্যে উদ্ভাসিত নারী চরিত্র সৃষ্টিতে। 'দুই নারী' গল্পে দেখা যায় একই নারী সময়ের পথ ধরে বিচিত্র রূপে ভিন্ন ভিন্ন সত্তায় উপস্থাপন করে নিজেকে। 'বল্ মা তারা' গল্পে দুটি নারী চরিত্র-উমা আর মঞ্জুশ্রী একজন অশিক্ষিত অন্যজন শিক্ষিত কিন্তু দুইজনই অসহনীয়ভাবে অপমানিত পুরুষ জগতে শুধু রূপের অভাবে। বনফুল তাঁর গল্পের নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনায় সমাজে নারীর অবমূল্যায়নকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। মানবতার নিরুপায় অপমানকে তিনি তীক্ষ্নভাষায় তাঁর গল্পের ভেতরে তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯৩৯-১৯৪৫) যুদ্ধের বৈনাশিক ঘাত-অভিঘাত-সংশয় বৈশ্বিক জীবনধারা রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলা ছোটগল্পের জগতেও গভীর ছাপ রেখে গেছে। এই পর্বে যারা ছোটগল্পের আসরে বিচরণ করেছেন তারা হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৮৫), সুবোধ ঘোষ (১৯১০-১৯৭০), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২)।

Dhaka University Institutional Repository

ভাব বৈচিত্র্য, সংক্ষিপ্ত ও নিরিক্ষাধর্মী লেখার জন্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) ছোটগল্পের ধারায় স্বতন্ত্র অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। জীবন সমগ্রতার শৈল্পিক উদ্ভাসন তার ছোটগল্পের জগৎকে ঋদ্ধ করেছে। তাঁর লেখায় উঠে এসছে বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের আন্তঃ মানবিক সম্পর্কের নানা সংঘাত। দারিদ্র্য-মূল্যবোধের সংকট-শূন্যতা, বিচ্ছিন্নতা, মানসিক নৈঃসঙ্গতা, আতঙ্কিত যুগস্রোত তাঁর গল্পে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর ছোটগল্পের পটভূমি যেমন বিচিত্র তেমনি বিচিত্র তার চরিত্রায়ন। 'কাণ্ডারী', 'পুষ্করা', 'নক্রচরিত্র', 'দুঃশাসন', 'মৃত্যুবান,' 'টোপ' আর 'ভোগবতী' গল্পে জীবন যন্ত্রণার বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হয়। 'পুষ্করা' গল্পে শ্মশানের বীভৎস পুঁজোর বর্ণনায় পুরোহিত তন্ত্রের মিথ্যাচার লেখক উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছেন। 'বীতংসে' গল্পে সাঁওতালী বন্য নর নারীর জীবন সংরাগ উঠে এসেছে। ভণ্ড সাধু সুন্দরলালের চক্রান্তে সাঁওতাল মেয়ে বুধনীর জীবনের অসহায় পরিণতি গল্পের ট্রাজেডিকে আরো বেশি আবেদনময়ী করে তুলেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোট গল্পগুলোতে ছোটগাল্পিক শিল্পচৈতন্যে জীবন জটিলতার হার্দ্রিক রূপভাষ্য ধরা পরে। তাঁর বিষয় নির্বাচনীতে প্রতিফলিত হয়েছে মননশাসিত বুদ্ধিদীপ্ত প্রাতিস্বিক ভাবনা।

বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্বে 'মোহাম্মদী' 'সওগাত' পত্রিকাকে ঘিরে যাদের আবির্ভাব তাঁরা হলেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৬), আবু রুশদ (১৯১৯), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। তাঁদের লেখনিতে ছিল যুদ্ধোত্তর সময়ের সামাজিক বিপর্যয়, মুসলিম মানসলোকের স্বপ্নিল বিহ্বলতা, রাজনৈতিক অসঙ্গতি, সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় কুপমণ্ডুকতা, সার্বজনীন মানবতা বোধ। বিভাগ-পূর্ব ছোটগল্প রচনায় আবুল মনসুর আহমদ একটি স্বতন্ত্র প্রতিভার অধিকারী। তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে তৎকালীন সমাজের কপটতা, অসঙ্গতি, রাজনীতিবিদদের সুবিধাভোগী

Dhaka University Institutional Repository

মনোভাব, ধর্মীয় ভণ্ডামী, অসততা, অর্থাৎ মানুষের বহুমাত্রিক রূপ। তাঁর 'আয়না' (১৯৩৫) গ্রন্থের মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক রীতিতে তিনি সমাজের মানুষ কর্তৃক নানা অসঙ্গতিমূলক কর্মকান্ডের স্বরূপ উন্মোচিত করেছেন। 'ফুড কনফারেন্স' (১৯৫০) গ্রন্থের গল্পগুলোতে আছে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জীবনের বিপর্যস্ততা-অসঙ্গতি-রূপ বিচিত্রতা। কিছু গল্পে আছে দুর্ভিক্ষ পিড়িত সমাজব্যবস্থা, আর ধর্মের আবরনে কিছু মানুষের প্রতারণা, ধর্মের দোহাই দিয়ে নারী নির্যাতন-এমনকি পীরপ্রথার ঘৃণ্য চক্রান্ত কে তিনি দেখিয়ে গেছেন। 'হুজুর কেবলা'- গল্পটি তার এই নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিমার কারণেই হয়েছে যুগোত্তীর্ণ। এখানে দেখা যায়, পীরের কর্মকাণ্ডের আড়ালে আছে তার নারী লোভের একটি ঘৃণ্য প্রয়াস। তার বৃদ্ধ বয়সে এক মুরিদের পুত্রবধুকে বিয়ে করার প্রবল বাসনা উপস্থিত হলে সে প্রতারণা করে এভাবে যাতে লোকজন কোন সন্দেহ না করতে পারে। সেজন্য সে হযরতের রুহকে তথাকথিত সুফীর মধ্যে এনে তাকে দিয়ে বলিয়ে নেয় যে, তুমি বৃদ্ধ হলে কি হবে সে তো ষাট বৎসর বয়সে নবম বিয়ে করেছে। তার ধৃষ্টতার রূপটি সার্থক করার জন্য সে সুফীকে দিয়ে বলিয়ে নেয়-

> 'ইয়া উম্মতি, আমি আমার পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রীকে নিকাহ করিয়াছিলাম, আর তুমি একজন মুরিদের স্ত্রীকে নিকাহ করিতে পারিবে না ?' [৩৯]

অর্থাৎ পীর তার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সুফীর ভেতর নবীজীর রুহের আগমন দেখিয়ে সুফীর মাধ্যমে এই কথা বলিয়ে নেয় যাতে তার ধর্মান্ধ মুরিদগণ কিছুই বুঝতে না পারে। আবুল মনসুর আহমদ তার লেখনিতে সামাজিকভাবে এই ভণ্ড পীরদের মুখোশের আড়ালের স্বরূপ উন্মোচিত করেছেন।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর জীবনবীক্ষণ আবুল ফজলের ছোটগল্পে তীক্ষ্ম ব্যাঙ্গাত্মক অবয়বে উঠে এসেছে। 'মাটির পৃথিবী', 'রহস্যময় প্রকৃতি', 'সতীর সহমরণ', বিবর্তন',

Dhaka University Institutional Repository

'রাহু', 'জয়', 'জনক', 'নিহতের ঘুম', 'কান্না', 'সংস্কারক', 'মৃতের আত্মহত্যা', 'লাঠেষধ' গল্পগুলোতে তাঁর মানবতাবোধ ও পরিশীলিত মননের প্রকাশ দেখা যায়। 'আবুল ফজল ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে মধ্যবিত্ত ও মুসলিম সমাজ ও তার সমস্যাবহুল জীবনকে গ্রহণ করেছেন। সাধারণত জীবনের রহস্য সন্ধানে এবং নর-নারীর প্রণয়ঘটিত ঘটনা তাঁর ছোটগল্প গুলোতে আমরা খুঁজে পাই।'[৪০] আবুল ফজলের গল্পের শরীরে ছড়িয়ে আছে মানবতাবাদের সার্বজনীন রূপ।

প্রাক্ সাতচল্লিশের শিল্পী হিসেবে আবু রুশদের ছোটগল্পে তার জীবন জিজ্ঞাসার শিল্পরূপটি উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর লেখায় মুসলিম মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্ত বতা বোধ এবং প্রাত্যহিক যাপিত-জীবনের সংগ্রামের চিত্র সৃষ্টিতে তিনি সার্থকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'রাজধানীতে ঝড়' (১৯৩৮), 'শাড়ী বাড়ী গাড়ী' (১৯৬৩), 'মহেন্দ্র মিষ্টান্ন ভান্ডার' (১৯৭৪), 'প্রথম যৌবন (১৯৪৮), 'স্বনির্বাচিত গল্প' (১৯৭৯)।

এই গল্পগ্রন্থ গুলোতে আছে তার তীব্র জীবনবোধ ও সমাজভাবনা। নর-নারীর সম্পর্কের মননধর্মীতা আবেগী হৃদয়-উৎসারণ-তাঁর গল্পের শৈল্পিক রূপ সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। গল্পে উঠে এসেছে তার স্বকীয় ভাব-ভাবনার স্ফুরণ। শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৮) চল্লিশের দশকের একজন মুসলিম মানসলোকের বুর্জোয়া ভাবধারার লেখক। 'অনেক দিনের আশা', 'রক্তের স্বাদ', 'পথ জানা নাই', প্রভৃতি গল্পে তাঁর শিল্পিমানসের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নবিত্ত মানুষ এবং তাদের যাপিত জীবন, দৈনন্দিন সংগ্রাম, নর-নারীর অন্তরের অন্তহীন নির্বেদ গল্পগুলোতে সহজ শৈল্পিক পরিপাটি চিত্রে দেখা যায়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) বাংলা ছোটগল্পের ধারার এক ঋদ্ধিক উচ্চারণ। তাঁর ছোটগল্পে পাওয়া যায়, মানব জীবনের অন্তর্মুখী বিশ্লেষণ। তিনি সাহিত্যের জগতে এক স্বাতন্ত্র্য-সন্ধানী ছোটগাল্পিক। তার লেখনিতে তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ ব্যবস্থার নানা অনুষঙ্গ চিত্রায়িত হয়েছে। তিনি মানব জীবনের বাস্তবতার আলোকে মনোজগতের নানা দ্বান্দ্বিক ভাব ভাবনা নিরবচ্ছিন্নভাবে ছোটগল্পে তুলে এনেছেন। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ালীউল্লাহ গল্প রচনা করেছেন, দুর্ভিক্ষ তাড়িত মানুষের অপভ্রষ্ট জীবন তাঁর গল্পে অপরিম্লান, হিংস্র সাম্প্রদায়িকতার কালোরূপ তাঁর গল্পে যেমন প্রবর্তনা যুগিয়েছে তেমনি দাম্পত্য জীবনের মনোময় সংকটের স্তরবহুল উন্মোচন ঘটেছে তাঁর গল্পে। বস্তুত নিঃশরণ জীবনের ক্লেদ, বিনষ্টি এবং ব্যক্তির অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার অনুসূক্ষ্ম উন্মোচনে ওয়ালীউল্লাহর গল্প স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত।'[৪১]

বাস্তবিকই তাঁর গল্পে উঠে এসেছে গ্রামীন জীবনের বিচিত্র চিত্র। সমাজে বিচরণশীল মানুষদের কুসংস্কার ধর্মান্ধতা এবং ধর্ম প্রচারক সাধু-সন্ন্যাসীদের ভণ্ডামী তার সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। 'নয়নচারা' (১৯৪৫), 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫) গল্পগ্রন্থ দ্বয়ের গল্পগুলোতে তার মেধার পরিস্ফুটন লক্ষ্য করা যায়। তার গল্পে মানব চরিত্রের অন্তর্চেতনা বিধৃত হয়েছে। 'ঝোড়ো সন্ধ্যা', 'প্রাস্থানিক', 'পথ বেধে দিল', 'মানুষ', 'হোমেরা', 'মৃত্যু', 'চিরন্তন পৃথিবী', 'না কান্দে বুবু'-গল্পগুলোতে দাম্পত্য জীবনের ভেতরলোক উন্মোচন করেছেন লেখক। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মানস বিশ্লেষণ, নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাহিনী পরিবেশনায় বিশেষকৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) বাংলা ছোটগল্পের জগতে এক বিশিষ্ট নাম। তিনি চল্লিশের দশক থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বিচিত্র ধারায় গল্প লিখেছেন। তার গল্পে তৎকালীন সমাজ বিন্যাস রাজনৈতিক অস্থির অঙ্গন, অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং ধর্মীয় কুসংস্কার বাস্তবরূপে উপজীব্য হয়েছে। 'জন্ম যদি তব বঙ্গে', (১৯৭৫), 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' (১৯৫০), 'পিজরাপোল' (১৯৫০), 'সাবেক কাহিনী' (১৪৯৫৩), 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৮৪) 'উপলক্ষ্য' (১৯৬৫), 'নেত্রপথ' (১৯৫৮) 'উভশৃঙ্গ', 'শ্রেষ্ঠগল্প' (১৯৭৪), 'মনিব ও তাহার

Dhaka University Institutional Repository

কুকুর' (১৯৮৬), 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৯০)' 'বিগত কালের গল্প (১৯৮৭), তিন মির্জা (১৯৮৬) প্রভৃতি তার অনবদ্য সৃষ্টি। 'জন্ম যদি তব বঙ্গে, গল্প গ্রন্থের কিছু গল্পে যেমন 'দুই ব্রিগেডিয়ার' 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোয়া' প্রভৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার চিত্র বিশেষ করে যুদ্ধে নারী নিগৃহীত হওয়ার কাহিনী বিধৃত হয়েছে অত্যন্ত মর্মস্পর্শীরূপে। 'জুনু আপা ও অন্যান্য' গল্পগ্রন্থে নর-নারীর সম্পর্ক, তাদের দাম্পত্য জীবন বিরহ-বিচ্ছেদ-সুখ-দু:খকে লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ধর্মব্যবসা সমাজ পটভূমিকায় মানুষের অস্তিত্ব সংকটকে লেখক বিচিত্ররূপে চিত্রিত করেছেন। সমাজের বিপন্ন জীবন তার স্পর্শকাতর মননের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় উনিশ্‌শ বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের সামগ্রিক অস্থিরতার রূপটি সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। গল্প-সাহিত্যের একটি অংশ বিকশিত হয়েছে ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ ইংরেজদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় 'পাকিস্তান' ও 'ভারত' নামে দুটি আলাদা রাষ্ট্র আলাদা সাহিত্য-সংস্কৃতি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় পূর্ব বঙ্গের মানুষ আশায় বুক বেঁধেছিল কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনী সে আশাকে দুমরে-মুচরে দেয়। তাদের নির্যাতনের প্রতিবাদ স্বরূপ ঘটে যায় রাজনৈতিক অস্থিরতা। অনিবার্য হয়ে পড়ে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণআন্দোলন এবং তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। যার সফল সার্থক উচ্চারণ-স্বাধীন বাংলাদেশ। রাজনৈতিক এই সময়পর্বে ঘটে যাওয়া সব ঘটনারই প্রভাব পরে বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষ করে বাংলা ছোটগল্পে। চল্লিশের দশকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশ বিভাগের পরই শুরু হয় পঞ্চাশের দশকের ভাষা আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন এসময় বাংলা ছোটগল্পের জগতে কিছু তরুণ ছোট গাল্পিকদের আগমন ঘটে। তাদের মধ্যে সরদার জয়েন উদ্‌দীন (১৯১৮-১৯৮৬), মিরজা আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৮৪), আবু ইস্‌হাক (১৯২৬), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭১), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫) আবুল কালাম মনজুর মোর্শেদ (১৯৩৮),

Dhaka University Institutional Repository

বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬), মুর্তজা বশীর (১৯৩২), রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫), শওকত আলী (১৯৩৬), প্রমুখ শিল্পির নাম উল্লেখযোগ্য।

বিভাগোত্তর কালের গ্রামীণ সমাজের জীবনচিত্র নির্মানে সরদার জয়েন উদ্‌দীন বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর লেখা 'নয়ান ঢুলী' (১৩৫৯), 'বীর কণ্ঠীর বিয়ে' (১৩৬২) 'খরস্রোত' (১৩৬২) গল্পগ্রন্থগুলো তৎকালের এক অনবদ্য সৃষ্টি। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে গ্রামীণ নারী চরিত্রের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। সামাজস্থিত মাতব্বরদের শাসন-শোষণ-অত্যাচার-কুমন্ত্রণার কারণে কত দাম্পত্য জীবন ধ্বংস হয় তার চিত্র আছে অনেক গল্পে। গ্রামীন মানুষের জীবন এসব মাতব্বরদের চক্রান্তে কেমন অসহায় হয়ে পড়ে-তারা যেন চিরজীবনের জন্য বন্দী হয়ে যায়। কখনো সেখানে অসহায় মানুষগুলো মাতবরদের শক্তির কাছে মাথানত করে দেয় আবার কখনও হয়ে ওঠে প্রতিবাদী।

আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর গল্পগুলোতে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনসংগ্রাম তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলো হল-'জেগে আছি' (১৯৫০) 'ধানকন্যা' (১৯৫১) 'মৃগনাভি' (১৯৫৩), 'অন্ধকার সিঁড়ি' (১৯৫৮), 'উজান তরঙ্গে,' (১৯৫৯), 'যখন সৈকত' (১৯৬৭) 'আমর রক্ত স্বপ্ন আমার' (১৯৭৫), 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৮৬) 'শ্রেষ্ঠগল্প' (১৯৮৭), 'জীবন জমিন' (১৯৮৮), 'মনোনীত গল্প' (১৯৮৮), ও 'গল্প সংগ্রহ' (১৯৯১) প্রভৃতি। তাঁর গল্পে দেখা যায়, নগর জীবনের আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসা এবং পরিবর্তিত সমাজের নানাবিধ অসঙ্গতি। ব্যক্তিক জীবন-যন্ত্রণা-অবসাদ-উৎকণ্ঠা নিঃসঙ্গতাবোধ যেন তাড়া করে প্রতিটি একক সত্তাকে। সামাজিক-শোষণ-বৈষম্যের শিকার মানবতাকে তিনি মার্কসীয় চেতনায় বিশ্লেষণ করেছেন। নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তিনি এর প্রভাব দেখিয়েছেন। 'সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে শিল্প সচেতন সাহিত্যিক। তাঁর জীবন সচেতন শিল্পী-মানস বৈচিত্র্য এবং নতুনত্বের সন্ধানী। নর-নারীর যৌন জীবনের অনিবার্য পরিণতিকে আলাউদ্দিন আল আজাদ নিরঙ্কুশ বাস্তববাদী দৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

ভঙ্গির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তাঁর গল্পসাহিত্যে এই বিশেষ পর্যবেক্ষণকে তিনি খানিকটা নৈর্ব্যক্তিক চেতনায় রূপ দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন।'[৪২]

আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্পে পাওয়া যায় নারীর অহং বোধের দীপ্র চমক। 'আমার রক্ত স্বপ্ন আমার' গ্রন্থের 'শিউলিঝরা দরোজা' গল্পটি এমনই ধারায় রচিত। এখানে দেখা যায়, রুমির মা ফয়জুন্নেসা একদিন একুশ বছরের ঘর-সংসার স্বামী-সন্তান ফেলে অন্যের হাত ধরে চলে যায়। গল্পের এক পর্যায়ে লেখক তার চলে যাওয়ার কারণ দেখিয়েছেন এভাবে; রুমির বাবা অধ্যাপক সাহেব 'আপন মনে অস্পষ্ট স্বগতোক্তির মতো' তার কৃতকর্মের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এভাবে:

> 'আমি ঠিক বুঝেছি এ তোর মায়ের কীর্তি। এমন সুন্দর করে বিছানা আর কেউ পাততে পারে না। আমারই দোষ। 'ভালো না লাগলে যাও চলে, কে তোমাকে চায়' আমিই বলেছিলাম। এত অভিমান, চলেই গেল।'[৪৩]

-এখানে দেখা যায় নিভৃতচারী ফয়জুনন্নেছা কতটা আত্মমর্যাদা সম্পন্ন। স্বামীর অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার-শব্দ প্রয়োগ আধুনিক মনস্কের অধিকারী ফয়জুন্নেছা মেনে নিতে পারেনি। তাইতো একুশ বছরের দাম্পত্য জীবনও তার অহংবোধের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে।

মিরজা আবদুল হাই তাঁর লেখনিতে আধুনিক জীবনবোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর 'ছায়া প্রচ্ছায়া (১৯৭৬) ও 'বিস্ফোরণ' (১৯৭৮) নামে দুটো গল্পগ্রন্থ রয়েছে। তিনি মনোবিশ্লেষণ রীতিতে সামাজিক অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন। বিভাগোত্তর কালের জীবন দর্শন শাহেদ আলীর গল্পের বিশেষ রূপসৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। তাঁর গল্পভুবন ঋদ্ধ হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনায়। 'জিব্রাইলের ডানা' (১৯৫৩), 'একই সমতলে' (১৯৬৩), শা'নযর (১৯৮৬), 'অতীত রাতের কাহিনী' (১৯৮৬), 'অমর কাহিনী' (১৯৮৭) প্রভৃতি তাঁর গল্পগ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

আবু ইসহাক বাংলা ছোটগাল্পিক জগতের এক সার্থক উচ্চারণ। তাঁর ছোট গল্পগুলোতে গ্রামের নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রাত্যহিক জীবন বাস্তব অনুসঙ্গে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। 'হারেম' (১৯৬২) এবং 'মহাপতঙ্গ' (১৯৬৩) তাঁর রচিত দুটো ছোট গল্প গ্রন্থ। তাঁর 'ঘুপচিগলির সুখ' গল্পে সমাজ-বাস্তবতার আলোকে দাম্পত্য জীবনকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষ করে তা হয়ে উঠেছে নারীদের জীবনালেখ্য। নারী কিভাবে নিজেকে উপস্থাপন করে তারই ঐতিহ্যগত নিজস্ব ধারার ব্যঙ্গাত্মক চিত্র দেখি তার গল্পগুলোতে। এ গল্পে একজন স্বামী তার স্ত্রী সম্পর্কে বলছে :

> 'পোলাও কোর্মা আমাদের পেটের ও পকেটের গোলমালের কারণ হবে ভেবেই আমার স্ত্রী তা রাঁধতে শেখেনি। তবে 'গুঁড়ামাছ', শাক, ডাল আর ভাত রান্নায় সে সিদ্ধহস্ত। মিলের মোটা শাড়ি তালি দিয়ে দিয়ে পরতে অভ্যস্ত। স্বামীর খেদমতে সর্বক্ষণ ব্যস্ত, কারণ তার পায়ের তলায় নাকি বেহেশ্‌ত। মাসের শেষের দিকে নুন ভাত খেয়েও তৃপ্ত। মিতব্যয়িতার বুদ্ধিতে দীপ্ত। ম্যালেরিয়া জ্বরে না হয় জব্দ। স্বামীর কটু কথায় না করে শব্দ।'[৪৪]

- এভাবেই তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান তাদের জীবনবোধ আবু ইসহাক তার গল্পে সুন্দরভাবে বিধৃত করেছেন। স্ত্রীগণ বেহেস্ত খোঁজে স্বামীর পায়ের নিচে। অজ্ঞতা বা কুসংস্কার তাদের ভেতরগত স্বস্তি এনে দেয়। সৈয়দ শামসুল হকের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের নাগরিক জটিলতা কিভাবে নারীকে প্রভাবিত করেছে, নারীর সেই জীবন ভাবনা তুলে ধরেছেন। তার গল্পগ্রন্থগুলো হল-'তাস' (১৯৫৪) 'শীত বিকেল' (১৯৫৯) 'রক্তগোলাপ' (১৯৬৪), 'আনন্দের মৃত্যু' (১৯৬৭), 'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান' (১৯৮১), 'সৈয়দ শামসুল হকের প্রেমের গল্প' (১৯৯০), 'জলেশ্বরীর গল্পগুলো' (১৯৯০), 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৯০) প্রভৃতি। গ্রাম-

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের বাস্তব রূপ তার লেখায় অনবদ্য হয়ে আছে। সমাজে কিছু অজ্ঞ মাওলানা থাকে যারা ধর্মকে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করে। আর তাতে সম্মতি প্রদান করে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিম্নশ্রেণীর উপর তার প্রয়োগ করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে। তাঁর 'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান' গ্রন্থের 'যারা বেঁচে আছে' গল্পে দেখি সাকিন আলীর সুন্দরী বউ আম্বিয়া মারা গেলে গোরস্তানে কবর দেয়ার জন্য হাজী সাহেব আর ইমাম সাহেব জানাজা পড়তে চাঁদা চেয়েছিল তার কাছে। চাঁদা দেয়ার ক্ষমতা না থাকায় সাকিন আলী নিজ হাতেই জানাজা ছাড়াই নদীর পাড়ে কবরস্থ করে স্ত্রীকে। নদীর পাড়েই কবরটি হওয়ায় জোয়ার-ভাটার পানির তোড়ে সেখান থেকে একমাসেই লাশ বের হয়ে পড়ে। তখন লাশ অক্ষত দেখে ইমাম সাহেব তার অপব্যাখ্যা করেন এভাবে যে তার মতে, মুর্দা পাপীহলে কবর পর্যন্ত সে লাশ স্পর্শ করে না তাই লাশ অক্ষত থাকে। এখানে সাকিন আলীর মনোভাবটাই মানবতার মূর্ত প্রকাশ। গায়ের লোকেরা আম্বিয়া সম্পর্কে যতই খারাপ কথা বলে, নষ্টা ছিল ভাল ছিলনা কিন্তু সাকিন আলীর মন তা মানতে রাজি না। তার মনে হয়েছে আম্বিয়া মারা গিয়ে যেন আরো বেশি তার অন্তরে গেঁথে গেছে। সৈয়দ শামসুল হকের গল্পে উঠে এসেছে তৎকালীন সামাজিক সমস্যা আর্থিক মানসিক দীনতা এবং নর-নারীর সাবলীল জীবন-সংগ্রাম, তাদের প্রেম তাদের জীবনাচরণ। 'তিনি তাঁর রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আধুনিক নর-নারীর হৃদয় ঘটিত বৃত্তিগুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার পরিশীলিত শিল্পীমানসের পরিচয় আছে গল্পের আঙ্গিক চেতনায় ও পরিবেশন পদ্ধতিতে। আধুনিক জীবন চেতনার অভিব্যক্তিতে সৈয়দ শামসুল হক অনেক ক্ষেত্রে প্রতীক ধর্মী ব্যঞ্জনা রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।'[৪৫] তিনি জীবনের নানা দিককে গল্পে তুলে এনেছেন। তাঁর লেখায় যৌনতা শ্লীলতার দৃষ্টিতে আবদ্ধ না থেকে তা বিধিবদ্ধ হয়ে ধরা দিয়েছে সমাজ বাস্তবতার সংশ্লেষে মানবমনের অদম্য পিপাসার অনুষঙ্গ হয়ে। বহমান সময়ের করতালী তার লেখার পরতে পরতে বিদ্যমান।

বাংলাদেশের ছোটগল্প পঞ্চাশের দশকে এসে হয়ে পড়েছে শেকড় সন্ধানী। মানব জীবনে প্রতিফলিত সমাজ-বাস্তবতার রূপটি এ সময়কার লেখকদের লেখায়

Dhaka University Institutional Repository

সুন্দর শেকড়স্থিত ধারায় উদ্ভাসিত হয়েছে। তৎকালীন সমাজ-ধর্ম-রাষ্ট্র-রাজনীতি-মানবচেতনা-জীবনাবেগ সবকিছুই বিবৃত হয়েছে ছোটগল্পিকদের গল্প লেখায়। বাংলা ছোটগল্পের জগতে যুক্ত হয়েছে ষাটের দশকের পাকিস্তান বিরোধী সংগ্রাম আর স্বাধীকার আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন। এসব রাজনৈতিক কর্মকান্ডের আড়ালে ব্যহত হয়েছে আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি। অস্থির হয়েছে সমস্ত কালীক পরিবেশ। এই উত্তঙ্গ পরিস্থিতি সে সময়কার লেখকদের লেখনিতে প্রভাব ফেলেছে। 'পঞ্চাশের দশকে ছোটগল্পকার যাঁরা এলেন, আরো এগিয়ে তাঁরা আপন কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ধারণ করে নতুন একটি বৃত্ত নির্মাণ করেন। অতঃপর ষাটের দশক নাগাদ লক্ষ্য করা যায় ঐ ধারার অধিকতর শাণিত অনুসরণ। আর সেই সাথে নানান পরীক্ষা- নিরীক্ষা, নানান মাত্রিকতার সংযোজন এবং উপস্থাপনার ভঙ্গিতে নানান বৈচিত্র্য। এইভাবে বাংলাদেশের ছোটগল্পের ইতিহাসে ষাটের দশকটি অতি উজ্জ্বল এক অধ্যায়। তাই আমাদের সাম্প্রতিক ছোটগল্প রচনার ধারা বিকাশের কথা বলতে গেলে এই কালপর্বের অর্জনসমূহ স্মরণ করতে হবে। ছোটগল্পের আঙ্গিক ও শিল্পপ্রকরণ, গঠন ও শৈলীতে পাশ্চাত্য রীতিকৌশল যোজনার প্রবণতা এই সময়েই প্রথম স্পষ্ট লক্ষগোচর হয়। রিয়ালিজম, নিও- রিয়ালিজম, সুররিয়ালিজম- শিল্পকলার এসব জোরদার ও অপরিহার্য মতবাদগুলো ছোটগল্পের প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োগ করতে গল্পকারগণ বিপুলভাবে উৎসাহিত হন। এসব আধুনিক চিন্তাভাবনায় ছোটগল্পের টেকনিকের যে পরিবর্তন ঘটে তারও ভিত্তি স্থাপন করে ষাটের দশক। অন্যদিকে রাজনীতি-সচেতন হয়ে গল্পরচনার যে প্রেরণা, তা-ও ষাটের দশক থেকেই শুরু হয়। তার আগে ঘটে গেছে বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন এবং আইয়ুবী সময় শাসনের সূত্রপাত হয়েছে এবং অর্থনীতিতে বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে। উপর্যুপরি সংঘটিত এসব বিষয় দেশের রাজনীতিতে যেমন তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তেমনি সমকালের কথাসাহিত্যে স্বাভাবিক কারণেই আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের তীব্র প্রভাব পড়ে।'[৪৬] তাইতো ছোট গাল্পিকদের লেখায় উঠে এসেছে ষাটের দশকের উন্মাতাল বাংলাদেশ। এ সময়কার লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ

Dhaka University Institutional Repository

(১৯৪৩), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৮), নাজমুল আলম (১৯২৭), আহমদ রফিক (১৯২৯), মুর্তজা বশীর (১৯৩২), মাফরুহা চৌধুরী (১৯৩৪), শহীদ আখন্দ (১৯৩৫), হুমায়ুন কাদির (১৯৩৫-১৯৭৭), রশিদ হায়দার (১৯৪১), হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯), হাসনাত আবদুল হাই (১৯৩৯), রিজিয়া রহমান (১৯৩৯), রাহাত খান (১৯৪০), আবদুশ শাকুর (১৯৪১), সেলিনা হোসেন (১৯৪৭), বশির আল হেলাল (১৯৩৬), জ্যোতি প্রকাশ দত্ত (১৯৩৯) বুলবুল ওসমান (১৯৪০), মাহমুদুল হক (১৯৪০), দিলারা হাশেম (১৯৩৬), কায়েস আহমদ (১৯৪৮-৯৭), সুব্রত বড়ুয়া (১৯৪৫), আহমদ ছফা (১৯৪৩) প্রমুখ ছোটগাল্পিকগণ। এঁদের লেখায় উঠে এসেছে ষাটের দশকের সমাজ বাস্তবতার চিত্র। সামাজিক-রাষ্ট্রিক-আর্থিক-ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে নর-নারীর সম্পর্ক, তাদের চিন্তা চেতনা, জীবন নির্বেদ ইত্যাদি বিষয়গুলো ছোটগল্পগুলোতে উদ্ভাসিত হয়েছে।

মুর্তজা বশিরের 'কাচের পাখীর গান' (১৯৬৯) গল্পগ্রন্থে জীবনের মার্জিত এবং নিস্পৃহ ভাবনার প্রকাশ রয়েছে। তাঁর লেখায় বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় নারীরা কিভাবে নিগৃহিত হয়েছে তার বিপদসংকুল চিত্রগুলো তুলে ধরেছেন। ষাটের দশকের সমাজ-স্বপ্ন আর স্বপ্ন-ভগ্নের বেদনাহত বিষয় উপস্থাপন করতে দেখা যায় শওকত আলীর গল্পে। অনেকগুলো লেখাতে মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবস্থান সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলো হল, 'উন্মুল বাসনা' (১৯৬৮), 'লেলিহান সাধ' (১৯৭৭), 'শুনহে লখিন্দর' (১৯৮৮) ইত্যাদি। জীবনের শত ঝড়-ঝন্‌ঝা বিক্ষুব্ধ পরিবেশেও বেঁচে থাকার প্রবল আগ্রহের মধ্য দিয়েও মানুষের বেঁচে থাকার সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ রয়েছে তাঁর গল্পে। রাহাত খান চারটি ছোটগল্প লিখেছেন। সেগুলো হল 'অনিশ্চিত লোকালয়', (১৯৭২) 'অন্ত হীন যাত্রা' (১৯৭৫), 'ভালো মন্দের টাকা' (১৯৮১) 'আপেল সংবাদ' (১৯৮৩) প্রভৃতি। তাঁর 'অনিশ্চিত লোকালয়' গল্পগ্রন্থের 'অরণ্য মৃত্যু' গল্পে গ্রামীণ জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। একটি মেয়ের স্বামী প্রাকৃতিকভাবে মারা গেলেও সমাজ ঐ মেয়েটিকেই দোষারোপ করে 'স্বামী খাওয়া' কিংবা 'ডাইনি' 'অলক্ষুণে' ইত্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

সম্বোধনে তাকে চিত্রায়াতি করা হয়। জরীন তেমনই এক মেয়ে মানুষ। তার দুবার বিয়ে দুবারই স্বামী মারা যাওয়ার পর নিঃসন্তান ধনাঢ্য চৌধুরী সাহেব তাকে রক্ষিতা রাখে। কিন্তু এক পর্যায়ে চৌধুরী সাহেবের ভাগ্নে জয়নালের সাথে তার গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানে 'স্বাধীনতা প্রত্যাশী এক নির্যাতিত মেয়ে' হিসেবে জরীনের পদচারণা। অন্যদিকে চৌধুরী সাহেবের আরেক রক্ষিতা কাঞ্চি যৌবনের উদ্দামতায় জীবনের কিছু সময় পার করলেও বার্ধক্যে উপনীত চৌধুরী সাহেবকে বলে-

> 'তুমি বাপু একটু সেজেগুজে থেকো। ঔষুধ খাও আর যাই করো আসলে তো বুড়ো শালিক। দেখে শুনে শাকচুন্নিরও মন উঠবে না।'[৪৭]

এখানে একজন নারীর জীবন সম্পর্কিত অনুভূতির সাবলীল বহি:প্রকাশ দেখা যায়। ছোটগল্পের জগতে লায়লা সামাদ এক অনবদ্য নাম। যাঁর লেখনিতে উঠে এসেছে জীবন নির্বেদের অনেক অনুষঙ্গ। মনোবিকলন কিংবা রহস্যময় চেতনা প্রবাহ রীতিতে তিনি বিচরণ করেন মানব সমস্যার অন্বেষণে। 'দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে' (১৩৭৩) ও 'কুয়াশার নদী' (১৩৭৬) নামে তার দুটো গল্পগ্রন্থ রয়েছে। তাঁর গল্পে রয়েছে, নারী-পুরুষের সম্পর্কের নানা দিকমাত্রা। তিনি প্রধানত ষাটের দশকের রীতিতে. চেতনা প্রবাহ, মনোবৈকল্য ও রহস্যময় বিষাদ নিয়ে গল্প লেখেন। অবাস্ত বতার দিকে ঝোক বেশি। তবে বাস্তব জীবনের, বিশেষত নিগৃহীত নারী-জীবনের দুর্গতি নিয়েও গল্প লেখেন।...নারী পুরুষের দেহ সম্পর্কের বর্ণনার দিকে আসক্তি।'[৪৮] লায়লা সামাদ বাংলা ছোটগল্পের ভুবনে বিচরণশীল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার গল্প কথা বলার ভঙ্গিতে এগিয়ে যায় পরিণতির দিকে।

রাজিয়া মজিদ বাংলা ছোটগল্পে বিশেষ অবদান রেখেছেন। 'আকাশে অনেক রং' (১৯৭৯), 'রাজিয়া মজিদের গল্প সংগ্রহ' (১৯৮৮) এগুলো তার ছোটগল্পগ্রন্থ। 'কলঙ্ক তিলক' গল্পটিতে রাজিয়া মজিদ সমাজ কর্তৃক একজন নারীর হেনস্থা হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র এঁকেছেন। নায়িকা দিলারার সৌন্দর্যে অনেকেই বিমোহিত ছিল। একদিন দিলারা শহরের মেয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক হলে যারা একদিন দিলারার প্রেম কামনা করে ব্যর্থ হয়েছিল সেই অভিভাবকগণ তাদের মেয়ে-বোনদের স্কুল থেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে যায়। তারপর একদিন দিলারা অভিভাবকদের ডেকে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করেন। এভাবেই দিলারা চরিত্রটি এগিয়ে যায় গল্পের পথ ধরে। রাজিয়া মজিদের গল্পের প্রধান আলেখ্য সাধারণ মানুষের জীবনাবেগ। 'তাঁর গল্পের পটভূমিকা কাহিনী চরিত্র চিত্রণ প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই বাস্তবতার প্রতি তাঁর গভীর অঙ্গিকার আমরা লক্ষ্য করি। সমাজ বাস্তবতার অন্যতম রূপকার হিসাবে তাই রাজিয়া মজিদকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা যায়।'[৪৯] তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে চাকরীজীবী, সংসারজীবী নারীর নানা ক্যানভাস। নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং নারীর অন্তর্জগৎ-বর্হিজগতের জীবনের চিত্র অঙ্কনে অনন্য এক শিল্পিসত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

449601

বাংলাদেশের ছোটগাল্পিক ভুবনে ষাটের দশকের হার্দ্রিক লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখায় নাগরিক জীবনের বর্ণিল রূপ ধরা পরে। তাঁর ছোট গল্পগ্রন্থগুলো হল 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' (১৯৭৬), 'খোঁয়ারি' (১৯৮২), 'দুধভাতে উৎপাত' (১৯৮৩), 'দোজখের ওম' (১৯৮৯) প্রভৃতি। 'অন্যঘরে অন্য স্বর' গল্প গ্রন্থের 'উৎসব' গল্পটিতে দেখা যায় পুরুষের কাছে নারী কেবল ভোগের সামগ্রী। গল্পের নায়ক আনোয়ার আলি এক বন্ধুর বৌভাতে গিয়ে সুন্দরী রমণীদের দেখে বাড়ি ফেরার গলির মুখে এসেই বিরক্ত হয় এবং স্ত্রী সালেহার কথা মনে হতেই তার কেবল মনে পরে-

> 'সালেহা বেগম তার স্ত্রী, তার স্ত্রীর ঠোঁটের কোনে লালার আভাস, সমগ্র মুখমণ্ডলে গ্রাম্যতা, কেবল গ্রাম্যতা তোতলায়।'[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

-অর্থাৎ এতক্ষণ সে যে শাহুরিক লীলাময়ী মেয়েদের দেখেছে তার পাশে সালেহা এক অথর্ব গ্রাম্য নারী হয়ে গেছে। 'দুধভাতে উৎপাত' গ্রন্থের নাম গল্পে আছে অতি সাধারণ হতদরিদ্র এক মায়ের মনের আকুতি, যে তার সন্তাদেরকে নিজহাতে দুধভাত খাওয়াবে এবং সে নিজেও খাবে। কিন্তু অভাব তার সে ইচ্ছেকে পূর্ণ হতে দেয়নি মৃত্যু পর্যন্ত। তাইতো দেখা যায়, মৃত্যুর একটু আগেও তার সন্তান ওহিদুল্লাকে হুঙ্কার ছেড়ে সে বলে ওঠে-

> 'বুইরা মরদটা! কি দ্যাহস? গরু লইয়া যায়, খাড়াইয়া খাড়াইয়া কি দ্যাহস!' এটা বলতে না বলতেই 'জয়নাবের মাথা বালিশের পাশে ঢলে পড়ে।'[৫১]

মৃত্যুও তার সে ইচ্ছেকে দমন করতে পারেনি। মায়ের এ আর্তি লেখকের লেখায় বাস্তব শব্দচিত্র হয়ে ধরা দিয়েছে। আবদুল মান্নান সৈয়দ বাংলা গল্প জগতের একজন বিশিষ্ট গল্পকার। তার লেখনিতে স্থান করে নিয়েছে মানব জীবনের বিচিত্র প্রান্ত। তার সৃজনশীল ও নিরিক্ষাধর্মী গল্পগ্রন্থগুলো হলো 'সত্যের মতো বদমাশ' (১৯৬৮), 'চলো যাই পরোক্ষে' (১৯৭৩) 'মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা' (১৯৭৭), 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৮৭), 'উৎসব' (১৯৮৮), 'প্রেমের গল্প' (১৯৯১) প্রভৃতি। তাঁর লেখায় দেখা যায়, উপলব্ধির বহুবর্ণিল রূপ রেখা। তিনি প্রতীকী এবং পরাবাস্ত ববাদী পরিচর্যায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছেন যেমন 'জলপরি' গল্পে এক অধ্যাপকের হঠাৎ হৃদয়ানুভূতির চিত্র এঁকেছেন এভাবে-

> 'যে চোখগুলো এতো বড়ো বড়ো এতো অনির্বচনীয় যেন তার ভিতরে অনায়াসে ঘুমানো যায়-দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী ভ'রে। আর আমি, আমিও বোধ হয় আবিস্কৃত হ'লাম অন্য দুটি চোখের আলোয়, চোখের ঝিনুকের ভিতরকার আশ্চর্য মুক্তোর মতন। জানলাম নিজের শরীর, নিজের মন।'[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

'মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা' গল্প গ্রন্থের বাঘ' নামের গল্পটিতে রিক্সাওয়ালা রহিম আর তার স্ত্রী আসিয়ার দাম্পত্য জীবন, যেখানে হত দরিদ্র রহিমের মধ্যেও দেখা যায় এক বলিষ্ঠ পুরুষতান্ত্রিক চেতনা। লেখকের ভাষায়'

> 'রহিম একজন সাদামাঠা' রিক্সাওয়ালা: কাজ করে আলসেমি করে, বৌকে শরীরে মনে ভালবাসে, রাগহলে মাঝে মাঝে চ্যালাকাঠ দিয়ে পেটায়, গালাগাল করে যা তা বলে। গরীব রিক্সাওয়ালা হতে পারে সে কিন্তু বৌয়ের পর্দার ব্যাপারে ভীষণ কড়া, মেয়েরা পর্দানা করলে স্রেফ জাহান্নামে যাবে এরকম গভীর বিশ্বাস আছে তার। কিন্তু শুধু সে জন্যেই নয়, নিজের বৌকে, আসিয়াকে সে বেরোতে দেয়না বাইরে, তার পিছনে আছে একটি একচ্ছত্র আধিপত্যের আদিম অধিকার বোধ।'[৫৩]

গরীব রিক্সাওয়ালা রহিমও পুরুষতান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে স্ত্রীর উপর তার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্য সে বউকে পর্দা করাতে বাধ্য করে।

রহিমের এই দৃষ্টি ভঙ্গিতেই শেষ হয় না আসিয়ার জীবন যন্ত্রণা। এর পরে রহিম এক্সিডেন্ট করে পা কেটে ফেল্লে তার উপর চোখ পরে মালিকের ছেলের। তারপর শুরু হয় সামাজিক যন্ত্রণা। সমাজের বিত্তশালীদের ইচ্ছের কাছে কিভাবে পরাজিত হয় বিত্তহীনদের জীবন তারই অঙ্কনে সার্থক হয়েছে গল্পটি। গল্পে দেখা যায় একটি নারীর জন্য ঘরে বাইরে কত রকম বাঘ দাঁড়িয়ে থাকে। আবদুল মান্নান সৈয়দ সমাজ বাস্তবতার অনুপুঙ্খ চিত্র অঙ্কনে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মানবজীবনের যাপিত জীবন যাত্রাকে অতি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত করেছেন। মানব চেতনাকে তিনি অন্তরিকতার সাথে গল্পে উঠিয়ে এনেছেন। জীবনের নিগূঢ় রহস্যকে উপলব্ধির শেকড়ে স্বপ্নিল করে উপস্থাপনে তিনি ছিলেন অনবদ্য। খালেদা এদিব চৌধুরী (১৯৩৯) তাঁর 'অন্য এক নির্বাসন' (১৯৭৬), 'জন মনিষ্যির গল্প' (১৯৮২), 'পোড়ামাটির গন্ধ' (১৯৮৫), 'নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ' (২০০২) গল্পগ্রন্থগুলোর জন্য

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ছোটগল্পের জগতে একটি শক্তিশালী আসন গড়ে নিয়েছেন। তিনি সহজ ভাষায় রোমান্টিক চেতনালব্ধ অনুভূতিতে গল্পগুলোকে অবলীলায় উপস্থাপন করেছেন। মানবজীবনের বস্তুগত হতাশা থেকে শুরু করে নর-নারীর প্রণয় অর্থাৎ যাবতীক জীবনযাত্রা তার লেখনিতে উঠে এসেছে। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অন্য এক নির্বাসন' এর গল্পগুলোতে বাংলাদেশের গ্রামীণ এবং শাহুরীক নানা সমস্যাকে চিত্রায়িত হতে দেখা যায়।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সময়ে লেখকদের মাঝে যে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি করে, সেই চেতনায় উজ্জীবিত হয়েই ছোটগল্পকারদের লেখনিতে উঠে এসেছে একের পর এক ইতিহাস। এরপর এসছে উনসত্তরের গনআন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নানা রূপ চিত্র। বাংলার গ্রাম-গঞ্জ-শহর ভিত্তিক নানা ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে ছোটগল্পগুলোতে। সমাজের প্রতিষ্ঠিত পরিবর্তন তাদের লেখায় ধরা পড়েছে। যুদ্ধোত্তর সমাজের রাষ্ট্রের বিভিন্ন দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যোদ্ধাদের আবেগ-আশা-হতাশা কষ্ট শূন্যতা, প্রিয়জন হারানোর ব্যথা, মন ও মননের বিভিন্ন অভিব্যক্তি তাদের লেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তারপর বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজজীবনে আরো অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। একথা ঠিক যে রাজনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তনে দেশের সংস্কৃতিক জীবনে তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রভাব পড়ে, যা পূরণ করতে কিছুটা সময় লাগে। '৭৫-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কিছুকাল তেমনি একটা অবস্থা ছিলো। এই সংকটজনক অবস্থার মুক্তি ঘটে আরো কিছুকাল পরে। তখন সৃজনশীল গল্প রচনার উদ্যম যেন নতুনভাবে গল্পকারদের মধ্যে দেখা দেয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে লেখকদের শিল্পরীতিতেও কিছু পরিবর্তন আসে, রুচিও বদলায় এবং সমাজ ও জীবনের নবতর বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের অভিক্ষেপে কথাশিল্পীর মননে নতুন প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের ছোটগল্পে নতুন শিল্পবিন্যাস দানা বাঁধে। সেই শিল্পবিন্যাসে জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পূর্ণতা-অপূর্ণতা, চাহিদা-নিস্পৃহতার বিষয়গুলো

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানত মানুষের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেই প্রকাশিত হয়। তারপর আশির দশকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবারো সামরিক শাসন-ব্যবস্থার অশুভ ছায়া বিস্তার ঘটে। তবে বাংলাদেশের মানুষ পরম্পরাগত স্বৈরশাসনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় সে সময় জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত সেই শাসন-ব্যবস্থাকে আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে করা থেকে বিরত থাকে। অবশ্য ছোটগল্পের ক্ষেত্রে যুগের সঙ্কট-সমস্যাগুলো যে প্রভাব বিস্তার করবে তাকে তো অস্বীকার করা যায় না।'[৫৪] যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর সময়ের আর্থ সামাজিক রাষ্ট্রিক ধর্মীয় পরিবর্ধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন সবকিছুই লেখকদের লেখনিতে উজ্জ্বলভাবে বিধৃত হয়েছে। সর্বোপরি প্রবীন-নবীন সবার লেখাতেই দেশাত্মবোধ দেশপ্রেম শব্দচিত্রে উদ্ভাসিত হয়েছে। এ সময়কার ছোটগল্পিকগণ হলেন, মালিহা খাতুন (১৯২৮), হেলেনা খান (১৯২৯), আবুবকর সিদ্দিক (১৯৩৪), মাফরুহা চৌধুরী (১৯৩৪), আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীন (১৯৩৪), রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫), খালেদা এদিব চৌধুরী (১৯৩৫), রাবেয়া সিরাজ (১৯৩৫), মকবুলা মনজুর (১৯৩৮), আল মাহমুদ (১৯৩৮), নাজমা জেসমিন চৌধুরী (১৯৪০-৮৯), জুবাইদা গুলশান আরা (১৯৪২), আমজাদ হোসেন (১৯৪২), ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ (১৯৪৫). আবু কায়সার (১৯৪৫), ফরিদা রহমান (১৯৪৫), অনামিকা হক লিলি (১৯৪৮), হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮), নাসরীন জাহান (১৯৪৬), আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫), শহিদুর রহমান, জুলফিকার মতিন, আরেফিন বাদল, বুলবুল চৌধুরী, শান্তনু কায়সার, আফসার চৌধুরী, তাপস মজুমদার, সৈয়দ ইকবাল, ইমদাদুল হক মিলন, আতা সরকার, আবু সাঈদ জুবেরী, মঞ্জু সরকার, হরিপদ দত্ত, আহমদ বশীর, মুস্তফা পান্না, সেলিম রেজা, মঈনুল হোসেন সাবের, ইসহাক খান, এহসান চৌধুরী, সাইয়িদ মনোয়ার, ইমরান নূর, সারোয়ার কবীর, রেজোয়ান সিদ্দিকী, সুশান্ত মজুমদার, সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, ঝর্ণা রহমান, হেলেনা খান, পূরবী বসু, বিপ্লব দাস, হারুন হাবীব, ভাস্কর চৌধুরী, আকিমুন রহমান, লুৎফর রহমান রিটন প্রমুখ লেখকবৃন্দ। এঁদের লেখায় মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুসঙ্গের মধ্যে উঠে এসেছে সে সময়ের নারীদের অবস্থা ও অবস্থান। তাদের আত্মত্যাগের কাহিনী। যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশের নারীরা।

Dhaka University Institutional Repository

তারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, যুদ্ধে হারিয়েছে তাদের সম্ভ্রম, হয়েছে বীরাঙ্গনা। যারা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সমাজে হয়েছে অবহেলিত। তাদের কথা উজ্জ্বল স্বাক্ষর হয়ে রয়েছে গল্পগুলোতে। যে নারীরা যুদ্ধে তাদের সন্তান-স্বামী হারিয়েছে হয়ে পরেছে অসহায় তাদের কথা, তাদের হাহাকার-যন্ত্রণা সমাজ দ্বারা নিগ্রহের নানা কথা উঠে এসেছে নির্মোহ ভাবনায়। নর-নারীর সম্পর্কসহ নারীজীবনের নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে ছোটগাল্পিকদের ছোটগল্পসমূহে।

শওকত ওসমানের 'জননী জন্ম ভূমি' গল্পে দেখা যায় যুদ্ধের সময় গ্রামের সবাই পালিয়ে গেলেও তিন বৃদ্ধা গ্রামে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু মিলিটারিরা মায়ের চেয়েও বড় বয়সী এ নারীদের পর্যন্ত নির্যাতন করতে ছাড়েনি। গল্পটিতে পাকিস্তানীদের এরকমই বিকৃত রুচি আর মন মানসিকতার পরিচয় মেলে-

> 'এই তিন বৃদ্ধার মধ্যে সত্যি আলোড়ন ওঠে যা আদিম ভয়েরই পুনরাবৃত্তি। দুইজনকে এদিকে সরিয়ে নেওয়ার সময় কসিমন বিবি আর্তনাদ করে উঠলেন যেন তার দুই প্রত্যঙ্গ কেউ খসিয়ে নিলে'। ক্যাপ্টেন বাঙালী সহকর্মীকে বললে,
>
> 'তাম বাহার গার্ড (রক্ষী) রহো, হাম ইসকো আন্দার ইন্টারোগেট করুঙ্গা।'[৫৫]

সত্তরের মত বয়সী এই নারীরা পর্যন্ত বর্বর পাকিস্তানী বাহিনীর কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা পায়নি। এমনি হাজারও মা-বোনের ইজ্জতকে ওরা ভুলুণ্ঠিত করেছে অমানবিক আক্রোশে। অবলীলায় এই বাস্তব চিত্রগুলো ছোটগল্পকারদের গল্পে উঠে এসেছে। উঠে এসেছে যুদ্ধকালীন সময়ে কিংবা পরবর্তী সময়ে সুবিধাভোগী বাঙালীদের দানবীয়-স্বার্থান্বেষী চেহারা। যুদ্ধকে পুঁজি করে সমাজে বিশিষ্টজন হয়ে ওঠার বাস্তব রূপ দেখা যায় তাদের গল্পগুলোতে। এমনই একটি গল্প রাবেয়া খাতুনের 'মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী' গল্পগ্রন্থের নাম গল্পে। এখানে তিনি যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের সুবিধাভোগীদের চিত্র এঁকেছেন। যুদ্ধে বোনের স্বামী শহীদ হয়ে যাওয়াকে সম্বল করে বড় ভাই তার আয়ের উৎস খোঁজে। মিসেস আলমগীর তা কিছুতেই পছন্দ

Dhaka University Institutional Repository

করেন নি। ভাই তাঁর জীবনের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে জীবন যাপনের পথ তৈরী করেছেন। সে বোনকে জোড় করে সাদা কাপড় পড়িয়ে শহীদের স্ত্রী সাজিয়ে রেখেছে। মিসেস আলমগীর তাই আক্ষেপ করে বলে-

'আমার নবরূপের রূপকার ভাইয়া। তিনি আমায় বোঝালেন আমি নামি দামী শহীদের স্ত্রী।'[৫৬]

-এভাবেই অস্থির সময়ের ঘুপচিগলিকে সম্বল করে কেউ তার জীবিকার পথ খোঁজে আর কেউ তাতে হয় বলি। এখানে সমাজস্থিত অস্থিরতা উদ্ভাসনে লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে ছোটগল্পকারদের ছোটগল্পেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাদের নিরিক্ষাধর্মী প্রবণতা তৈরী করে চলে নতুন নতুন ধারা। 'ছোটগল্পের চলতি ধারায় কিছু নতুন উপলব্ধি ও নতুন চিন্তার সংশ্লেষ ঘটিয়ে আজকের বৈচিত্র্যভরা সমাজ ও জীবনকে দেখার প্রবণতা এদেশের গল্পকারদের মধ্যে কাজ করেছে। সেই সূত্রে বর্তমানে বাংলাদেশের ছোটগল্পের যে ধারা চলছে তাতে এ যুগের বিভেদপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা এবং নাগরিক সমস্যাজড়িত অস্থির জীবনাচরণের চিত্র এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছোটগল্পের ভাষা ও বাক্য প্রয়োগে নতুন ঢং আনার প্রবণতাটি বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য।'[৫৭]

বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় নতুন নতুন শিল্পীর আবির্ভাব বিশেষ করে নারী লেখকদের সাহিত্যাঙ্গনে পদার্পণ আরও বেশি আশাপ্রদ করেছে ছোটগল্পের জগৎকে। ঋদ্ধ হচ্ছে ক্রমশঃ গল্পের ভুবন। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারা পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের প্রেরণায় যে সাহিত্যের বলয় তৈরী হয়েছে তা আজ অনেক দূর পথ হেঁটে একটা শক্ত অবস্থানে পৌঁছে গেছে। এর ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে বহু নারী চরিত্র। নব্বইয়ের দশকের ছোট গল্পে দেখা যায় সমাজের বাস্তব চিত্রের বাস্তবানুগ প্রকাশ। এ সময়কার লেখকদের লেখায় হত্যা-খুন-ধর্ষণ-যৌনতা নগরজীবনের নানা সমস্যা সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে। সমাজ বাস্তবতা আধুনিক প্রেক্ষাপটে ছোটগাল্পিকদের গল্পে অনুপুঙ্খ সূক্ষ্ম অবয়বে চিত্রায়িত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১. পদকর্তা-ভুসুকুপাদানাম, ৬নং চর্যাপদ, চর্যাগীতিকা, সম্পাদনায় মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবন, ১৩৮৭ সন, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা। পৃ-৭৫

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেনাপাওনা, গল্পগুচ্ছ, নভেম্বর ১৯৯৮, প্রতীক প্রকাশনী সংস্থা; ঢাকা। পৃ-১৩

৩. দিদি, প্রাগুক্ত, পৃ-২১১

৪. মানভঞ্জন, প্রাগুক্ত, পৃ-২১৭

৫. প্রাগুক্ত, পৃ-২১৮

৬. মধ্যবর্তিনী, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৪

৭. প্রাগুক্ত, পৃ-১২৩

৮. প্রাগুক্ত, পৃ-১২৩

৯. ল্যাবরেটরী, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩৬

১০. স্ত্রীর-পত্র, প্রাগুক্ত, পৃ-৫০৬

১১. পয়লা নম্বর, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৫১

Dhaka University Institutional Repository

১২. শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মন্দির, শরৎ রচনা সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), মার্চ-১৯৯৯, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, পৃ-৯০১

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ-৯০২

১৪. ছবি, প্রাগুক্ত, পৃ-৯২৭

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ-৯২৪

১৬. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, সুবেহ সাদেক, রোকেয়া রচনাবলী, আব্দুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী। পৃ-২৯৮

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ-২৯৯

১৮. ভূমিকা, অবরোধবাসিনী, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৭২

১৯. ১নং গল্প, অবরোধবাসিনী, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৭৪

২০. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৭৬

২১. প্রাগুক্ত, পৃ-৫১২

২২. সুগৃহিনী, মতিচুর ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-৪২

Dhaka University Institutional Repository

২৩.সৈয়দ মুজতবা আলী, নোনামিঠা, শ্রেষ্ঠ গল্প, সম্পাদনা আবুশ শাকুর, ফেব্রুয়ার-২০০৬, বিশ্ব সাহিত্যকেন্দ্র, ঢাকা। পৃ-৮৪

২৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুচ্ছ, গল্প সমগ্র-১, ৪র্থ মুদ্রণ, শ্রাবন ১৪০১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলতা-৭৩, পৃ-৬৫৭

২৫. পিদিমের নীচে, প্রাগুক্ত, গল্প সমগ্র-২, পৃ-৫৭৩

২৬. কাজী নজরুল ইসলাম, নারী, কাব্য সঞ্চয়ন, সম্পাদনা মুহাম্মদ আব্দুল হাই, ২য় সংস্করণ, চৈত্র, ১৩৬৮, ষ্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ঢাকা, পৃ-১০১

২৭. কাজী নজরুল ইসলাম, রাক্ষুসী, রিক্তের বেদন, নজরুল রচনা সম্ভার, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, পৃ-৪৩৬

২৮. ব্যথার দান, প্রাগুক্ত, পৃ-৩১৪

২৯. হেনা, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩৯

৩০. রিক্তের বেদন, প্রাগুক্ত, পৃ-৪০২

৩১. মেহের নেগার, প্রাগুক্ত, পৃ-৪২৩

৩২. স্বামীহারা, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৫২

৩৩. পদ্ম-গোখ্‌রো, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৬৬

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৬৭

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৬৮

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৬৮

৩৭.মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগৈতিহাসিক, উত্তর কালের গল্প সংগ্রহ, অক্টোবর-১৯৭২, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ-১৬

৩৮. প্যানিক, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৭

৩৯. আবুল মনসুর আহমেদ, হুজুর কেবলা, আয়না (১৯৩৫), পৃ-২৫

৪০. ড. সায়েদা বানু, পঁচিশ বছরের বাংলাদেশের ছোটগল্প, একুশের প্রবন্ধ-১, ১৯৭ জুন-৯৭, বাংলা একাডেমী, পৃ-৩৬-৩৭

৪১. ঞ্জল কুমার বোস. বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ, এপ্রিল ২০০৯, বাংলা এক ডেমী. পৃ-৪৪

৪২. ড. সায়েদাবানু, বাংলাদেশের ছোটগল্পে বাস্তবতার স্বরূপ, সেপ্টেম্বর-২০০০, হাক্কানী পাবলিশার্স. পৃ-১২৪

৪৩. আলাউদ্দিন আল আজাদ, শিউলিঝরা দরোজা, আমার রক্ত স্বপ্ন আমার,পৃ-৫৮

৪৪. আবু ইসহাক, ঘুপচি গলির সুখ, হারেম, মুক্ত ধারা, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৬২। পৃ-১৮

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. বাংলাদেশের ছোটগল্পে বাস্তবতার স্বরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭০

৪৬.আজহার ইসলাম, চিরায়ত সাহিত্য ভাবনা, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ-৩৩৬

৪৭.রাহাত খান, অরণ্য মৃত্যু, অনিশ্চিত লোকালয়, প্রথম প্রকাশ বাং ১৩৮০, বর্ণবীথি প্রকাশন, ঢাকা। পৃ-১৩৯

৪৮. বশীর আল হেলাল বাংলাদেশের ছোটগল্প, একুশে নির্বাচিত প্রবন্ধ (১৯৬৩-১৯৭৬), জুন-১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, পৃ-১১৬

৪৯. বাংলাদেশের ছোটগল্পে বাস্তবতার স্বরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ-১২২

৫০. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, উৎসব, অন্য ঘরে অন্য স্বর, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৬, অনন্যা, ঢাকা, পৃ-১৯

৫১. দুধেভাতে উৎপাত, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৭

৫২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, জলপরি, চলো যাই পরোক্ষে, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল-১৯৭৩, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ঢাকা, পৃ-১২

৫৩. প্রাগুক্ত, বাঘ, মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৭, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ-০৯

৫৪. চিরায়ত সাহিত্য ভাবনা, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩৭

Dhaka University Institutional Repository

৫৫.শওকত ওসমান, জননী জন্মভূমি, জন্ম যদি তব বঙ্গে, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ-৭৯

৫৬.রাবেয়া খাতুন, মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, ফ্রেব্রুয়ারী-১৯৮৬, সন্ধানী প্রকাশনী, পৃ-৩১

৫৭. চিরায়ত সাহিত্য ভাবনা, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহিলা ছোটগল্পকারদের গল্পে

পুরুষের পৃথিবীতে নারী

Dhaka University Institutional Repository

ছোটগল্পে ক্ষণিকের অনুবিশ্ব সংহত হয়ে নির্মাণ করে জীবন উপলব্ধির এক গভীর ব্যঞ্জনা। জীবন-বৃত্তকে পূর্ণায়ত করে প্রকাশ করে। খণ্ড সময়ের মধ্যে অখণ্ডতার স্ফুরণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ছোটগাল্পিক শিল্পকর্ম। ছোটগল্প প্রাত্যহিকতার জীবন-চিত্রের এক গভীর শব্দরূপ। এর ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের মহিলা ছোটগাল্পিকগণ তুলে এনেছেন নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের বহুমাত্রিক দিক। সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান সামগ্রিকভাবে এখনো অবরুদ্ধ। তবুও নারীর ভেতর চেতনার যে উন্মেষ ঘটেছে যার দ্বারা নারীরা আজ তৈরি করার চেষ্টা করছে নিজস্ব একটা অঙ্গন। নারীর মানবিক, জৈবিক, সামাজিক মুক্তি এখনো অর্জিত হয়নি কিংবা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। সমাজে আজও নারীরা অবহেলিত এবং নারী এখনো পুরুষের চোখে কেবলই ভোগের সামগ্রী হয়েই আছে। পুরুষরা স্বীকৃতি দিতে চায়না নারীর স্বাধীন-স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে। তাদের চোখে শুধু-

> 'ও মেয়ের মায়াবী চোখ আর মোহময় শরীর আমাকে ভাবিয়ে তুলবে সারাজীবন।'[১]

মেয়েদের দৈহিক সৌন্দর্যই পুরুষের দৃষ্টিতে কেবল ধরা পড়ে। খালেদা এদিব চৌধুরী তাঁর 'নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ' গ্রন্থে 'বন কেউটে' গল্পে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন মিয়ার বেটা দবির উদ্দিন কিভাবে দিন মজুর মস্তাজের বউয়ের 'সুন্দরী, যুবতী-শরীর' দেখে তছনছ করে দেয় সংসারটি। মস্তাজকে মিথ্যে চুরির দায়ে জেলে পাঠায়। তখন দবির উদ্দিনের বউ আমেনা বিবি চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে-

> 'তোমার সব ব্যাপারই আমি বুঝতে পারি। হীন মতলবটাও আমার জানা আছে। গরীব লোকটাকে হাজতে পাঠিয়ে ওর বৌটাকে ভোগ করতে পারবে। ওই এক টুকরো জমিটারও মালিক হতে পারবে। তুমি কি কম শয়তান?'[২]

Dhaka University Institutional Repository

আমেনা বিবি এখানে সহজভাবে তাঁর স্বামীর প্রকৃতরূপটি তুলে ধরেছেন। দবির উদ্দিনের কাছে মেয়ে মানুষ মানেই শুধু ভোগের বস্তু। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব চিত্র দেখা যায় গল্পটির গভীরে। নারী নিগ্রহের এমন নিখুঁত উপস্থাপন লেখকের শৈল্পিক ভাবনার এক শক্তিশালী প্রকাশ। সেলিনা হোসেনের 'উৎস থেকে নিরন্তর' কাব্যগ্রন্থের 'বৈশাখী গান' গল্পে দেখা যায় নায়িকা ইকতির স্বামীর অবর্তমানে পাশের বাড়ির হুজুরের ছেলে সাজন তার যৌবনকে ভালবাসলেও যৌবন ভোগ করার পরিণতিকে সে গ্রহণ করেনি, তখন সাজনের কাছে সমাজ-নীতিটিই বড় হয়ে ধরা পড়ে। তাই ইকতিকে সে অনুনয় করে তার কীর্তির কথা না বলার জন্য। তারপর সাজনের বাবা মসজিদের ইমাম সাহেবই চাপ দেয় ইকতিকে তার পেটের বাচ্চার পিতা কে জানার জন্য। ইকতির নির্বিকার ভাব দেখে সাজনের মধ্যে ফুটে উঠে সমাজের পুরুষদের চিরাচরিত রূপটি। সাজন দু' একবার সভার মাঝে বসে আড়চোখে ইকতিকে দেখেছে-

> 'সেই ভাবলেশহীন উদ্ধত ভঙ্গি একটুও ভালো লাগেনি ওর। ওর মনে হচ্ছিল ইকতি সঙ্কুচিত হোক, লজ্জিত হোক। আর এই সভার মধ্যে ওর হয়ে বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে একটু মহত্ত দেখাবে। কিন্তু ও তো জানতো ইকতি নত হবে না বলেই পণ করেছে।'[৩]

অর্থাৎ সাজন এখানে প্রকৃত দোষী হয়েও সে রয়ে গেছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, সমাজের অন্তরালে। ইকতিকেই পোহাতে হচ্ছে সমস্ত সামাজিক ধকল। তারপরও পুরুষতান্ত্রিকতার ধ্বজাধারী পুরুষ সাজন চাচ্ছিল ইকতি যেন লজ্জিত হয়, সঙ্কুচিত হয় তার উপর ভিত্তি করে সে তার পিতার কাছে ক্ষমা চাইবে ইকতির হয়ে। তাতে সভায় কিংবা সমাজে সে মহৎ সাজতে পারবে। ইকতির এই অনমনীয়-রূপ তাই তার ভালো লাগেনি। সমাজের কাছে ইকতিই সমস্ত দোষের অধিকারী। সাজন বা ইকতির স্বামী কাউকেউ সমাজদোষী করবে না এভাবে সমাজে নারীরা নিগৃহীত হয় পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবে সিক্ত পুরুষকর্তৃক। 'ঘুম-মাছ ও এক টুকরো নারী' গল্পগ্রন্থে

Dhaka University Institutional Repository

'জীবনের জল ও অনল' গল্পে ঝর্ণা রহমান নারীর ব্যাপারে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিটি গভীর মনন আর শিল্পিত অবয়বে ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়িকা হেমা সংসার এবং দাম্পত্য জীবনে ক্রমান্বয়ে হয়েছে লাঞ্ছিত, অপমানিত। কখনও স্বামী, কখনও শাশুরী। তাইতো একদিন আত্মগত ভাবনার ভীড়ে হেমা কে তুলে আনতে দেখা যায় তার নিজের জীবনের সরল অসংগতি-

> 'চোখ ঝুপঝুপ করে ওঠে-এমন কেন ? আমার জন্যে সব কিছু এমন কেন ?
> কেমন ? ঠিকই তো আছে। খাবার পাচ্ছনা ?
> খাবার ? চোখে জল আর অনল জ্বলে-নেভে'। খাদ্যই সব ? স্বস্তি ? আনন্দ, প্রশান্তি, ভালোবাসা ?
>
> এসব চাইবার জিনিস নয়, দেবার। মেয়েরা এসব দেয়। স্ত্রী, জননী, নারী এসব দেবার জন্য। মেয়েদের এসব চাইতে নেই। তাদের হতে হয় সহনশীল, ধৈর্যশীল, মায়াবতী, সুখ ও আনন্দদায়িনী।
> নারীর মনের মর্যাদা পেতে নেই ? ভালবাসা?'[৪]

হেমার এই প্রশ্ন, এই চাওয়া সমাজের প্রতিটি মেয়ের। এগুলো মানুষ হিসেবে নারীর অধিকার কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ 'এসব চাইবার জিনিস নয়, দেবার' বলেই যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠা করে আসছে। সনাতনী গৃহকোণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে নারীর পছন্দ-অপছন্দের মূল্য তারা দেয়না। এসব একটি নারীর জন্য দৈনন্দিন জীবনের রূঢ় ভাষাচিত্র। পিতৃতান্ত্রিকতার কাছে নারীর ব্যক্তিত্ব অকিঞ্চিৎকর মনে করে বলেই লিবারেল নারীবাদ নারীর ব্যক্তিসত্তা বা আমিত্ব গঠনের প্রতি জোড় দেয়। নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। তবুও নারী জীবনের ক্যানভাসে সেই একই সুরের পুনরাবৃত্তি ঘটে। দিলারা হাশেমের 'পরিচয়' গল্পে দেখা যায় প্রবাসী মোমিনকে ঘটক ফয়েজুদ্দীন বিয়ের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

কিছু ছবি দেখায়। তার ভেতর ভুল করে তার নিজের মেয়ের ছবিও চলে আসে। ভাগ্যের বিপাকে মোমিন সেই ছবিটিই পছন্দ করে। তখন ফয়েজুদ্দীন বলেছিল-

> 'পাক সেনাদের ধর্ষণের শিকার, উচ্ছিষ্ট এক নারী; এখন পুরুষ পরিতোষে পেট চালানো একটা মেয়েকে অপনি কেন এমন প্রস্তাব দিলেন তা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছিনা।'[৫]

অর্থাৎ পাক সেনা কর্তৃক ধর্ষিতা হওয়ায় তার নিজেরই মেয়ে অথচ সে পরিচয় দিতে চায়না। তাই মেয়েটাকে সে ঘর থেকে বের করে দেয় কিন্তু ছেলেটাকে পড়াশুনা করিয়েই ক্ষান্ত হয়নি তার একটা স্থায়ী ব্যবস্থার চিন্তায়ও সে হয় অস্থির। তাইতো মোমিনের পিছু লেগে থাকা ফয়েজুদ্দিনের প্রার্থনা একটাই-

> 'বহুত মেহেরবানী হইব স্যার। আরিফের একটা ব্যবস্থা করুন।'[৬]

সমাজ ব্যবস্থার ধরণটাই খেয়ালী ভেলার মতন। যুদ্ধের ক্ষত নিয়ে মেয়েটিকে একলা পথ চলতে হয়। বাবা কিংবা ভাই দায়িত্ব নিতে অপারগ হয়। অন্য একটি ছেলে দায়িত্ব নিতে চাইলে সেখানেও সে বাঁধা দেয় যদি মেয়েটির পরিচয় জানার পর সে তার ছেলের কোন ব্যবস্থা না করে সেই ভয়ে। আমদের সমাজে এই ফয়েজুদ্দিনদের উপস্থিতিটা খুব বেশি হওয়ায় নারীরা হচ্ছে বঞ্চিত, নির্যাতিত। লিবারেল নারীবাদ পুরুষ অধিকারের সাথে নারীর অধিকারকেও সমান মূল্য দেয়। লিবারেল নারীবাদ বা উদারপন্থি নারীবাদ তাই সমাজের সর্বত্রই নারী পুরুষ বৈষম্যের পরিবর্তে উভয়ের সমঅধিকারকে গুরুত্ব দেয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী অধিকারতো পায়ই না বরং শোষিত হয় বিভিন্ন দিক থেকে। এগল্পেও ঠিক তাই ঘটেছে। এখানে মেয়েটি কোনো অপরাধ না করেও অপরাধী হচ্ছে সমাজের কাছে। ছোটগাল্পিক সেলিনা হোসেন তার 'হৃদয় ও শ্রমের সংসার' গল্পে প্রচলিত বিবাহ প্রথা একটি নারীকে কিভাবে শোষণ করে তারই চিত্র তুলে ধরেছেন। গ্রামের প্রচুর

Dhaka University Institutional Repository

ভূসম্পত্তির মালিক কাশেম খানের তিন বউয়ের ঘরে কোন সন্তান না হওয়ায় 'মহানন্দার পাড়ে ফুলবানুকে দেখে তার মাথা ঘুরেছে, বুলবানুকে তার পেতেই হবে। ও ধরে নিয়েছে যে ফুলবানুর যৌবনই পারবে ওকে একটি সন্তান দিতে। নিঃসন্তান কাশেম খান ঘরভরা সন্তান চায়। জমির লোভে আমজাদ মিয়া এতো সহজে রাজি হয়ে যাবে, ও তা ভাবতেই পারেনি। ও এখন আমাজদ মিয়ার সব প্রস্তাবেই উদার, কোনো না নেই।'[৭] গল্পের নায়িকা ফুলবানুর নারীসত্তার অবমূল্যায়ন করে পিতা আমজাদ মিয়া তাকে বার কাঠা জমির বিনিময়ে একজন বৃদ্ধ কিন্তু অনেক ভূসম্পত্তির মালিক কাশেম খানের সাথে বিয়ে দেবে ঠিক করে। এতে ফুলবানুর মত থাকেনা তবুও পিতা এবং ভাই মিলে বিয়ে দেবেই কারণ, তাতে তারা কিছু সম্পত্তির মালিক হবে। মেয়ে বা বোনের জীবনে কি নেমে আসবে তা তাদের দেখার বিষয় নয়। তখন ফুলবানুর চিন্তা এবং প্রকাশভঙ্গির মধ্যে নারীর আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাধীনচেতা মনোভঙ্গিটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। দারিদ্র মোচনের জন্য পিতার এ কৌশল এবং বর্বর আচরণ যে মেনে নিতে পারেনা। সে তাই এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়:

> 'তুমরা হামাক বেচ্যা দিচ্ছ। তুমরা জমি প্যাবা, এই লোভে হামাক জবাই কর‍্যা দিচ্ছ।'[৮]

এরপর ফুলবানু ঠিক করে বুড়ো কাশেম খানকেই বিয়ে করবে তবে তার পিতাকে জমি না দিয়ে। তখন সে নিজেই চলে আসে কাশেম খানের ঘরে এবং বলে-

> 'হামাক ব্যাচা ভুঁই কিনব্যার চ্যায় ক্যানহে হামার বাপ? বিয়্যা হলি এমনি হবে, ব্যাচা বিক্রি কর‍্যা লয়। আপনে মৌলবী ড্যাকেন।'[৯]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই লোভী পিতাকে পরাজিত করে ফুলবানু। কাশেম খানকেও সে 'এক দৃঢ় আত্মাধিকার সচেতন নারী' হিসেবে পরাজিত করে। কাশেম খানের মনোভাব পিতৃতান্ত্রিক মেরুকরণে আচ্ছাদিত; সম্পত্তি, টাকা-পয়সা, ব্যক্তিত্ব সবকিছু ছাপিয়ে বংশ পরম্পরা প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। পুত্রসন্তানের আকাঙ্খায় সে চতুর্থ বউ হিসেবে ফুলবানুকে বিয়ে করে। তাইতো পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভূ কাশেমখানের ভেতর গল্পের কথক পৌরুষের ভাঙনের সুর শোনান:

> 'ক্রোধ তাকে দিশেহারা করে রেখেছে, কিন্তু প্রকাশ করতে পারছেনা। পরীক্ষার এই ব্যাপারটি ওকে মর্মাহত করেছে, ওর পৌরুষে লেগেছে। যদিও পরিবার পরিকল্পনার কর্মীরা ওকে বলেছে সন্তান না হওয়ার বেলায় নারী পুরুষ উভয়েরই ত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু পুরুষের ত্রুটি কি স্বীকার করা য়ায় ? সব দোষ তো বাঁজা মেয়ে মানুষের। ফুলবানু এই প্রচলিত ধারণাকে অস্বীকার করেছে। কাশেম খানের উপায় নেই। আসতেই হয়েছে। ফুলবানু বলে দিয়েছে পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত কাশেম খান ওকে ছুঁতে পারবে না।'[১০]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে দেখা যায় সমাজে পুরুষের রয়েছে অসীম স্বাধীনতা। তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে কিন্তু নারী পরিবার, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্র থেকেই হয় শাসিত শৃঙ্খলিত। এই শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফুলবানু জীবনকে অন্যরূপে করেছে উজ্জীবিত। চিন্তা-চেতনায় এবং কর্মে সে অধিকার সচেতন এক আধুনিক নারী। 'সেলিনা হোসেনের "হৃদয় ও শ্রমের সংসার" গল্পটিতে মার্কসীয় ও লিবারেল নারীবাদের বক্তব্য পাওয়া যায় সুস্পষ্টভাবে। মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় নারীসমস্যা ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাত হয়েছে অর্থাৎ শোষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে নারীর অবস্থানকেও বস্তুগত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মানুষের শোষিত অবদমিত অবস্থার জন্য মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দায়ী করে। একইভাবে নারীর অধস্তন অবস্থা ও নিগ্রহের-নির্যাতনের অবস্থাকেও কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

পৃথক লিঙ্গসত্তা থেকে উদ্ভূত নারীর সমস্যাকে ব্যাখ্যা করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে মার্কসীয় ধারণা এই যে, মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটলে আর্থসামাজিক প্রক্রিয়া সকল শোষণ থেকে মুক্তি পাবে, এমন শোষণমুক্ত অবস্থা নারীকেও পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে রেহাই দেবে অর্থাৎ লিঙ্গবৈষম্যের অবসান ঘটাবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পরিবার ও বিবাহ প্রথা সম্পর্কে মার্কসীয় দর্শন থেকেই মার্কসীয় নারীবাদ অনুসৃত হয়েছে। মার্কসীয় নারীবাদ অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা আবির্ভাবের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নারীর অধস্তন ভূমিকার সূচনা ঘটে। সম্পত্তির সঠিক উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের জন্য একগামী বিবাহ-প্রথা উত্তম গ্রহণযোগ্য প্রথা হিসেবে সমাজে অনুমোদন লাভ করে এবং তা সন্তান জন্মাদানে পিতার অধিকারকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেয়। বংশ পরম্পরা ও উত্তরাধিকার নির্ধারণে মাতৃঅধিকারের পরিবর্তে পিতৃঅধিকার স্বীকৃতি পায় সমাজে। এভাবে সম্পদের উপর কর্তৃত্বের বলয় সৃষ্টি করে পুরুষ। ... পিতৃতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বিবাহপ্রথাকে ঘিরে যেখানে নারী ওই বিবাহ প্রথাকে কেন্দ্র করে শোষিত হচ্ছে। মার্কসীয় নারীবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব ও লিঙ্গবৈষম্য থেকে সৃষ্ট শ্রম-বিভাজনকে (নারীর গৃহমুখিতা পুরুষের বহির্মুখিতা) শ্রেণী দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখে না, নারী-পুরুষ দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখে। সেলিনা হোসেনের এই গল্পে নারী-পুরুষ দ্বন্দ্বকে বিবাহ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ভিত্তিক দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখা যাচ্ছে। সম্পত্তির মালিকানার জন্য ফুলবানুর নারীসত্তার অবমূল্যায়ন লক্ষ্য করা গেছে এখানে।'[১১]

মহিলা ছোটগাল্পিকদের গল্পে এভাবেই ফুটে উঠেছে পুরুষদের জগতে নারীর কি অবস্থান এবং নারী তা কিভাবে গ্রহণ করেছে। নারীর নারীসত্তাকে জাগ্রত করেছে তার আত্মঅধিকার সচেতন জীবন ভাবনা। নাজমা জেসমিন চৌধুরী'র 'বাপের বাড়িতে' গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে এমনই একজন পুরুষের স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গি। সাবের, আসাদের সহকর্মী আবার প্রতিবেশিও। সাবেরের স্ত্রী নীলাকে দেখে আসাদ বিচলিত বোধ করে নিজের ভাগ্য ও স্ত্রীকে নিয়ে। সে নিজের স্ত্রী পান্না আর

Dhaka University Institutional Repository

সাবেরের স্ত্রী নীলার মধ্যে তুলনা করে। একদিন সত্যি সত্যি নীলার মিথ্যে অহমীকার কাছে আসাদ ধরা দেয় স্ত্রীকে অবজ্ঞা করেই। ঘটনার আবর্তনে দেখা যায় পরে যখন আসাদের ভুল ভাঙে তখন সে স্ত্রী পান্নার কাছে আবার ফিরে আসে কিন্তু-

> 'প্রেমে ও করুণায় ভরপুর হয়ে ফিরেছে আসাদ। নিজের বাড়ির দরজায় তালা দেখে ভয় পায়। পাশের বাড়ির ছেলেটা চাবি দিয়ে গেলে তালা খুলে বিছানার ওপরই চিঠিটা দেখল ও। পান্না লিখেছে, 'বাপের বাড়ির গল্প যে নির্বিকারভাবে বিশ্বাস করবে তার সঙ্গেই চললাম।' মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে আসাদ।'[১২]

আসাদ এখানে কেবলই একজন স্বেচ্ছাচারী পুরুষ হয়ে উঠেছিল আর স্ত্রী পান্না আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল স্বামী সংসারকে বাঁচাতে, কিন্তু নারীত্বের অবমাননা দেখে তার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা অহংবোধ জাগ্রত হয় এবং সে আসাদেরই বন্ধুর হাত ধরে চলে যায়। নারীর এই চলে যাওয়াকে বাধ্য করেছে পুরুষ ও তাদের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব। 'সুন্দর দুটো আঁখি ও সূক্ষ্ম একটা ধূলিকনা' গল্পে হেলেনা খান দেখালেন নারী তার সুখ খোঁজে স্বামীর গৃহকোণে। আর স্বামী কেবলই স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বৌকে কাজে লাগায়। স্ত্রীরা তাদের কাছে যেন শুধুই নিরিক্ষাধর্মী এক গিনিপিগ। গল্পের প্রথমেই দেখি হেনার ভারী সুন্দর দুটো চোখের বর্ণনা কিন্তু লেখিকার ভাষায় সে চোখ নিয়ে হেনার মনোভাব হল-

> 'চোখকে যদি বলা হয় মনের দর্পন তবে হেনার চোখ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে তাই। সে দর্পন আরিফের প্রতি বিশ্বাসে শ্রদ্ধায় স্বচ্ছ আরিফকে ঘিরে গর্বে ঝলমল। হেনার চোখ তার অকৃত্রিম সুখের অনাবিল স্বাক্ষর।'[১৩]

হেনার হাসির উৎস হিসেবে আরিফকে নির্দেশ করে বলে,

Dhaka University Institutional Repository

'আরিফের ব্যক্তিত্ব, আরিফের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, স্পষ্টবাদিতা ও অকপট অভিব্যক্তি এক গর্ব মেশানো আনন্দ সম্ভারে ভরে তোলে হেনার বুক।'[১৪]

-অর্থাৎ সমাজে নারী তার আনন্দ-হাসি আর সুখের উৎস হিসেবে পুরুষকেই প্রাধান্য দেয়, কিন্তু পুরুষ হয় কেবলই স্বার্থপর। তাইতো যে আরিফ হেনাকে বলত- 'আস্তর আবরণ দিয়ে কোনদিনই সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় না' সেই আরিফই ভাইয়ের চাকুরীর জন্য ব্যবহার করে স্ত্রীকে। কেতাদূরস্ত বিদেশ ফেরৎ বন্ধুকে বাসায় ডেকে আনে এবং হেনাকে বন্ধুর মনোরঞ্জনের জন্য নীলকাতান পড়তে আর ঠোটে লিপষ্টিক মাখতে বলে। বন্ধু 'রেমানের আনন্দের উৎস কোথায় বুঝলো আরিফ' তবুও সে তা সায় দিয়েছে কিন্তু হেনা যখন বুঝল-

'বোঝার সাথে সাথেই পর্যাপ্ত যৌবনে বোঝাই নিজের দেহটাকে মি. রেমানের অক্টোপাস চাহনি থেকে দূরে সরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল হেনা।'[১৫]

ঘটনার এই আকস্মিকতায় হেনার মনে হলো-

'স্বামী নয়-নিষ্ঠুর এক কসাই তার এতদিনের পবিত্র অনুভূতিকে ধারালো ছুড়ি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটছে দরদর রক্ত ঝড়ছে ভেতরে'।

তখন হেনা প্রতিবাদী হয় কিন্তু আরিফের শান্ত কণ্ঠস্বর কেবল এতটুকু বলে-

'তায়িফের চাকরী হয়েছে।'[১৬]

কি নির্দ্বিধায় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য স্ত্রীকে অর্থাৎ নারীটিকে কাজে লাগিয়েছে সমাজের পুরুষ। কি মর্মান্তিক এ জীবনের ধার। পুরুষ তার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নারীর সম্মানকে নিচে নামিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করেনা। এখানে পুরুষতান্ত্রিকতা নারীর নিজস্বতাকে কিভাবে ভুলুণ্ঠিত করেছে তার স্বচ্ছ চিত্র দেখতে পাই।

Dhaka University Institutional Repository

সেলিনা হোসেনের 'ইজ্জত' গল্পটিতে দেখা যায়, ভাইদের ঘরে 'বাড়তি মানুষ' মালেকাকে ওর চেয়ে বত্রিশ বছরের বড় লতিফের চতুর্থ বউ হিসেবে বিয়ে দেয়। মালেকার জীবন 'শোবার ঘর, রান্নাঘর, গোয়াল ঘর আর পুকুর ঘাটে'ই আটকে থাকে। তারপরও মালেকা তার মনের দুয়ার খুলে ভালবাসতে চেয়েছিল মাইনকা নামের লোকটিকে :

> 'শুধু একটু ভালোবাসা প্রাণে উথাল পাতাল টান। মাইনকা মন বুঝতোনা, বুঝতো শরীর।'[১৭]

মালেকার এই উপলব্ধি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আরেক পুরুষ স্বামী লতিফের কাছে চরমভাবে ভুলুণ্ঠিত হয়। 'মাইনকা পছন্দ করবে কেন' এই অপরাধে বউকে মেরেই ফেলে বংশের ইজ্জত রক্ষার্থে। মৃত্যুর পর মালেকা তার জীবনের চাওয়া পাওয়ার হিসেব কষে :

> 'মালেকা কিছুই বুঝতে পারেনি। এখনও পারছেনা। শুধু ওর ছাব্বিশ বছর বয়সটা প্রশ্ন হয়েই থাকে। যে লোক চারজন স্ত্রী নিয়ে এক বাড়িতে বাস করে সে চরিত্রবান, সে ভ্রষ্ট নয়। এতে নাকি সম্মান বাড়ে, বংশের ইজ্জত। যে নারী শুধুই ভালবাসার কাঙাল হয় জীবনকে অন্যরকম করে সাজাতে চায়, চারজন স্ত্রীর একজন হতে চায় না, সব অপরাধ তার ? সে বংশের ইজ্জত নষ্ট করে, তাই তাকে মরতে হবে।'[১৮]

সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতার সুন্দর চিত্র এ গল্পটি। সংসারে সমাজে পুরুষ নারীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে নিজের ইজ্জত বাড়ায়। তাতে নারীটির অবস্থা কত করুণ হয় তা তাদের দেখার বিষয় হয় না। মালেকার এ প্রশ্ন তাই সমাজের কাছে সমস্ত নারীর প্রশ্ন হয়ে আসছে। লেখক তীব্র ভাষায় মালেকার মধ্য দিয়ে এর প্রতিবাদ করেন এভাবে :

Dhaka University Institutional Repository

'শুধু প্রচণ্ড তীব্রতায় অনুভব করে যদি আর একবার বেঁচে উঠতে পারতো ? ঐ ইজ্জতের পাছায় লাথ্‌থি মারার জন্য ও আর একবার বাকলজোড়া গ্রামে ফিরে আসতে চায়।'[১৯]

মালেকার ভেতর আত্ম পরিচয়ের এই যে অনুরণন তা অনবদ্য। সে বেঁচে উঠে প্রথমেই পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবে কষাঘাত করতে চায়। এখানে মালেকার মধ্যে দেখি সে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে চায়, শুধু তার জীবনের ভুলগুলোকে শুধরে নিতে।

'লিপিকার বিয়ে এবং অত:পর' গল্পেও সেলিনা হোসেন লিপিকার মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীনচেতা নারীর অবয়ব তুলে ধরেছেন। লিপিকা একজন আত্মপ্রতিষ্ঠিত নারী হতে চেয়েছিল, কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বসবাসকারী তার পিতা আর স্বামী সে ইচ্ছেকে হত্যা করে। প্রবল পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের অধিকারী আফসারের সাথে বিয়ে দেয় তার বাবা। এখানে বিয়েটা হয়েছে বাবা অর্থাৎ পুরুষটির ইচ্ছেতে। বাবা দেখেছে ছেলেটির অনেক টাকা। অথচ লিপিকা অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল হতে চায়নি। ব্যক্তিত্বহীন-পরনির্ভরশীলতার প্রতি ওর প্রবল বিতৃষ্ণা তৈরি হয়। তখন ওর মাঝে কিছু মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন ভিড় করে:

'শুধু টাকা-পয়সার জন্য বিয়ে? যদি পড়ালেখা না হয় তাহলে ওর নিজের কি হবে? ঐ আফসার মাহবুবের পায়ের তলায় নিজেকে বিকিয়ে দেবে?... সারাজীবন মায়ের মতো মুখ বুজে জীবনের ঘানি টানা? নিজের কিছু থাকবে না? মেধার পরিচর্যা? বিকাশ? মেধাকে কাজে লাগানো? ব্যক্তিত্ব অর্জন করা এবং সবার উপরে নিজের ভাত নিজে খাওয়ার যোগ্যতা লাভ করা ও কোন লজ্জায় আফসার মাহবুবের ঘাড়ে উঠবে?'[২০]

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের পর লিপিকা পড়তে চাইলে স্বামী আফসারের সাথে দ্বন্দ্ব বাধে। আফসার চায় সংসারের সবকিছুই তার ইচ্ছে অনিচ্ছাতে হবে। তখন লিপিকা জোড় করেই বলে ওঠে-

-'তুমি কি ভেবেছ বিয়ে করে তুমি আমার আমিত্বটুকুও দখল করে নিয়েছ ?

-হ্যাঁ, তাতো নিয়েছি। এখন থেকে তোমার সবকিছুই আমার। তোমার মেধা, সৌন্দর্য, নারীত্ব, সবকিছু। তোমার কোনকিছুই তোমার না।

-তাহলে তোমার মেধা, সৌন্দর্য, পুরুষত্বের ওপর কার অধিকার ?

-আমার জিনিস তো আমারই।'[২১]

তখন লিপিকা জিজ্ঞেস করে-

-তাহলে আমারটা আমার নয় কেন ?

তোমার জিনিস দিয়ে তুমি ইচ্ছে মাফিক চলবে, আর আমারগুলো তোমার পায়ের তলায় পিষ্ট হবে ?

-তুমি ভুলে যেওনা লিপিকা যে, তুমি মেয়ে।

-আমি মেয়ে, সেটাইতো আমার অহংকার।'[২২]

পুরুষতন্ত্রের আগ্রাসী চেহারা আফসারের মধ্য দিয়ে লেখিকা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর লিপিকা সমাজের এক আত্মসচেতন নারীর প্রতিচ্ছবি হয়ে আছে। তার এ প্রতিবাদ, অধিকার সচেতনতা সমাজের প্রতিটি মেয়ের। ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ তাঁর 'অর্ক ও সিংহদ্বার' গল্পে দেখিয়েছেন পরিবারের ভেতর থেকে কিভাবে পুরুষতন্ত্রের চর্চা করা হয় আর তাতে একটি মেয়ে কতখানি বলী হয়ে যায়। গল্পের নায়িকা দোলা পড়াশুনা করে বড় হতে চেয়েছিল কিন্তু তার বাবা ছোটবেলা থেকেই নতুন বই কিনে দোলার হাতে না দিয়ে ছেলে দোদুলের হাতে দিত। দুই ভাই বোন একই ক্লাসে পড়ত কিন্তু দেখা গেল-

Dhaka University Institutional Repository

'বাড়িতে কেউ বেড়াতে এসেছেন। দোদুল দুলে দুলে পড়ছে নয়তো অঙ্ক কষছে। পড়ার টেবিল থেকে ওঠার ওর প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু দোলাকে উঠতে হবে। হৈমবতী ডেকেছেন দোলা এদিকে আয়।'[২৩]

-অর্থাৎ পড়া ছেড়ে দোলাকে উঠে অতিথি আপ্যায়নসহ, ময়দা ময়ান, লুচি বেলে মাকে সাহায্য করতে হবে। এভাবেই পরিবার থেকেই একটি মেয়ে নীরব নির্যাতন সয়ে সয়ে বড় হয়। 'পারুলের মা হওয়া' গল্পেও লেখিকা সমাজের ছকবাধা বৃত্তকে উন্মোচিত করতে ছেয়েছেন। নারী-পুরুষ সম্পর্ককে তিনি দিয়েছেন অন্য এক নতুন মাত্রিক রূপ। পারুলের স্বামী ছয় মাস আগে উধাও। পরে পারুল তার আলম চাচার মাধ্যমে জানতে পারে 'সে মনপুরায় আছে বিয়েও করেছে' একথা শুনে পারুলের মধ্যে যে যন্ত্রণা তৈরি হয় তা থেকে ওর মধ্যে কিছু প্রশ্নের উদয় হয়- 'স্বামীর কাছে স্ত্রীর প্রয়োজন কখন ফুরোয়? সামাজিক জীবনে স্ত্রীর ভূমিকা কি? স্বামীর ভূমিকাই-বা কি? ক্ষুৎপিপাস, কাম-ইচ্ছার বাইরে কি কিছু নেই? দিনযাপন মানে কি সেই মানুষটির জন্য প্রহর গোনা?'[২৪]
তখন ওর ভিতর আত্মবোধ জাগ্রত হয়। স্বামী কর্তৃক অনাকাঙ্খিত আঘাতের ফলে ওর মধ্যে আত্মোপলব্ধির উন্মেষ ঘটে এভাবে:

'তখন ওর ভেতরটা পুড়ে যায় নারীত্বের অবমাননায়। জ্বালা-জ্বালা-অন্ধকারে বিড়ির আগুনের মত দপদপ করে।'[২৫]

-এই জ্বালাটা পারুলের মধ্যে একটু থিতু হয়ে এলে সে উপলব্ধি করে সে মা হতে যাচ্ছে। একদিন প্রতিবেশী তারার মা জিজ্ঞেস করে-

-'তোর প্যাড হইছে নি পারুইল্যা ?

- ও লাজুক হেসে মাথা নাড়ে।

- কস কি। স্বামী নাই.....

- প্যাড হইতে স্বামী লাগেনি ?

Dhaka University Institutional Repository

- শুনে তারার মা মুখ খিচিয়ে বলে, বেহায়া মাইয়া।

- ল্যাদার বাপ লাইগত ন ?

- বাপ লাইগব কিয়ের লাই। আঁই বাপ আঁই মা।'[২৬]

এখানে পারুলের মধ্যে সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী রূপ লক্ষ্য করা যায়। শারীরীয় সুখসম্পর্কের মধ্যে সে কোন পাপ খুঁজে পায় না। পারুল নিজেই বলে যে সে নিজের আনন্দের জন্যই যাকে ভাললাগে তাকেই ভোগ করে। সন্তানের কর্তৃত্ব তাই শুধুই তার। তারার মা সনাতন ভাবনার আবর্তে আবর্তিত এক নারী। যারা পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবকে আত্মস্থ করে নেয় অতিসহজে। আধুনিক মননের অধিকারী পারুল তাই সহজেই স্বামীর উপর প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায়। 'এই আত্মবোধ বা আত্মোলপব্ধি নারীমুক্তি বা অধিকার কেন্দ্রীয় নয়। স্বসত্তার বাইরে অপর সত্তার জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা নারীর গুণ, এর সাথে মর্যাদাবোধও যুক্ত। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ নরী বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে কিন্তু নরী বৈশিষ্ট্যকে অমর্যাদাকর মনে করে না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পুরুষের মূল্যবোধ দিয়ে নারীকের বিচার করে ও নারীসত্তার মর্যাদাকে উপেক্ষা করে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ অনুসারে সমাজ কর্তৃক নারীসত্তার অবমূল্যায়নের বিষয়টি নারীর জৈব-দৈহিক দিককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রকৃতির সৃষ্টি নারী আর পুরুষ, কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পুরুষের ভূমিকাকে যে মূল্যে নির্ধারণ করে নারীর ভূমিকাকে সেভাবে করে না। পারুল বর্তমান সমাজের জেগে উঠা এক নারী, তারও ব্যক্তিত্ববেধ আছে। স্বামী নিখোঁজ হওয়াতে তার মানবিক বোধ তাকে উদ্বেগে রেখেছিল কিন্তু তাকে কোনোরকম কিছু না বলে স্বামী অন্যত্র বাস করছে আরেক স্ত্রী নিয়ে এ বিষয়টি তার ব্যক্তিত্বে আঘাত করে। নারীত্বের অবমাননন্না ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। পারুল শ্রেণীগত দিক দিয়ে দরিদ্র, আক্ষরিক জ্ঞান বলতে কিছুই নেই তার তবু সে মূর্খ নয় অন্য অর্থে। ইতিমধ্যে পোড়খাওয়া জীবনের বাস্তবতা থেকেই তার মনে এমন ধারণা প্রোথিত হয়েছে যে, পুরুষ মানুষগুলো পিতৃত্বের কর্তৃত্ব চায়।'[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

ছোটগল্পের জগতের প্রথম দিকপাল এবং পূর্বসূরী লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পেও পাওয়া যায় প্রচণ্ড অহংবোধ জাগ্রত নারী চরিত্রের ঠিকানা। তেমনই একটি ছোটগল্প 'শাস্তি' (১৩০০)। যেখানে দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক নারী চরিত্র চন্দরা। আশ্চর্য নিপুণ আলোয় উদ্ভাসিত এ চরিত্রটি। সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে অবস্থান করেও চন্দরা ছিল আধুনিক মন-মননে গড়া। তার মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি বলিষ্ঠ-অহংবোধে পূর্ণ নারীকে সমাজ বাস্তবতার নিরিখে অবয়ব দান করেছেন। অত্যন্ত জীবন ঘনিষ্ঠ হৃদয়ের অধিকারী এই নারী। গল্পে দেখা যায় পারিবারিক কলহের এক পর্যায়ে বড় ভাই খুদিরাম তার বউকে মেরে ফেল্লে তাকে বাঁচাতে গিয়ে ছোটভাই ছিদাম তার নিজের বউ চন্দরার নাম উপস্থাপন করে। ছিদামের মনোভাব ছিল :

> 'ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।'[২৮]

ছিদামের এই উক্তি শুনে চন্দরা বজ্রাহতের মত ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে গেছে। এতে চন্দরা হতবাক হয়ে যায় কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর উপর প্রচণ্ড ঘৃণায় বাঁচার চেয়ে মৃত্যুকেই বেশি শ্রেয় মনে করে। তাই 'চন্দরা মনে মনে স্বামীকে বলছে,

> 'আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম।'[২৯]

এরপর ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করলে চন্দরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফাঁসির পূর্বে শুধু মাকে দেখতে চাইলে-

> 'ডাক্তার কহিল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।"
>
> তার উত্তরে চন্দরা কেবল ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দ উচ্চারণ করল-"মরণ"!'[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

চন্দরার এই যে ব্যক্তিত্ব, তা অতুলনীয়। তার মধ্যে সাধারণ নারীসুলভ হা-হুতাশ নেই, কান্না নেই, অভিযোগ নেই, আছে কেবল এক অনমনীয় গভীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ চারিত্রিক উজ্জ্বলতা। চন্দরার এখানে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের শিকার হয়ে জীবন দিল। এভাবেই সমাজে নারী প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শেকলে আবদ্ধ হয়ে পরে। চন্দরার মধ্যে আত্মমর্যাদা সচেতন এক নারীরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। যে পুরুষের স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে একটি জীবন্ত প্রতিবাদ। সে বিদ্রোহ করেছে তার স্বার্থপর এবং মিথ্যেবাদী স্বামীর বিরুদ্ধে অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজের বিরুদ্ধে। তার মধ্যে লেখক নারীমুক্তির পরিপূর্ণ জিজ্ঞাসাকে অভিব্যক্ত করেছেন।

রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উদ্ধার' (১৯০০) গল্পটিতেও দেখা যায় স্বামীর মিথ্যে সন্দেহের বিরুদ্ধে স্ত্রী গৌরীর প্রতিবাদী চিত্র। নারীজীবনে তার ন্যায্য মর্যাদা না পেলে একসময় চিরচেনা পথ ছেড়ে নতুন পথে হাঁটতে পারে তারই বিশ্বস্ত চিত্রায়ণ। নারীও যে সমাজ-মনন সম্পন্ন এক জীবন্ত অবয়ব তা গৌরী ভালকরেই বুঝিয়ে দিয়েছে। স্বামী তাকে অকারণে চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করে। এমনকি গৃহবন্দী রেখেও তার সম্পর্কে নানাপ্রশ্ন করে দাসদাসীদের কাছে পর্যন্ত। স্বামীর এ হীন আচরণে গৌরী অপমানিত বোধ করে, হয় আহত এবং ক্ষুব্ধ। এর থেকে শান্তি পেতে আশ্রয় নেয় সন্ন্যাসী ধর্মকর্মে, কিন্তু সেখানেও পরাভূত হয় পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের কাছে। সমাজের কাছে মানুষের কাছে পবিত্রতার আদর্শ গৈরিকবাসধারী সাধু সেও অপমান করে। সে মুগ্ধ হয় গৌরীর দৈহিক রূপ দেখে। অবশেষে নিরাশ গৌরী আত্মহত্যার মধ্যে শান্তি খোঁজে-

> 'সদ্য বিধবা গৌরী যেমন বাতায়ন হইতে গুরুদেবকে চোরের মতো পুষ্কুরিনীর তটে দেখিল, তৎক্ষণাৎ ব্রজচকিতের ন্যায় দৃষ্টি অবনত করিল। গুরুযে কোথা হইতে কোথায় নামিয়াছেন, তাহা যেন বিদ্যুতালোকে সহসা এই মুহূর্তে তাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া ইঠিল। তারপর সবাই দেখল

Dhaka University Institutional Repository

গৌরীর মৃতদেহ স্বামীর মৃতদেহের পাশে শোয়ান, সে বিষ খেয়ে সমস্ত যন্ত্রণার উর্দ্ধে চলে গেছে। সমাজ দেখল আশ্চর্য সহমরণের দৃষ্টান্ত।'[৩১]

নাসরীন জাহানের 'পুরুষ' গল্পে একজন বিকলাঙ্গ পুরুষেরও পুরুষতান্ত্রিক জীবনবোধকে লেখক তুলে ধরেছেন। প্রতিবন্ধী ছোট ভাই বুলু বড় ভাইদের সম্পর্কে যা বলে তার ভেতর দিয়েও এর প্রকাশ ঘটে:

'বাড়ির কর্তা বড় দুইভাই দু'জন বাবা মরার পর কর্তা হয়ে একেবারে জাতে উঠে গেছে। সারাদিন দু'টো জোয়ান পুরুষ কী যে কাজ করে বাহিরে.....মা তো সাবেকি মা হয়ে এক আধ বেলা প্রায়ই না খেয়ে থেকেও হেসে হেসে ছেলেদের সাথে কথা বলে।'[৩২]

ঘরের গৃহকর্ত্রী মা অর্থাৎ নারীটি সনাতনী রূপবন্ধনে আমূল বেষ্টিত। যে কারণে সে সারাদিন না খেতে পেলেও ছেলেদের সাথে হেসে হেসে কথা বলতে বাধ্য হয়। সমাজ এভাবেই পরিবারের পুরুষতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখে। পরিবারে নারীটিকে হয় স্বামীর, নয়ত ছেলের দয়ায় এবং তাদের অধীনতাপাশে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। লেখক পুরুষদের এই পৌরুষকে আরো ব্যঙ্গাত্মক পরিচর্যায় প্রকাশ করেছেন:

'বুলুর হাতে এখন পশুর শক্তি। মূহুর্তে সে তরুণীর দুপা ধরে নিচে ফেলে দেয়। একটা চিৎকার। বুলুর মাথায় রক্ত, শরীরে আগুন। ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় মানুষগুলোরও। বুলু সমস্ত রক্ত-সম্পর্ক অসম্পর্কের ঊর্ধের্ব চলে গিয়ে তীব্রভাবে বোঝাতে চায়, সে একজন মানুষ। একজন পুরুষ।'[৩৩]

একজন বিকৃতাঙ্গ পুরুষও পুরুষতান্ত্রিকতায় কতখানি আত্ম সচেতন। সে অথর্ব তারপরও সে সবাইকে জানান্ দিতে চায় সে মানুষ, সে একজন পুরুষ মানুষ।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের পুরুষের মধ্যে এই যে সচেতন মনোভাব যা নারীরা তাদের ভেতর আনতে পারে না। তারা শারীরিকভাবে পঙ্গু না হলেও মানসিকভাবে এতটাই জরাগ্রস্ত যে, নারী নিজেকে নিজেই মানুষ হিসেবে ভাবতে পারছেনা। পরিবার সমাজ নারীকে পদে পদে শক্তি শূন্যতার কথা শেখায় যার ফলে নারীকে সহজেই পুরুষ নিজেদের অধীন করে রাখতে পারে। সমাজে পুরুষ তার আশ্রিত বা বাধ্যগত রাখতে নারীর উপর নানা আইনী বলয় তৈরী করে দিয়েছে যা নারীরা ঐশী বাণী বলে আত্মস্থ করে নয়। নাসরীন জাহানের 'সূর্য তামসী' গল্পগ্রন্থের 'ল্যাম্প পোস্টের নিচে' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুশতাকের মনস্তাত্ত্বিক চৈতন্য বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে লেখক পরাবাস্তবাদের বহুকৌণিক রূপ তুলে ধরেছেন। গল্পে দেখা যায় মুশতাক আহমেদের তরুণ ছেলে পাপ্পু জণ্ডিসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। এর পরেই মুশতাক আহমেদের মনস্তাত্ত্বিক বিকার শুরু হয় এবং তার দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পের পরিবেশ তৈরী হয়। লেখক বিষয়টিকে মানব চৈতন্যের এক ভিন্ন মাত্রিক অবয়ব দিয়েছেন এভাবে :

> 'মুশতাক আহমেদ ঠিক আজানের সময় স্বপ্নে দেখেন-জণ্ডিসে আক্রান্ত মৃত ছেলেটা বড় রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে ওভারব্রিজের ওপর গিয়ে উঠেছে। তারপর ন্যাংটো হয়ে চলন্ত নগরীর ওপর পেচ্ছাপ করছে।'[৩৪]

ঘটনগত বিষয়াবরণকে লেখক মনোবিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। আত্মবিশ্লিষ্ট চৈতন্যাক্রান্ত পাপ্পুর পুনর্জীবনলাভের দৃশ্যগুলোও বাস্তব-অবাস্তব এক জগৎ তৈরী করেছে। 'রহস্যপ্রিয়তা অনেক লেখক-লেখিকার প্রিয় বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে এই বিশেষ ধারার লেখক-লেখিকাদের আগ্রহও যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। নাসরীন জাহানও চলতি যুগের বৈচিত্র্যভরা আবহাওয়ায় লালিত মানজীবন-রহস্যের এরকম একজন অনুসন্ধান-তৎপর কথাশিল্পী। তাঁর রহস্য সৃষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি তাঁর গল্পে কোনো অবাস্তব কল্পনাকে স্থান দেন নি; অর্থাৎ কল্পনার ফানুস নির্মিতিতে তাঁর কোনো উৎসাহ নেই। অথচ বাস্তব বিষয়কে নিয়ে রহস্যের জাল বয়ন করে, তিনি তাঁর কল্পনাকে প্রয়াশ রূপকধর্মী করে

Dhaka University Institutional Repository

তোলেন। "ল্যাম্পপোস্টের নীচে" এরকম একটি রহস্যময় গল্প।'[৩৫] এ গল্পের একটি জায়গায় লেখক কিছু প্রাণীর যেমন কুকুর, কাক, মাছির জীবনাচরণকে তুলে ধরেছেন। তারা ডাষ্টবিন থেকে খাদ্য অন্বেষণ করতে গিয়ে দেখলে যে, একটি ছেলের লাশ তা দেখে তাদের খাদ্যের চাহিদা আরও লোভনীয়ভাবে বেড়ে যায়। স্লিভলেস ব্লাউজ পড়া পাশের বাসার কাজের মেয়ে এক গাদা ময়লা ছুড়ে ফেলে তাতে ল্যাম্পপোস্টের নীচে পড়ে থাকা 'লাশটির বিকারহীন পা নড়ে ওঠে। সে খুব জোড়ে নিঃস্বাস টানতে শুরু করে। মাছিগুলো পড়িমড়ি করে ছুটে বেড়ায়। পরম বিস্ময়ে তারা সচল লাশটার দিকে চেয়ে থাকে। .... এইভাবে লাশটার সমস্ত ইন্দ্রিয় জাগতে শুরু করে। ল্যাম্পপোস্টের তলার পৃথিবীতে একটা অদ্ভুত আলোড়ন উঠে, কুকুরটা এবং মাছিগুলো ভয়ে চলে যায়। একমাস জণ্ডিসে আক্রান্ত ল্যাম্পপোস্টের চোখ সরল আনন্দে হেসে ওঠে।'[৩৬]

এদিকে পরের দিন খবরের কাগজে এই বিষয়ে খবর বের হয় যে, 'মশা, মাছি, কাকের সাথে সাথে মানুষ আকৃতির কিছু প্রাণীর জন্ম হচ্ছে। যাদের জন্মস্থান ময়লার স্তুপ। এদের সংখ্যা বেড়ে চললে অচিরেই আরো ভয়ানকভাবে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেবে। কেননা ময়লার স্তুপেও এখন পরিমিত খাদ্য নেই।'[৩৭]

অর্থাৎ লেখক এর ভেতর রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে বর্তমানের অসহিষ্ণু জীবনাচরণ ও অস্থির সমাজ ব্যবস্থাকে তুলে ধরেছেন। পরাবাস্তববাদী এ দৃশ্য কল্পেও লেখক নারী পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে সামন্তমূল্যবোধের প্রকাশ দেখিয়েছেন। মৃত পাপ্পু জীবিত হয়ে ওঠে ঘরে চলে আসে। ঠিক তখনই মুশতাক আহমেদ তার লাল চোখ নিয়ে ঘরে এসে:

> 'পাপ্পুকে বসা অবস্থায় দেখে, আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠেন। ভয়ে কুঁকড়ে ওঠে পাপ্পু। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে ফর্শা রঙের এক ভয়ানক মহিলা। সে টেনে পাপ্পুকে বাইরের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মুশতাক

Dhaka University Institutional Repository

আহমেদ গর্জে উঠেন-মা নামের কলঙ্ক। ছাড় বলছি, নইলে এই মুহূর্তে আমি তোমাকে ডিভোর্স দেব।'[৩৮]

পাপ্পুকে ঘিরে মুশতাক আহমেদের এই মনো চৈতন্যের শব্দরূপেও স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস আর অসৌজন্য আচরণের প্রকাশ ঘটে। নারীর সম্ভ্রমবোধ, নারীর নিজস্ব জগৎকে স্বীকৃতি দিতে পুরুষের পৌরুষে আঘাত মনে করা হয়। পুরুষের ধ্বংসাত্মক মানবিকতা সৃষ্টির পথ খোঁজে অনামিকা হক লিলির 'উচ্ছিত্তি' গল্পে দেখা যায় বার বছরের ছোট ছেলে তার মাকে অসংখ্য প্রশ্ন করতে থাকে ওর দৃষ্টিতে যা অসঙ্গতি মনে হয়। সমাজের নানা দিক বালকটির জিজ্ঞাসার ভেতর দিয়ে বের হয়ে আসছে। বালকটির পিতা সাপের কামড়ে মরে গেলে তাদের ঢাকায় চলে আসতে হয়। ঢাকায় এসে তায়েব দেখে তাদের জীবনে অন্য এক থাবা। বাপের বন্ধু 'কেরামত আলী তায়েবের মায়ের দিকে তাকিয়ে কেমন এক রকম করে হাসে' এতে তায়েব রাগে দুঃখে অভিমানে ওর মায়ের দিকে তাকায়। তাকিয়ে ওর মায়ের নীরব চোখের ভাষা তায়েব অনুধাবন করে এভাবে:

'মা যেন স্নেহের আবেগে মনে মনেই বুকে চেপে ধরে ছেলেকে মনে মনেই যেন বলছে, বাজান, তোকে আমি কি করে বোঝাব বাজান? দশজনে যে আমাকে ছিঁড়ে খেতে চায় বাজান, তুই তো ওদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে পারবি না, তাই তো ঠিক করেছি একজন, এই একজন কেরামত মিয়াই আমাকে পাহারা দিক। কিন্তু মুখে ছেলেকে কিছুই বলতে পারে না মা।'[৩৯]

সমাজে একজন নারীর এই আসহায়ত্ব নারী জীবনের পরাজয়ের এক অন্যতম হাতিয়ার। এখানেই রেডিক্যাল নারীবাদ সমাজের এ বিষয়টিকে নারী নির্যাতনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করে সমাজ এবং রাষ্ট্রের কাছে এর প্রতিকার চেয়েছেন। 'অবিভাজ্য যাতনা' গল্পে অনামিকা হক লিলি দেখিয়েছেন একটি মেয়ের

Dhaka University Institutional Repository

মানসিক যন্ত্রণাবিদ্ধ এক নীরব গৃহকোণ সেটা স্বামীর ঘর কিংবা ছেলের ঘর যা-ই হোক না কেন যাতনা একই। স্বামীর ঘরেও ছিল অধিকারহীন আবার বৃদ্ধ বয়সে ছেলের সংসারেও তাই। নারীর নিজস্বতা বলে আর কিছু নাই। তাইতো স্বামীর মুখে সে তার নাম শুনে অবাক হয়:

> 'হঠাৎ একদিন কি হল জানিস। তোর বাবা আমার নাম ধরে ডাকছেন বলে শুনলাম। অনকেদিন নামটা না শোনার ফলে, মানে বাবার বাড়ী থেকে আসার পর তো কেউ আর ও নামে ডাকে নি-তাই প্রথম বুঝে উঠতে একটু সময় লাগল- যে সত্যই আমাকেই তিনি ডাকছেন কেন। দেখি সত্যই তাই, নামটা আমি ভুলতেই বসেছিলাম এই চার বছরে।'[৪০]

বিয়ের পর নারীর এই 'নিতান্ত বৌ হয়ে' থাকার কারণেই নারীকে তার সমস্ত আত্ম মর্যাদা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে হয়। নারী তাই নিজের নামটা পর্যন্ত ভুলে যায়। তাঁর নিলম্বন গল্পগ্রন্থের নাম গল্পে দেখা যায়, শিক্ষিত সুন্দরী মেয়ে ইভা বিয়ের পর নব্য ঠিকাদার ব্যবসায়ী স্বামী তারেকের ইচ্ছেতেই তাকে জীবনের প্রতিটি পা ফেলতে হচ্ছে। এখানেও নারী হিসেবে ইভার নিজস্ব কোনো কাজ ছিল না, নিজস্ব কোনো মতামত ছিলনা সে ছিলো কেবল তারেকেরই এক ইচ্ছের পুতুল। গল্পে দেখা যায়, ইভা একদিন পড়াশুনার কথা বল্লে:

> 'প্রস্তাবের সাথে সাথেই অট্টহাসিতে যখন তারেক ফেটে পড়ে, আর বলে, থাক থাক ওসব পাণ্ডিত্য পণ্ডিতদের ঘরে মানায় আমার ঘরে বি.এ.পাশই বেশি বুঝেছ? এর পরেও অবশ্যই ইভা আবারও চেষ্টা করে বলতে, ... কিন্তু তাতেও তারেক এমন গাম্ভীর্য দেখায় যে ইভা হতচকিত হয়ে পড়ে। ... গম্ভীরতাই প্রকাশ করে এটা অর্থহীন ও অযৌক্তিক। ইভা আশ্চর্য্য ও নিথর।'[৪১]

Dhaka University Institutional Repository

নারী হিসেবে ইভা যে তার স্বাধীনভাবে পথ চলবে তা পুরুষতান্ত্রিক আদর্শে নিষ্ঠ স্বামী তারেক কিছুতেই মানতে রাজি নয় তাইতো ইভা কেবল 'আশ্চর্য্য ও নিথর' হয়েই থাকে। তাইতো নারীর জীবনের পথ চলা সমাজে, পরিবারে, রাষ্ট্রে এভাবেই থেমে যায়।

'কুন্তলার অন্ধকার' গল্পে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব একটি পুরুষকে অর্থাৎ স্বামী কিংবা পিতাকে কত অমানুষ করে দেয় তার চিত্র ধরা পরে। ছোট্ট মেয়ে কুন্তলা জীবনের শুরুতেই কিভাবে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে তার বর্ণনায় লেখক বলেছেন:

> 'কুন্তলা সাত বছরের বালিকা। এখন পর্যন্ত বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। ওর মনে শান্তি নেই। কারণ বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে ও প্রায়ই দেখতে পায় বাবা মাকে ধরে মারছেন। মায়ের সময় যেসব কথা বলে তা শুনে ওর ভীষণ ভয় করে। কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে ওর।'[৪২]

একটা শিশু মধ্যে পরিবার বিশেষ করে পিতা কিভাবে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে মা শিউলি বেগমের ওপর অমানসিক নির্যাতন করতে যৌতুক লোভী পিতাকে। বাপের বাড়ী থেকে যৌতুক এনে দেয়ার জন্য খুব মারত। কুন্তলা মাঝে মাঝে কষ্টে-ভয়ে মাকে কোথাও পালিয়ে যেতে বলত। অসহায় মা শিউলি তখন মেয়ে সাথে যাবে কি-না জিজ্ঞেস করত। মাতৃস্নেহ তাকে পাষণ্ড স্বামীর ঘরে থাকতে বাধ্য করত। তাইতো শিউলি বেগমের জীবনের শেষ রক্ষা হয় না। চলে যেতে হয় মৃত্যুর পরপারে। একদিন সকালবেলা কুন্তলার ঘুম ভেঙ্গে যায় মায়ের কণ্ঠের গোঁ গোঁ শব্দে। ও দ্রুত দরজার পাশে এসে দেখে-

> 'বাবা মায়ের মুখের ওপর বালিশটা চেপে ধরেছে। ওর মা মাথা নাড়াতে পারছেনা। ওর বাবা বসে আছে ওর মায়ের ওপরে। একটু পরে নিথর হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যায় শিউলি বেগম ও দৌড়ে গিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে, মাকে তুমি মেরো না বাবা। বাবা তুমি আমাকে পাচারকারীদের কাছে বিক্রি করে দাও।

ওরা আমাকে অনেক টাকা দেবে।

মুস্তাফিজ মেয়ের দিকে ঘুরে তাকায়। বাবার লাল চোখের রাগী দৃষ্টি দেখে ও একই ঢঙে বিড়বিড় করে বলতে থাকে, মা তোমাকে টাকা দিত পারে না। কিন্তু আমি পারি। তুমি আমাকে বিক্রি করে দাও বাবা, তবু মাকে মেরে ফেলো না।'[৪৩]

কি মর্মান্তিক একটি শিশু তার মাকে মেরে ফেলতে দেখে তার নিজেরই পিতাকে। তখন সে কত অসহায়ভাবে পিতাকে আকুতি জানায় তাকে যেন পিতা পাচারকারীদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে টাকা নেয় তবুও যেন মাকে মেরে না ফেলে। কি করুণ আর্তি-'তুমি আমাকে বিক্রি করে দাও বাবা, তবু মাকে মেরে ফেলো না।' একটি মেয়ের এই আর্তি গুনে ধরা সমাজের কেউ শুনতে পায় না। যে কারণে মেয়ের সামনেই তার মাকে মেরে ফেলতে পারে তার পিতা।

সেলিনা হোসেনের 'রইস্যা চোর' গল্পে দেখা যায় একজন চোরের স্ত্রী হয়ে হাফেজা বেগমকে সমাজে কি রকম দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে। কোথাও গ্রামে চুরি হলে পুলিশ তার বাড়ীতেই খুঁজতে আসে। এমনকি রইস্যা চোরের মৃত্যুর কয়েক মাস পরেও পুলিশ ওর খোঁজে বাড়ি এসে জিজ্ঞেস করে 'কোথা তোমার স্বামী?'

'তখন হাফেজা বেগম উত্তর দেয় না। সবার আগে বীরদর্পে হাটে, যেন ওকে জয়ের নেশায় পেয়েছে। পুলিশের মুখের ওপর আজই প্রথম ওর জিত। রশিদ মিয়ার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বলে, এইতো এই খানে।'[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই হাফেজা বেগম তার ভেতরের যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছে। সে সরাসরি বলেনি যে রইস্যা চোর মরে গেছে। একজন চোরের সাথে দিন যাপনেও সে ছিল ব্যক্তিত্ব সচেতন। তাইতো তার দাম্পত্য জীবনের চিরায়ত দিনগুলোকে লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে:

> 'অকস্মাৎ ওর ভেতরে প্রবল অভিমানও জমে যায় এই লোকটি ওকে কোন শান্তি দেয় নি। দিন মুজুরি আর চুরির টাকায় সংসার চালিয়েছে। গ্রামের লোক ওকে রইস্যা চোর ডাকে। এতে হাফেজার কষ্ট হয় সম্মানে বাধে, কিন্তু কষ্ট বোঝে না ওর স্বামী। ওর ধারণায় মান-সম্মান বলে কিছুই নেই। কোনো রকম দিন গুজরান হলেই হলো। লোকে ওকে চোর বলে তো কি এসে যায়। হাফেজার কষ্টের উপর আঙ্গুল নেড়ে এ কথাটা সরবে ঘোষণা করে রশিদ মিয়া।'[৪৫]

রশিদ মিয়ার পেশা নিয়ে তার কোন বিকার নেই এর কোনো প্রভাব তার উপরে পরে না। সে কষ্টও পায় না। নারীটি দোষ না করলেও সমাজ নারীটিকেও সমানভাবে দোষী করে। আবার স্বামীটি চোর হলেও স্ত্রীর উপর তার প্রভূত্বের প্রকাশ ঠিকই ঘটায় পুরুষতান্ত্রিক বৃত্তে বলয়িত হয়ে। চোর হিসেবে সামাজিক কোনো নিন্দা বা অসম্মান তাকে ছুঁয়ে যায় না কিন্তু নারীটিকে ঠিকই ছুঁয়ে যায় সামাজিক অসম্মান।

সেলিনা হোসেনের 'মর্গে' গল্পেও একটি নারীর জীবনের মর্মান্তিক চিত্র দেখতে পাই। বিয়ের আগেই এক পাষণ্ড পুরুষকে ভালবেসে গর্ভধারণকারী নারীর জীবনের অসহায়ত্ব আর তার জীবনের দুরবস্থা এ গল্পে লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পের নায়িকা পূর্ণিমাকে, স্বার্থপর পুরুষ শচীন্দ্র আকাশকুসুম ভালবাসার স্বপ্ন দেখায়। সে স্বপ্নে বিভোর হয় পূর্ণিমা। লেখক সূক্ষ্ম ভাষায় এর প্রকাশ দেখিয়েছেন এভাবে:

Dhaka University Institutional Repository

'শচীন্দ্র ওর কানে কানে বলে, স্বর্গে যে নারী-পুরুষের মিলন হয়েছিলো তার কৃতিত্ব নারীর। নারীই তো পৃথিবীকে প্রাণ দিয়েছে। পূর্ণিমা আবেগে বিহবল হয়। শচীন্দ্র ওর হাত সচল করে, কটিত হতে থাকে পূর্ণিমার শরীর। পূর্ণিমা জানতেও পারে না যে শচীন্দ্র প্রেম বোঝে না, বোঝে শরীর শচীন্দ্রের কণ্ঠ অদ্ভুদ এক ধ্বনিতে পূর্ণিমার কাছে পৌঁছাতে থাকে। কতো দিনরাত কেটে যায়, পূর্ণিমার বিহ্বলতা কাটেনা। শচীন্দ্র কাছে এলে ও প্রেমের শব্দ শুনতে পায়, বোঝে না ওই শব্দ ওর নিজের ভেতরেরই শব্দ।'[৪৬]

এভাবেই নারীটি প্রতারিত হয় পুরুষের ভালবাসার মিথ্যে ভাষণে। একদিন গর্ভবতী হয়ে পড়লে পূর্ণিমা শচীন্দ্র'র কাছে যায়। সে মহাভারতের কুমারী মাতার গল্প শোনায়। পূর্ণিমা তাতে আশ্বস্ত না হলে শচীন্দ্র বলে ওঠে 'তোমার মনে পাপ সেজন্য দেখতে পাওনা।' পূর্ণিমার হৃদয় আর্তনাদ করে ওঠে-'পুণ্যবান শচীন্দ্র, হায় পুণ্যবান শচীন্দ্র'-এ আর্তনাদ শচীন্দ্র শুনতে চায়না। সে যে সমাজে পুরুষ মানুষ সে এসব শুনবে কেন। তাই পুর্ণিমা সন্তানের পিতৃত্বের পরিচয় চাইলে এবং তর্জনী তুলে ধিক্কার দিয়ে সমাজের সামনে বিচারের কথা বললে শচীন্দ্রের সহ্য হয় না। সে তখন অন্য এক কৌশল অবলম্বন করে:

পূর্ণিমাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে ঘর থেকে বের করে। ভালোবাসার কথা বলতে বলতে মেঠো পথ পেরিয়ে জঙ্গলে আসে। সেখানে নেকড়ে হয় শচীন্দ্র। ঝাপিয়ে পড়ে পূর্ণিমার ওপর। পূর্ণিমা ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে, রক্ত ঝরে এবং সে রক্তের প্রতিটি ক্ষত শ্রবণেন্দ্রিয় হয়ে যায়। ও শরীর দিয়ে শুনতে পায় শচীন্দ্রর কঠিন কণ্ঠ, কেন পূর্ণিমার বিয়ের সাধ, কেন ঘরের স্বপ্ন, কেন সন্তানের পিতৃত্বের দাবি, এতো সাহস পূর্ণিমার কোথা থেকে হয়!'[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে সমাজের পুরুষ শচীন্দ্র নিভিয়ে দেয় পূর্ণিমার যত স্বপ্ন-সাহস আর জীবনের সাধ। এরপরেও সমাজে একটি নারীর অবহেলা থেমে যায় না। পুলিশ লাশ নিতে এসে একটি লাশের সাথেও কত দুর্ব্যবহার করে-

> 'যুবকেরা দেখেছে পুলিশেরা লাশ নামানোর পর সোমত্ত যুবতীকে লাথি দিয়ে বলেছে, হারামজাদি মরার আর জায়গা পেলো না।'[৪৮]

পুরুষের দৃষ্টিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে এভাবেই মুখ থুবড়ে পরে যায় একটি নারীর জীবন, রাষ্ট্রীয় পুলিশতো সমাজেরই পুরুষ মানুষ তাই নারীর সাথে নারীর লাশের সাথেও তাদের আচরণ একই রকম হয়। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সবাই স্নাত থাকে সব সময়। অনামিকা হক লিলির 'শীতল বিরূপ' গল্পেও দেখা যায়, নায়িকা লোরী সনাতনী-ভাব-ভাবনা ছেড়ে অতি আধুনিক এক নারী হয়ে উঠেছে। তাতে স্বামী গালিব প্রথমদিকে ভেবেছে 'আমি বিয়ে করেছি বলেই ওর সকল রকম ইচ্ছাগুলোকে কিনে নিয়েছি তা তো নয়। আমি নিজে ওর মধ্যে আমার জীবনটা সংক্ষিপ্ত করেছি বলেই ওর বিস্তারে বাধা দেব তাতো হতে পারে না'। গালিবের এই উদার চিন্তা ক্রমশ পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের কাছে পরাভূত হয়ে যায়। তাইতো 'লোরী কষ্ট পেলে আজকাল আনন্দ পায় গালিব'। সে তার পৌরুষে দীপ্ত হয়ে ভাবে স্ত্রী লোরীর জীবন-লাটাই তো তারই হাতে:

> 'বিছানায় শুয়ে ভাবে গালিব, বেশতো লোরী উড়ে বেড়াক যত চায়। সে যেন লাটাই ধারী, সুতা সে ছেড়েই চলবে যতক্ষণ যতদূরে ঘুড়িটা যেতে চায়। বাতাসে হেলুক দুলুক তবু সে সুতা ছেড়েই যাবে -হয় প্রতিকূল বাতাসে ভোঁ কাট্‌টা সুতা ছিঁড়ে অসীমে মিলিয়ে যাবে লাগানের বাইরে নয়ত মুখ থুবড়ে এসে পড়বে একদিন।'[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

কী অসীম সুখানুভূতি স্বামী গালিবের। সে হল নারীটির অর্থাৎ স্ত্রীর 'লাটাই ধারী'। তার ইচ্ছেতেই সব কিছু হতে হবে। নয়ত 'মুখ থবড়ে' তার পায়েই একদিন লুটিয়ে পড়তে হবে আর সেদিন সে ইচ্ছেমত আচরণ করতে পারবে। এইতো পুরুষতান্ত্রিক ছকে চালিত নিজস্ব পুরুষ।

অনামিকা হক লিলির নিলম্বন গল্প গ্রন্থের 'স্বাতী' গল্পেও দেখা যায়, দুটো নারীর জীবন কিভাবে একজন মৃত ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যন্ত্রণার চরম শিখরে পৌঁছে দেয়। সমাজ এভাবেই নারীকে উদার হওয়ার ঐশী বাণী শেখায়। পুরুষ স্বামীটি মারা যাওয়ার পরও স্ত্রী স্বামীর স্মৃতি নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। বঞ্চিত করছে নিজেকে। মেয়ে বড় হয়ে বিয়ে করতে পারছেনা। অস্বাভাবিক লাগছে কাউকে ভালবাসতে। তখন মেয়ে তার মনোভাব ফুটিয়ে তোলে এভাবে:

> 'প্রতিদিনের অজস্র নতুনের মধ্যে বাবা আমাদের একই রকম ঘরের বাঁধনো বড় ছবির বাবা নিথর-নাক চোখ মুখ নিয়ে যেন চিরচেনা। আর এই চিরচেনার জন্যই রাগ হয় স্বাতীর হঠাৎ হঠাৎ আজকাল বড় ফটোর সামনে একা একা দাঁড়িয়ে বলে, কখনও রেগে, কখনও ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে "বাবা, বাবা! তুমি তো মরে গেছ চলে গেছ বাবা। তবুও কেন কেন আমাদের কাছ থেকে যাচ্ছো না?"[৫০]

স্বাতী বা তার মায়ের জীবন মৃত্য বাবার স্মৃতি দিয়েই ঘুরপাক খায়। পিতার মৃত্যুর পর স্বাতীর জন্যই তার মা দ্বিতীয় বিয়ে করেনি। স্বাতী বড় হয়ে যখন অনুভব করল ওর চারদিকে কত আনন্দ কিন্তু তাতে ও মিশে যেতে পারেনা। কেবলই মনে হয় ওর মা একা, নিঃসঙ্গ শুধু ওরই জন্য।

'বিধবা' গল্পে ছোটগাল্পিক সেলিনা হোসেন নারী জীবনে পুরুষ স্বামীটির বাঁচা-মরার সাথে সম্পৃক্ত শব্দটি কিভাবে একটি নারীকে সামাজিকভাবে যন্ত্রণাবিদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

করে তার চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পের কথক প্রকৃতি ওর খালাত বোন প্রেরণার স্বামী অমৃত খুন হওয়ার পরে এ বিষযটি উপলব্ধি করে। প্রেরণার মা যখন মেয়ের বৈধব্য নিয়ে বিলাপ করছিল তখন প্রকৃতি ভাবছিল;

> 'একটি মেয়ের স্বামী মরে গেলে তাকে কেন আর একটি শব্দ দিয়ে আলাদা করা হবে?।'[৫১]

অর্থাৎ মেয়েটিকে বলা হবে 'বিধবা'। শব্দটির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে একটি মেয়ের জীবনের বিশাল এক শূন্যতার গহ্বর। গল্পের আখ্যানে দেখা যায়, নায়িকা প্রেরণার বিয়ের দিনই সন্ত্রাসীদের হাতে ওর স্বামী অমৃত- 'দুপুরে বিয়ের উৎসবটা হওয়ার পরে ওদের বাসর হওয়ার আগেই খুন' হয়। এরপর প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রায় বছর গড়ায়। এরপর একদিন খালাত ভাই প্রকৃতির সাথে ওর বিয়ে হয় কিন্তু বিয়ের রাতেই দেকা যায় প্রকৃতির গায়ে অনেক জ্বর। বিয়ের কিছু দিন পর স্বামী প্রকৃতিও লিউকোমিয়া রোগে মারা যায়। শুরু হয় প্রেরণার জীবনে দ্বিতীয় বৈধব্যের যন্ত্রণাবিদ্ধ বাক্যবাণ। যদিও আধুনিক মন-মানসের অধিকারী প্রেরণা জীবণকে বাস্তবতার আলোকে বুঝতে শিখেছে তাইতো-

> 'যেদিন প্রকৃতি মারা গেলো সেদিন বাড়ি শুদ্ধ লোকের মাঝে কেউ জোড়ে জোড়ে বললো, মেয়েটা আবার বিধবা হলো। শব্দটি শুনে প্রেরণা মাথা তোলে। নিজেই বিড়বিড় করে বলে, বিধবা! এই শব্দটি প্রকৃতির অভিধানে নেই এবং আমারও না। আমার জীবনে প্রকৃতি না থাকাটা সত্য নয়, ও আছে এবং আমার একাকীত্ব নেই।'[৫২]

নারীর এ উপলব্ধি আধুনিক অন্তর্মানসের বহিঃপ্রকাশ। নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত স্বামী-স্ত্রীর অন্তর্নিহিত বন্ধন এখানে নারীটিকে করেছে সংবেদনশীল। সনাতনী উদ্বন্ধনে বন্দীহলে তার মধ্যে চেতনার এ জাগরণ ঘটত না। প্রতিটি নারীর ভেতর

Dhaka University Institutional Repository

মননের এই দীপ্ত প্রকাশ হলে তাদের আত্ম প্রত্যয় বাড়ত। তারা পেত প্রত্যাশিত জীবনালোক।

"জীবন আমার ভালোবাসা" গল্পে মকবুল মন্‌জুর সেবাপরায়ণ একটি মেয়ের দৃশ্য এঁকেছেন, গল্পের নায়িকা লাবনী যে অসুস্থ মানুষের সেবা করতে পছন্দ করে। গল্পের নায়ক ফারুক তাকে এই সেবাপরায়ণ মানসিকতার কারণেই আবার হারাতেও হয়েছে তাকে। ফারুকের বন্ধু আসাদ অসুস্থ হলে দিনরাত যে তার সেবা করে যায়। একদিন তাই ফারুক বিয়ের কথা বলে লাবনী বলে উঠে:

'ফারুক তোমার সব আছে, কিন্তু আসাদের যে কেউ নেই আমি ছাড়া।' এই কথা বলে কান্না-কান্না আর কান্না। পাশের ঘরে সদ্য হাসপাতাল ফেরৎ আসাদ ঘুমিয়ে। তখন কথক ফারুকের দৃষ্টিতে লাবনী ধরা পড়েছে এভাবে:

> 'আমি বুঝলাম লাবনী আসাদকে ভালোবেসেছে তার কোন গুণে মুগ্ধ হয়ে নয়। লাবণীর বুকের ভেতর যে সেবাপরায়ণ নারী লুকিয়ে আছে, আসাদের রুগ্ন অসহায়ত্বকেই সে ভালোবেসেছে। যেমন একদিন রুগ্ন অবস্থায় পেয়ে আমাকেও ভালোবেসেছিলো।'[৫৩]

নারীর এ রূপটি পুরুষকে মুগ্ধ করে। তাই পুরুষ নারীর ভেতর সেবাপরায়ণ গুণটিরই প্রবল প্রকাশ দেখতে চায়। যুগ যুগ ধরে নারী তাই এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়।

গল্পের কথকের জীবনে জড়ানো নারীদের ব্যাপারে অবলীলার তার মনের প্রকাশ দেখা যায়। তিনি তা প্রকাশ করেছেন এরকম ভাষায়:

> 'যখন আমি ভালো থাকি, আনন্দে থাকি, তখন আমার লাবণীকে মনে পড়ে না। লাবণী যেন শুধু আমার আর্ত হৃদয়ের সাথে অদেখা সুতোয় বাঁধা।

Dhaka University Institutional Repository

কখনও হয়তো আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে, অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জার ব্যথায় শরীর ভেঙে যাচ্ছে তখন আমি লাবণীকে আমার শিয়রে দেখতে চেয়েছি। আবেগের তীব্র আশ্লেষে বুকের ভেতর পিষ্ট দলিত করতে চেয়েছি। অথচ হঠাৎ কোন শিউলী সুবাসিত শরতে, পলাশ ফোটা ফাল্গুনে কিংবা কৃষ্ণচুড়ার আগুন লাগা তীব্র বৈশাখে আমি লিলিকে চেয়েছি সঙ্গিনী হিসেবে, ইলুকে নিয়ে বাসে চড়ে চলে গেছি সাভার পেরিয়ে সেই নদীটার পাড়ে। সেখানে ছোট্ট, একটা ডিংগি বাঁধা থাকে।'[৫৪]

কথক লাবনীর যে চিত্র এঁকেছেন তাতেও তার মানস ভাবনার পরিচয় মেলে: 'এই লাবনী, যার রং শ্যামলা, শান্ত চোখ আর করুণ লাবন্যমাখা মুখ দেখে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখের কথা মনে পড়ে।' সমাজে নারীর ব্যাপারে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিটি এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুরুষ তার মনের রঙ বদলের সাথে সাথে নারী বদলেও সদর্থক ইচ্ছে জাগে মনের গভীরে।

মকবুলা মন্‌জুর 'নিহত কিংশুক' গল্পে একজন শিক্ষিত বেকার ছেলের বেকারত্বের মনো যন্ত্রণার চিত্র এঁকেছেন। তার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা নারীদের রূপ-রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেছে গল্পের কথক রানা তা প্রকাশ করেছেন। ভাবী এবং মা সম্পর্কে বলেছেন:

'রানু ভাবীর সেই রানু রানু মিষ্টি মিষ্টি ভাবটা এই কয়েক বছরে মিলিয়ে গেছে। এখন কি নিরুত্তাপ আর নির্মম ঔদাসীন্য রানু ভাবীর কথাবার্তায়। বিশেষ করে রানা এম,এ, পাশ করে বেরোবার পরের এই দুটো বছরে রানু ভাবী-ভাইয়া দু'জনেই কেমন বদলে গেছে। ভাবীর নিষ্ঠুরতা তার নীরব তাচ্ছিল্যে, ভাইয়ার নিষ্ঠুরতা নির্মম ভাষণে। আরও অসহ্য দেশ থেকে আসা মায়ের চিঠির ভাষা। না মা রানাকে লেখে না রেখে রানু ভাবীকে। 'রানা কি কোন চাকরী বাকরীর চেষ্টা করিতেছে, না কেবল মাসুদের ঘাড়ে বসিয়া অন্ন

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বংস করিতেছে?" রানা জানে মা এসব কথা লেখে উপার্জনক্ষম ছেলের স্ত্রীকে তোয়াজ করার জন্য। অথচ এই মা-ই ছুটিতে যখন রানা গ্রামে যেতো বলতো, 'তুই পাশ করে যখন চাকরী করবি তখন আমি ঢাকায় গিয়ে তোর কাছে থাকবো।' রানা জানে রানু ভাবীকে মার পছন্দ না। তবু মা তাকে তোয়াজ করে চিঠি লেখে।'[৫৫]

অর্থাৎ কথক তার চারপাশের নারীদের ভেতর কেবল স্বার্থপরতাই সে আবিষ্কার করেছে। মা-ভাবীর উদারতা তার দৃষ্টিকে ছুঁয়ে যায়নি। মকবুলা মনজুরের 'শীতার্ত জ্যোৎস্না' গল্পে দেখিয়েছেন এক স্বার্থপর অবিবেচক পরুষের জীবনাবেগ। গল্পে দেখা যায়, আনোয়ার নামে এক লোক কাজের উদ্দেশ্যে ট্রেন থেকে কনকপুর ষ্টেশনে নামে কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টির কারণে গন্তব্যে যেতে পারেনি। তখন ষ্টেশন মাস্টারের সাথে পরিচয় হয় এবং সে তার বাড়ী নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে জানতে পারে ষ্টেশন মাস্টারের স্ত্রী শিউলি তারই পূর্ব প্রেমিকা। অর্থাৎ শিউলি তার পূর্ণ যৌবনে এই আনোয়ারকে ঘিরেই স্বপ্নের জ্বাল বুনেছিল। তালুকদার বাড়ীর আশ্রিত অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে ঘর বাঁধার আকর্ষণে আনোয়ারের মুগ্ধ হাতছানিতে সাড়া দিয়েছিল। শিউলির আশ্রয় দাতা খালাম্মা বিষয়টি জানতে পেরে নির্যাতন করে শিউলিকে। লেখকের ভাষায়:

'খালাম্মার হাতে সেই অমানুষিক নির্যাতন সইতে সইতে শিউলি দেখেছিল, ঘর থেকে বেরিয়ে চোরের মত পালিয়ে যাচ্ছে আনোয়ার। চোরের মত পালিয়ে বেঁচেছিল আনোয়ার। যৌবন পুষ্ট একটি নারীর দেহ তাকে বিভ্রান্ত করেছিল, কিন্তু তাকে ভালোবাসার, তার দায়িত্ব নেবার মত কথা সে চিন্তাও করেনি। একুশ বছর বয়সের ছেলে স্বপ্ন দেখে, রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্বের, এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়, আবার কাঠ কুড়ুনীর মোহে নিজেকে হারায়, এ দৃষ্টান্তও রয়েছে ভুরি ভুরি। কিন্তু শিউলি নারী। জীবনটা তার শুধু দেহ নয় দেহাতীতওবটে। সে ভালোবেসেছিল আনোয়ারকে তার সমগ্র দেহ মন

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে। আনোয়ার তাকে প্রেমদেবে, দেবে নীড় আর স্ত্রীর মর্যাদা এই আশাতেই সে রাত্রিতে অভিসারিকা হবার দূঃসাহস হয়েছিল তার। কিন্তু বাস্তবে দেখল আনোয়ার তাকে নির্যাতন থেকে, অপমান থেকে রক্ষা করেনি। বরং কলঙ্কের ডালির তার মাথায় তুলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।'[৫৬]

পুরুষরূপী আনোয়ার 'পাঁচ বছর আগে যেদিনও শিউলিকে লাঞ্ছনার মুখে ফেলে পালিয়েছিল সেদিনওর কষ্ট হয়নি, কিন্তু আজ অদ্ভূত একটা কষ্ট গলা ঠেলে উঠতে চাইল বার বার। ষ্টেশন থেকে মাস্টার সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে কনকপুর স্কুলের পথে হাঁটতে হাঁটতে আনোয়ার অবাক হয়ে ভাবল, সে বিবাহিত এবং এক সন্তানের বাপ হয়ে শিউলির কাছে মিথ্যা বলল কেন? শিউলির হৃদয়ে তার বেদনার্ত স্মৃতি জাগিয়ে রাখবার জন্য? শিশিরের অশ্রুদোলা পথের ধারের একটি বুনো ফুলের দিকে তাকিয়ে আনোয়ারের আশ্চর্য লাগলো এই ভেবে যে, পাঁচ বছর আগে সে শিউলিকে কেন ভালোবাসেনি?'[৫৭]

অর্থাৎ পুরুষটির শঠতা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। বিষয়টি সে নিজেই নিজেকে একজন শঠ প্রবঞ্চক রূপে আবিষ্কার করে। সে বিদায় নেওয়ার সময়ও তাই অবলীলায় স্ত্রী-সন্তান সম্পর্কে মিথ্যে বলে যায়। সমাজে পুরুষ, নারীকে কেবল ভোগের বস্তুমনে করে। তাইতো মামির বাড়িতে যখন আনোয়ার প্রথম শিউলিকে দেখে তখন তার দেহ-ই চোখে পড়ে। শিউলির মনের আকুতি ওকে ছুঁয়ে যায় না। সে শুধু দেখেছেঃ

'দু'বেলা মুখে রক্ত তুলে খেটেও কি অপূর্ব সুঠাম স্বাস্থ্য মেয়েটার। শ্যামলা শান্ত মেয়েটার দেহের বাঁকগুলো এক দুরন্ত আকর্ষণে টেনেছিল তাকে।'[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে পুরুষদের এই ভোগী মানুসিকতার দায় কেবল একা নারীকেই বহন করতে হয়। সেজন্যই সমাজে মাথা তুলে বাঁচতে পারে শুধু পুরুষ আর নারী হয় সমস্ত নির্যাতনের চরম শিকার।

'নাস্তিক' গল্পে রাজিয়া মজিদ দেখান যে, আস্তিকতা বা নাস্তিকতা মানব জীবনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। গল্পে কথক ফুয়াদের বন্ধু শওকত নাস্তিক হওয়ায় তার আস্তিক প্রেমিকা সাবিহা নিজে বিয়ে না করে বন্ধু ফুয়াদের হাতে তুলেন। বিয়ের দিন শওকত দামী উপহার সাবিহার হাতে তুলে দিয়ে বলল,

'তোমাকে যা সুন্দর লাগছে ! নিঃসঙ্কোচ উত্তর সাবিহার, আমি তো সবসময়েই সুন্দর।

-তাই নাকি?

- হ্যাঁ, আমি তো মানুষ। বন্য পশুকে মাঝে মাঝে সুন্দর দেখালেও আসলে ওরা কুৎসিত।

- কেন বল তো?

- ওদের অনিশ্চিত ব্যবহারের জন্য। অহংভাবের জন্য। কালো হয়ে গেল শওকতের মুখ, উত্তর দিল না।'[৫৯]

এখানে সাবিহা তার জীবনকে গুছিয়ে নেয়ার সাথে সাথে প্রেমিক শওকতের ব্যবহারকেও নীরব ভর্ৎসনা করল। পশুর আচরণের সাথে তুলনা করল। এরপর শওকত স্টোক করে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বিছানায় পড়ে থাকল। তখন একদিন সাবিহা দেখতে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল কেন সে তাকে বিয়ে করেনি। উত্তরে শওকত বলেছিল:

'আমি ছিলাম নাস্তিক। তোমাকে সুখী করতে পারতাম না।

- তুমি তো তোমার সৃষ্টিকর্তাকে ফিরে পেলে।

Dhaka University Institutional Repository

- তোমাকেও ফিরে পেয়েছি। আমার অন্তর্নিহিত আকাঙ্খার নীরব ইচ্ছা দিয়ে।'[৬০]

এভাবে মানুষের জীবন নিয়তি নির্ধারিত হয়ে যায়। আর পুরুষ তার ইচ্ছাশক্তিকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করে যার ফলে নারীটির দুঃখ দুর্দশা তাকে ছুঁয়ে যায় না। ঝর্ণা রহমানের "দেবভূমিতে কয়েকজন মানবী" গল্পে একজন মহিলা ডাক্তারের যাপিত জীবন তুলে ধরা হয়েছে। ডাক্তারটি তার ছোট্ট ছেলে শিশুটিকে নিয়ে হাসপাতালে ডিউটি করে এর মধ্যে প্রসব বেদনা নিয়ে একটি রোগী আসে। রোগীটি ব্যথায় প্রচণ্ড কষ্ট পেলে কপ্লিকেটেড পেশেন্ট হিসেবে তাকে চিহ্নিত করে ডাক্তারদের ভেতর যে টেনশন তৈরি হয় তা এখানে ধরা পড়েছে। ডাক্তার দেখেছে যে পেটের বাচ্চাটির অবস্থা খারাপ তখন তারা অপারেশন করে বাচ্চা বের করতে চাইলে মেয়েটির স্বামী এবং পিতা তা দিতে চায় না টাকার জন্য কিন্তু মেয়েটির মায়ের কাছে টাকার চেয়ে মেয়ের জীবন বড় হয়ে ধরা দেয়। তাই যে-

'ডাক্তার রেণুর হাত চেপে ধরে মেয়েটির মা। মা গো, আপনেরা আমার মা। আমার জামাইয়ের কতায় কান দিয়েন না গো। ম্যায়ার বাপের কতায়ও কান দিয়েন না গো। আমি অর মা। আমি কইতাছি আপনেরা আমার হাসিনারে অপারেশন করেন। দ্যান কাগজটা আমার কাছে। মাইয়ার বাপে সই কইরা দিব। নাইলে আমিই টিপসই দিমু...।'[৬১]

অর্থাৎ পরিবারের পুরুষদের কাছে অর্থই প্রাধান্য পায় একটি নারী জীবনের চেয়ে। কিন্তু মেয়েটির মায়ের কাছে মেয়ের জীবন প্রাধান্য পায়। এরকমই আরেকটি গল্প "ট্র্যাফিক জ্যাম একটি মৃত্যু ও কয়েকটি বালিহাঁস"। গল্পটিতে দেখা যায় কথক তার জীবন চলার পথে গল্পের নায়িকা দীপুকে প্রয়োজন মনে করেছিল একসময় কিন্তু প্রয়োজন শেষ হওয়ার সাথে সাথে ছুঁড়ে ফেলতে দ্বিধা করেনি। কথকের জীবন সম্পর্কে ভাবনাটা হলো 'জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইলে যে

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয় মইটা নিজেকেই খুঁজে নিতে হয় আর তাকে নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতে হয়'- এই মনোভাব থেকেই তিনি তার প্রেমিকা দীপুকে জীবন থেকে সরিয়ে দেয়। তার ভাষায়:

> 'আমি কিছুতেই বোঝাতে পারিনা যে জীবন অনেক বড়। সেখানে ছেলেমানুষী আবেগের কোন মূল্য নেই। দীপুকে আমার এক সময় ভালো লেগেছিল। হ্যাঁ, অপরিহার্যও মনে হয়েছিল। আমরা পরস্পর কাছাকাছিও হয়েছি। দুজন দুজনকে বুঝেছি- সেটা সত্যি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেই ঘটনাটুকুকে সারা জীবন ধরে রাখতে হবে। দীপুকে এখন মনে হয় বন্ধন। আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। স্পষ্টতার ক্ষেত্রে আমার কোন দ্বিধা নেই। আমার কথা শুনে দীপু একটা কাটা লতার মতো এলিয়ে পড়েছিল। তাতে আমার তেমন উৎকণ্ঠা হয়নি। দীপু আর একটা কথাও বলেনি।'[৬২]

গল্পে কথক একজন ধুরন্দর আর কৌশলী পুরুষ। সমাজে যারা নারীকে নিজের পথ চলার কাঁটা সরাতে কাজে লাগায়। নারী সম্পর্কে এদের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে নেতিবাচক। নীচু মনের এই পুরষরাই সমাজে পুরুষতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যার ফলে নারীরা হচ্ছে প্রতিনিয়তই নির্যাতিত। "শেষ উপহার" গল্পে দেখা যায় চাকরীজীব একজন লোক জব্বার সাহেব যার বিদায় অনুষ্ঠানে অফিসের সব লোকজন তর ভাল দিকগুলো তুলে ধরছে। সবাই জাকজমকপূর্ণ সাজ দিয়েছে। তার জন্য অফিস থেকেই দামী শার্ট-প্যান্ট কিনে দিয়েছে কিন্তু সেই জব্বার সাহেবেরই চিন্তায় চিন্তায় কাপালে নতুন নতুন ভাজ পড়েছে। চাকরীর বয়স শেষ কিভাবে তার সংসার চলবে। তাই বিদায় অনুষ্ঠানের এত আড়ম্বর দেখে তার মনে হল 'ওরা সবাই তাকে এত ভালোবাসত! ওরা কি সত্যিই তাঁকে চাইতো। যদি তাই হয়, যদি একথাই সত্যি হয়, তবে কেন তিনি এক্সটেনশন নিলেন না। স্ত্রীর হাঙর মুখ যেন কেমন মোলায়েম আর স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। সে সত্যিই বলেছে- এখনে ছেলেরা

Dhaka University Institutional Repository

পুরোপুরি উপার্জনক্ষম হয়নি! এখনো মেয়েদের বিয়ে হয়নি। বাড়ী-ঘর হওয়া প্রয়োজন।'[৬৩] - অর্থাৎ একদিন তার চিন্তা দেখে স্ত্রী বলেছিল চাকরীর এক্সটেনশন করাতে। তখন তার মনে হয়েছিল 'স্ত্রীকে মনে হল ঠিক একটা হাঙর! তাঁর মান, উজ্জত সব গ্রাস করতে চায়। টাকার জন্য মস্ত এক হা করে আছে!'- সেই ভাবনা থেকে এবং অফিসের সবার ভালবাসার কথা শুনে এখন আর তার স্ত্রীর চাওয়াকে হাঙরের মত মনে হচ্ছে না। পরিবারের প্রয়োজনটাকে তার স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কিন্তু পরিবারের এই প্রয়োজনের কথাই যখন স্ত্রীটি মনে করিয়ে দিত তাতে স্ত্রাটি খারাপ হত তার মুখটাকে হাঙরের সাথে তুলনা করত। পুরুষের আধিপত্যবাদ আর অহংবোধের কারণেই সমাজে-পরিবারে কেবল শুধু তাদের নিজেদেরই বড় মনে হয় আর সব তুচ্ছ। এই তুচ্ছের দলেই স্ত্রী পড়েন। পুরুষ নারীকে এভাবে মূল্যায়ণ করে থাকে। "সতর্ক থাকবো" গল্পে উঠে এসেছে পুরুষদের মাঝে লুকিয়ে থাকা পশুত্ব ভাবটির। একটি ছোট শিশুও এই পশুত্বের কাছে নিরাপদ থাকেনা। ছোট মেয়ে রুনু যে একটি হরিণ শিশুর মত তার ওপর স্কুলের পিয়ন রহিম আলীর কু-দৃষ্টি পড়ে। লেখকের ভাষায়- রুনু দু'হাতে তালি দিয়ে-দিয়ে এদিকেই আসছিলো। - এই বচাচা! বলেই যেন সামলে নিলেন ও.সি সাহেব। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন- এসো তো মা ! ... আদর পেয়ে রুনু তাঁর কোলের কাছে এসে দাঁড়ালো। উনি জিজ্ঞেস করলেন। রুনু তাঁর কোলের ওপরে দু'হাত রেখে জবাব দিলো- রহিম ভাই আমার প্যান্টের ভেতর পেশাব করে দিয়েছে! বাথরুমে ...।'[৬৪] - গল্পে দেখা যায়, এই ঘটনায় রুনুর "ব্যাচেলর" বড় চাচা খুব হম্বিতম্বি করে কিন্তু তার চরিত্র নিয়েই স্কুল শিক্ষিকা হেলানা বলেন:

> 'জানো, এই লোকটির জন্য এ্যানি এই স্কুল ছেড়েছে। সে তাকে থ্রেট করেছিল। তাকে যেতে বলেছিলো ছুটির দিন তার অফিসে, একা! এ্যানি রাজি হয়নি। ভয় দেখিয়েছিলো সে। সেই ভয়ে চাকরি ছেড়ে পালিয়ে গেছে এ্যানি।- এক নিশ্বাসে বলে গেলো সে কথাগুলো।'[৬৫]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ সমাজের কোন পুরুষের কাছেই কোন মেয়ের জীবন নিরাপদ থাকতে পারেনা। যে চাচা আজ ভাতিজির জন্য চিৎকার করছে সে-ই একদিন এক শিক্ষিকার যন্ত্রণার কারণ হয়েছিল। পুরুষদের মাঝে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব এভাবেই সর্বত্র তার শেকড় বিস্তার করে থাকে। পূরবী বসু তাঁর "আত্মরক্ষার দশ উপকরণ" গল্পে দেখিয়েছেন যে, জীবনের প্রয়োজনে মানব জাতিকে কত রকম কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এই কৌশলের ভিতর নারীর অধিকারের প্রয়োজনও থাকে। গল্পে দেখা যায়, এক পিতা তার তিন ছেলেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনটি পদ্ধতি শিখতে বলে। আলয়কে সাঁতার, নিলয়েকে বৃক্ষারোহণ এবং সময়কে দ্রুত দৌড়াতে বলা হল। তিনজনই স্ব স্ব ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করল তবুও পিতামাতার মৃত্যুর পর তারা যখন আক্রান্ত হল শত্রু পক্ষ উল্টো তিন দিকে নিয়ে গেল। আলয়কে জলাশয়ের দিকে, নিলয়কে নদীর তীরে, আর দিশাহীন সময় শূন্যে ভেসে উঠে গেলো। এরকম তিনদিন থাকার পর তিন ভাইকেই লোকালয়ে ফিরে আসতে বলে। আলয়কে তখন ফিরে আসার কারণ হিসেবে 'বানর কহিল, ইহা ছাড়া তোমার একাকীত্ব মোচন ও শারীরিক প্রয়োজনেও নারীসঙ্গ দরকার। তোমাকে লোকালয়ে ফিরিতেই হইবে' এবং নিলয়কে মৎস্য একই কথা বলেন- তাহা ছাড়া তোমার সঙ্গলাভ ও দৈহিক আনন্দের জন্য একজন নারী প্রয়োজন। লোকালয়ে তোমাকে ফিরিতেই হইবে। '[৬৬] অর্থাৎ গল্পটিতে দেখা যায় মানব প্রজাতি সঙ্গলিপ্সু এবং পুরুষের জন্য নারীসঙ্গ অতীব প্রয়োজনীয় একটা ব্যাপার। সমাজে তাই নারী-পুরুষ সম্পর্ক অমোঘ নিয়তিরই মত এক সংহত দিগ্বলয়। "মানা ও কুকুর বিষয়ক জটিলতা" গল্পে পাপড়ি রহমান দেখিয়েছেন গ্রামে ঝাড়-ফুক আর অলৌলিককতার আধিক্য মানব জীবনকে কেমন করে যন্ত্রণা বিদ্ধ করে দেয়। গল্পে দেখি আসমানী আর তবারক উদ্দিনের পনের বছরের দাম্পত্য জীবন কোন সন্তান না হওয়ায় তুকতাক, তাবিজকাবচ অনেক কিছু শেষে জিঞ্জির শাহর কেরামতির কথা শুনে তবারক উদ্দিন তার স্ত্রী আসমানীকে নিয়ে হাজির হয় 'যদি কোন না কোন উছিলায় তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়...' এই আশায়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে গিয়ে তবারকউদ্দিন পড়ে গেছে অন্য এক গোলক ধাধায়। সে দেখে-

Dhaka University Institutional Repository

'তা জিঞ্জির শাহর ডেরা থেকে ফিরে আসমানী যেন আমূল বদলে গেল! তার চলনেবলনে কী এক প্রফুল্লতা! চেহারায় আলগা লাবণ্যের প্রভা! যা কিনা বর্ষায় ফুটন্ত কদমের শোভাকেও হার মানায়। আসমানীর হঠাৎ পরিবর্তনে তবারক উদ্দিনও যেন ধান্ধায় পড়ে যায়। এ কোন আসমানী? তবারকউদ্দিনের মনে হয় আসমানী যেন লতানো কোনো গাছ, যে কিনা আকর্ষিতে অবলম্বন পেয়ে ধাই ধাই করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। তা তবারকউদ্দিন এমন লতানো স্ত্রীকে দেখে খানিকটা অবাক হয়, খনিকটা আনন্দিতও বটে। কিন্তু তারপরও পুরুষমানুষ বলে কথা! তার বুকে যেন কী এক সন্দেহের কাঁটা অকারণ খচখচ করে। তবারকউদ্দিন তা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টাও করে। এবং নিজেকে সান্তনা দেয়ার ছলেই যেমন মনে মানে ভাবে, 'মাইয়ানুক হলো গাঙ্গের মতন। তাতে হাজার আবর্জনা ফেল্যা দ্যাও তাও সে মজবো না। মন্দ হবো না।' কিন্তু এসব ভাবলেই কি তবারকউদ্দিনের যন্ত্রণার উপশম হয়? হয় না; বরং তার মনে নতুন করে খটকা লাগে। আসমানী সত্যিই কি কোনো আবর্জনা বয়ে চলেছে? তবারকউদ্দিন তা কৌশলে আঁচ করার চেষ্টা করে। ফলে তবারকউদ্দিনের নতুন এক কাজ বেড়ে যায় এবং তা হলো লুকিয়ে লুকিয়ে আসমানীকে লক্ষ করা। এতে সে আরো বেশি চমকায় এবং মর্মাহতও হয়। সে লক্ষ করলে দ্যাখে-আসমানী যেন অচেনা অথচ অপরূপ কোনো লালিমায় উদ্ভাসিত। ভোরে সূর্য ওঠার আগে আকাশে যে কোমল আলো ছড়িয়ে থাকে অনেকটা তেমন। আর সে আলোর সম্মুখে তবারকউদ্দিন যেন হতচকি, ম্লান।'[৬৭] অর্থাৎ তবারকউদ্দিন যে পুরুষ সে কারণেই তার মধ্যে পৌরষত্ব জেগে জেগে ওঠে আর স্ত্রীটিকে 'অকারণ সন্দেহের' কাঁটায় জর্জরিত করে। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব সমাজে পুরুষদের এভাবেই স্বার্থপর আর নিরুদ্বেগ করে দেয়। এ গল্পের বিষয়াবরণকে হুমায়ুন আজাদের একটি উক্ত দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়:

> 'নারীকে মাঝে মাঝেই তুলনা করা হয়েছে জলের সাথে; সে হচ্ছে আয়না, যাতে পুরুষ, নার্সিসাসধর্মী, নিবিষ্টভাবে দেখে নিজেকে; সরল বিশ্বাসে বা প্রতারণার জন্যে সে হেলে পড়ে নারীর দিকে। নারী হচ্ছে তার জন্যে পরম

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষতিপূরণ, কেননা তার কাছে অচেনা এক আকৃতিতে, যা সে অধিকার করতে পারে নারীর মাংসে, নারী হচ্ছে তার নিজের দেবত্ব-অর্জন। সে আলিঙ্গন করে এ-'অতুলনীয় দানবী'টিকে, যখন সে নিজের বাহুতে বাঁধে সে-সত্তাটিকে, যে তার কাছে বিশ্বের সারসংক্ষেপ এবং যার ওপর সে চাপিয়ে দিয়েছে তার মূল্যবোধ ও বিধিবিধান। তারপর, সে নিজের করে নিয়েছে যে-অপরকে, তার সাথে মিলিত হ'তে গিয়ে সে আশা পোষাণ করে নিজের মধ্যে পৌছাতে। সম্পদ, শিকার, আমোদ ও বিপদ, সেবিকা, পথ প্রদর্শক, বিচারক, মধ্যস্থতাকারিনী, আয়না, নরী হচ্ছে সেই অপর, যার মধ্যে কর্তা সীমাবদ্ধ না থেকে করে নিজের সীমাতিক্রমণ, যে তার বিরোধিতা করে তাকে অস্বীকার না করে; তাই পুরুষের সুখ ও বিজয়ের জন্যে নারী এতো প্রয়োজনীয় যে বলা যেতে পারে যদি নারী না থাকতো, তাহলে পুরুষ তাকে আবিষ্কার করতো।'[৬৮]

'নিঃশর্ত করতালি' গল্পে মাফরুহা চৌধুরী একটি স্কুলের বার্ষিক ক্রিড়ার আয়োজনের মধ্য দিয়ে নারীজীবনের কিছু খণ্ড চিত্র তুলে ধরেছেন। স্কুলের পুরুষ শিক্ষকদের মাঝেও দেখা যায় সংকীর্ণ পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের প্রকাশ। ক্রিড়ার জন্য জায়গা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাই শিক্ষক হারেস সাহেব পৌরুষের দম্ভ নিয়ে বলে উঠেঃ

'উনি যে জায়গর কথা বলছেন, বুঝলেন আপা, ওখানে এ্যাতো মেয়ের জায়গা হবে না। বললেন কথাগুলো হারিস সাহেব, যেন জেদ করেই। আপনারা মেয়ে মানুষ ওসব জায়গা নির্বাচন ছেড়ে দেন আমাদের হাতে!' তখন শিক্ষিকা রাহেলা বলে ওঠে- 'হ্যাঁ আর আপনারা পুরুষ মানুষরা আমাদের নিয়ে গিয়ে একেবারে খোলা ময়দানে ঢেলে দেন আর কি! হো হো করে হেসে উঠলো সবাই! হীয়ার ইজ মিস রাহেলা! কী ভয়! বাপরে বাপ! কী আতংক মনে মনে! শুধু ওপরে ওপরে তেজ।'[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

গল্পটিতে যা দেখা যায় তা হলো সমাজে পুরুষ সবসময়ে সচেতন থাকে নারীকে কখন কোথায় কতটুকু দাবীয়ে রাখা যায়। সে চেতনা থেকেই পুরুষ হয় সব সময়ই কৌশলী। পুরুষের শাসন শোষণ জেণ্ডারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমাজ সম্মতি দান করে থাকে। পৃথিবী অনেকদূর এগিয়ে গেলেও পুরুষরা তাদের গৃহকোণ থেকে শুরু করে সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র সর্বত্র পৌরুষদীপ্ত পুরুষ হয়ে বিচরণ করে নারীকে নিজেদের অধিনস্ত করে রাখতে তারা তাদের প্রিয় পুরুষতান্ত্রিক নিয়ম নীতিকে ছাড়তে রাজি নন। পুরুষ নির্ভরতা যেন একান্ত কাম্য হয় সেভাবেই পুরুষরা জীবনের সর্বত্র নিজেদের সুবিধামত আইনী বলয় তৈরী করে রাখে। সমাজে প্রচলিত-'বংশের প্রদীপ' হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে বংশ পরম্পরায় কেবলই পুরুষ। সেখানে নারী অবহেলিত, শেকড়হীন এবং পরাশ্রিত। নারীদের কোন বংশ পরম্পরাগত উত্তারাধিকার নেই। ঐতিহ্যগত ভাবেই নারী পরিবারের সকলের কাছে হয় তুচ্ছ। নারীর প্রতি সমাজের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। পরিবার-সমাজ রাষ্ট্র ধর্ম আইন সনাতনী রীতি নীতি আচার অনুষ্ঠান সর্বত্র নারীকে করে রেখেছে পুরুষাশ্রিত। নারীদের প্রতি এই যে অব্যাহত চক্রাকার নির্যাতন তা নিয়তই নারীদের অপমানিত করে। পুরুষদের সর্বভোগী মানসিকতাই সমাজে সনাতনী ধারাকে জিইয়ে রেখেছে। পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক অদর্শ পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট এবং পুরুষ কর্তৃক লালিত। সমাজে পুরুষ সুপুরিয়র মনে করে নিজেকে, নারীর উপরে স্থান করে দিয়েছে। আর সেই ক্ষমতাবলেই পুরুষভাবে পরিবারে কিংবা সমাজে নারীকে সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা পুরুষের জন্মগত অধিকার। নারীর ব্যক্তিত্ব, তাদের চিন্তা-চেতনার স্বাতন্ত্র্য পুরুষ তার পৌরুষের অহংকারে মেনে নিতে পারেনা পুরুষ তখন নিজেকে পরাজিতভাবে। নারীরা তাদের নিজস্ব দৃষ্টি ভঙ্গির প্রকাশ দেখালে কিংবা নারী তার যোগ্যতা বা দক্ষতার পরিচয় দিলে, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে পড়ে যায় পুরুষ। আর তাই পুরুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে মরিয়া হয়ে উঠে। পুরুষের এই ক্ষমতা আর আধিপত্যের কাছে নারীর অস্তিত্ব হয়ে পড়ে হুমকির সম্মুখীন। যে কারণে নারী প্রতি মুহূর্তে সমন্বয় করে চলে নিজের সাথে সমাজের সাথে এবং পরিবারের সাথে। নারী এভাবেই হারিয়ে ফেলে তার আপন ব্যক্তি

Dhaka University Institutional Repository

সত্তাকে। সমাজে পুরুষ নারীকে কিভাবে দেখে, কি দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে মূল্যায়ন করে তা বাংলাদেশের মহিলা ছোটগাল্পিকদের গল্পে সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছ।

তথ্যপঞ্জি

১. খালেদা এদিব চৌধুরী, বন কেউটে, নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারী ২০০২, শোভা প্রকাশ ঢাকা। পৃ-২২

২. প্রাগুক্ত, পৃ-৪০

৩. সেলিনা হোসেন, বৈশাখী গান, উৎস থেকে নিরন্তর, গল্প সমগ্র, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা-২০০২, সময় প্রকাশ, ঢাকা। পৃ-২৩

৪. ঝর্ণা রহমান, জীবনের জলও অনল, ঘুম-মাছ ও এক টুকরো নারী, বইমেলা-২০০২, ঐতিহ্য প্রকাশ, ঢাকা। পৃ-৪৮

৫. দিলারা হাশেম,পরিচয়, গল্প সমগ্র-১, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১, ঢাকা। পৃ-৪৩

৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৫

৭. হৃদয় ও শ্রমের সংসার, মতিজানের মেয়েরা, প্রাগুক্ত, পৃ-৩১৯

৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৩১৮

৯. প্রাগুক্ত, পৃ-৩১৯

১০. প্রাগুক্ত, পৃ-৩২০

Dhaka University Institutional Repository

১১. রাশিদা আখতার খানম, নারীবাদী চিন্তা ও মতিজানের মেয়েরা, উলুখাগড়া, সম্পাদক: সৈয়দ আকরাম হোসেন, প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১২, ফেব্রুয়ারী-২০০৬, সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, ঢাকা, পৃ-১৮৪-১৮৫

১২. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, বাপের বাড়ি, গল্প সমগ্র, ফেব্রুয়ারী-২০০২, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা। পৃ-৫২

১৩. হেলেনা খান, সুন্দর দুটো আঁখি ও সূক্ষ্ম একটা ধুলিকণা, বৃষ্টি যখন নামল, মে-১৯৭৮, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ-০১

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ-০১

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ-০৫

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ-০৭

১৭. সেলিনা হোসেন, ইজ্জত, মতিজানের মেয়েরা, প্রাগুক্ত, পৃ-৩২৭

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৩২৭

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩০

২০. লিপিকার বিয়ে এবং অত:পর, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩৮

২১. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪২

২২. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪৩

২৩. ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ, অর্ক ও সিংহদ্বার, প্রমীলা সুন্দরী মালতী মালা থেকে মোনা রায়, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রু-২০০২, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ-২০

২৪. পারুলের মা হওয়া, মতিজানের মেয়েরা, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪৫

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪৬

Dhaka University Institutional Repository

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪৬

২৭. রাশিদা আখতার খানম, নারীবাদী চিন্তা ও মতিজানের মেয়েরা, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৩-১৮৪

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শাস্তি, গল্পগুচ্ছ, নভেম্বর ১৯৯৮, প্রতীক প্রকাশনী সংস্থা, ঢাকা। পৃ-১৩৪

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৪

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৬

৩১. উদ্ধার, প্রাগুক্ত, পৃ-৩১৬

৩২. নাসরীন জাহান, 'পুরুষ' নির্বাচিত গল্প, বইমেলা-২০০২, অন্য প্রকাশ, ঢাকা পৃ-২৪

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ-২৫

৩৪. প্রাগুক্ত, ল্যাম্প পোষ্টের নিচে, সূর্য তামসী, ফেব্রু-১৯৮৯, পল্লব পাবলিসার্স, ঢাকা, পৃ-১০

৩৫. হুমায়ুন আজদ (অনুদিত), দ্বিতীয় লিঙ্গ, ফেব্রুয়ারী-২০০২, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ-১৫৩

৩৬. প্রাগুক্ত, ল্যাম্প পোষ্টের নিচে, সূর্য তামসী, পৃ-১০

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ-১৩

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ-১৫

৩৯. অনামিকা হক লিলি, উচ্ছিত্তি, নিলম্বন, জানুয়ারী ১৯৮৩, সন্ধ্যানী প্রকাশীন, ঢাকা, পৃ-২৯

Dhaka University Institutional Repository

৪০. অবিভাজ্য যাতনা, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৯

৪১. নিলম্বন, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৯

৪২. সেলিনা হোসেন, কুন্তলার অন্ধকার, নারীর রূপকথা, ফেব্রুয়ারী-২০০৭, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা পৃ-১১৩

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ-১১৭

৪৪. রইস্যা চোর, অনূঢ়া পূর্ণিমা, গল্প সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯১

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮৮

৪৬. মর্গ, অনূঢ়া পূর্ণিমা, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯১

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯২

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯২

৪৯. অনামিকা হক লিলি, শীতল বিরূপ, নিলম্বন, প্রাগুক্ত, পৃ-২০

৫০. স্বাতী, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩

৫১. বিধবা, নারীর রূপ কথা, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ-২৭

৫৩. মকবুলা মনজুর, জীবন আমার ভালোবাসা, নক্ষত্রের তলে, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৯, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ-৪৮

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৪

৫৫. নিহত কিংশুক, নক্ষত্রের তলে, প্রাগুক্ত, পৃ-৫১

Dhaka University Institutional Repository

৫৬. শীতার্ত জ্যোৎস্না, নক্ষত্রের তলে, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৫

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৬৬

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৬৪-৬৫

৫৯. রাজিয়া মজিদ, নাস্তিক, ভালোবাসার সৈই মেয়েটি, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৫, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ-৬৫ ।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ-৬৮

৬১. ঝর্ণা রহমান, দেবভূমিতে কয়েকজন মানবী, অগ্নিতা, ফেব্রুয়ারী-২০০৪, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ঢাকা, পৃ-৬১

৬২. ট্রাফিক জ্যাম একটি মৃত্যু ও কয়েকটি বালিহাঁস, অগ্নিতা, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩

৬৩. মাফরুহা চৌধুরী, শেষ উপহার, কোথাও ঝড়, মে-১৯৮০, মৌসুমী পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ-৪৫

৬৪. সতর্ক থাকব, কোথাও ঝড়, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৯

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ-৫৫

৬৬. পূরবী বসু, আত্মরক্ষার দশ উপকরণ, নিরুদ্ধ সমীরণ, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৬, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ-৫০

৬৭. পাপড়ী রহমান, মানা ও কুকুর বিষয়ক জটিলতা, হলুদ মেয়ের সীমান্ত, ফেব্রুয়ারী-২০০১, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ-৪৫-৪৬

৬৮. হুমায়ন আজাদ, দ্বিতীয় লিঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৩

৬৯. মাফরুহা চৌধুরী, নিঃশর্ত করতালি, নিঃশর্ত করতালি, জানুয়ারী-১৯৮৪, মৌসুমী পাবলিসার্স, ঢাকা, পৃ-৯৪

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহিলা ছোটগল্পকারদের গল্পে সনাতন নারীভাবনা বনাম আধুনিকতার দ্বন্দ্ব

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতকের শুরু থেকেই সারা বিশ্বে ভাঙ্গা গড়ার যে আবহ তৈরী হয় তাতে নারীদের অংশগ্রহণ মানবতাবাদের হার্দ্রিক বিকাশকেই এগিয়ে নিয়ে যায়। নারীর আত্মসত্তা উন্মোচিত হয়। অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ধর্মীয়নীতি বিজ্ঞান, কলা সর্বত্রই মানুষের জীবনদর্শন বা মূল্যবোধ নতুন প্রত্যয়ে স্বপ্নিল প্রত্যাশায় বিনির্ণীত হয়। নারীর জীবনচেতনায় আত্ম অন্বেষণ পরিলক্ষিত হয়। নারীর অন্ত র্জীবন ও বহির্জীবন চেতনায় এসেছে পরিশীলিত মননের নিগূঢ় পরিবর্তন প্রবাহ। নারী তার সনাতনী ধারার গৃহকোণ ছেড়ে পা রাখে বর্হিজীবনের সংগ্রামশীলতায়। আধুনিকতার ভাব-ভাবনা সিঞ্চিত হয়ে নারী তার আত্মমুক্তির পথ খোঁজে। নারী-ব্যক্তিত্বে শুরু হয় জীবনের আগ্নেয় উদ্ভাসন। সনাতন নারীভাবনায় চিড় ধরায় আধুনিকতার দ্বন্দ্ব। নারীরা তাদের অধিকার সম্মন্ধে সচেতন হয়। যদিও এই অধিকার পুরুষদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে নারীকে তার জীবনে অনেক মূল্য দিতে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে হাসনা বেগমের উক্তি প্রণিধানযোগ্য:

> 'তবে এই অধিকার আদায় করে নিতে এবং নিজেকে নতুন আদলে বদলে নিতে নারীকে দায়িত্ব বহণ করতে হচ্ছে বহুগুণ। এত স্বল্প সময়ে (ইতিহাসের সময়কালের প্রেক্ষিতে) সনাতনী ভূমিকাকেও দায় দায়িত্বকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া এমনকি পাশ্চাত্য নারী সমাজের পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না। স্বেচ্ছায় পুরুষের প্রায় সকল তথা কথিত দায়িত্বগুলোও বহণ করছে নারী ... যেমন, নিজস্ব জীবিকা অর্জন করে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কারণে অর্থনৈতিক দিক দিয়েও পরিবারকে সাহায্য করছে। এইভাবে নতুন প্রজন্মের নারী প্রবল চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। এতে তার দায়িত্ব দ্বিমুখী হয়ে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতার স্বাদ এই চাপের মুখেও তাকে সকল দায়িত্ব পালনে সাহসী ও যোগ্য করেছে। এই বিবর্তিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে নারী আজ আর সনাতন ভূমিকাকে মেনে নিতে পারছেনা। এই নতুন

Dhaka University Institutional Repository

নারীর জন্য নতুন সমাজও নতুন ধরনের নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরী হচ্ছেও তাই।'[১]

- এভাবেই বর্তমান যুগের সাহসী নারী তাদের যাপিত জীবনে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখে। সনাতন নিয়ম-নীতির চিরন্তনতার বন্ধন ঘুচিয়ে দিয়ে পথ চলার তৈরী করে নতুন নিয়ম।

চিরন্তন জীবন সত্যে উন্নীত হয় নারী তার নিজস্ব প্রভাব সঞ্চারী সীমারেখায়। প্রাত্যহিক জীবন-অভিজ্ঞতায় পাখা মেলে বহু বর্ণিল বলয়ে বিনির্মিত হয় নারী-মন। চৈতন্যে-অচৈতন্যে সে হয়ে ওঠে আত্মসচেতন। মহিলা রচিত ছোটগল্পগুলোতে এরই রূপ-রূপায়ণ রয়েছে বিচিত্র চিত্রল শব্দরূপে। তাদের লেখায় নারীর চিরায়ত মানসী সত্তার ঘটেছে অবমুক্তি। ছোটগাল্পিক সেলিনা হোসেন তাঁর ছোটগল্পগুলোতে উপস্থাপন করেছেন নারীর বিচিত্র সংগ্রামী জীবন। 'মতিজানের মেয়েরা' গল্পগ্রন্থের নাম গল্পে দেখা যায়-গল্পের মূল চরিত্র মতিজান ও তার শাশুড়ি গুলনূর। বিয়ের পর 'জনম সুখ-দুঃখ কিছু মিলিয়ে আপন ভুবন-সংসারের কর্তৃত্ব' বলতে যা বুঝায় তা মতিজান পায়নি। স্বামীর সংসারে দেখেছে স্বামী আবুলের উদাসীনতা আর শাশুড়ী গুলনূরের 'শক্ত ম্যায়ামানুষ' এর বিষধর রূপ। যৌতুকের জন্য ওর উপর নেমে আসে অমানুষিক যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা থেকে ওর মধ্যে জমতে থাকে নানা ক্ষোভ। সংসারের সনাতনী রূপ এটি, কিন্তু মতিজান একে শুধু নিয়তি হিসেবে মেনে নেয়নি। সে এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে আত্মসচেতনভাবেই পথ চলে-

'নিঃশব্দতার এই চরম মুহূর্তে ওর মনে হয় ওর একজন সঙ্গী দরকার, খুব কাছের কেউ, যার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারবে। এখন ওর আনন্দ চাই। এভাবে মার খাওয়া জীবন আর নয়। মাতাল, জুয়াড়ি, পরনারী আসক্ত স্বামীর জন্যে ও কোনো দায় অনুভব করেনা।'[২]

Dhaka University Institutional Repository

মতিজান তাই আর পিছু তাকায়না। শাশুড়ি গুলনূর ভাত না দিয়ে ঘাস খেতে বললে সে জোড় করে আব্বুলের জন্য রাখা ভাত ও মাছের বড় টুকরো খেয়ে ফেলে। এই জোড় করাকে ও ভাগ্য হিসেবে দেখে না, বলে-'নিজের অধিকার বুঝে নেয়া।' এভাবেই মতিজানের ভেতর স্বাধিকার চেতনা কাজ করে। জৈবিক ও মানবিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েই মতিজান তাই স্বামীর বন্ধু লোকমানকে নিজের জীবনে প্রশ্রয় দেয়। দুই কন্যা সন্তান আর লোকমান তার জীবনকে উজ্জীবিত করে রেখেছে। এটা সম্ভব হয়েছে তার ভেতর ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ ঘটার কারণেই। তাইতো বংশ রক্ষার নাম করে শ্বাশুড়ী গুলনূর হিংস্র হয়ে উঠলে মতিজান সন্তান সম্পর্কে তার মনেরভাব নির্দ্বিধায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে-

> 'গুলনূর তখনো সমানে বেঁচিয়ে যাচ্ছে, গালিগালাজের তুবড়ি ছুটছে তর মুখে। মতিজান রুখে দাঁড়ায়, মুখ খারাপ করব্যান না, কহা দিল্যাম। গুলনূর চেচিয়ে বলে, আজ থিকা হামার সংসারে তুমহার ভাত ন্যাই। হামি হামার ছাওয়ালকের আবার বিয়া করামো। হামার বংশে বাত্তি লাগবে। সবাইকে সচকিত করে দিয়ে হি হি করে হেসে উঠে মতিজান। বলে, বংশে বাত্তি? আপনার ছাওয়ালের আশায় থ্যাকলে হামি এই মাইয়া দুডাও পেত্যাম না।'[৩]

সেলিনা হোসেন এখানে পুরুষের মতই যে নারীরও জৈবিক বোধ ও অহংবোধ আছে তা তুলে ধরেছেন। এখানে মতিজানের মধ্যে ধর্মীয় বা সামাজিক কোন দ্বন্দ্ব কাজ করেনি। তার মাঝে জাগ্রত হয়েছে স্বাধিকার চেতনা। সে তাই সমাজের ভরা মজলিশে তার নিজের মেয়েদের 'জন্ম-ইতিহাস' বলতেও দ্বিধা করেনি। সেলিনা হোসেনের এ গল্পটিকে বাহ্যত শাশুড়ি-বউয়ের চিরাচরিত আখ্যান বলেই সাধারণ পাঠক ভাবতে পারেন যদিও শাশুড়ি ও পত্রবধূর দ্বন্দ্বকে ছাপিয়ে নারীর আত্ম-অন্বেষার দৃষ্টি উঠে এসেছে মতিজানের উক্তিতে। সেলিনা হোসেন এ গল্পের মধ্যে দিয়ে নরীর জৈবিক ও মানবিক অধিকার সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন করে

Dhaka University Institutional Repository

তোলেন এবং সাহিত্যে এক নতুন চিন্তার প্রতিফলন ঘটে। মতিজানকে তিনি দুর্বল নারী হিসেবে গড়ে তোলেননি বরং মানবিক অধিকার প্রত্যাশী সমাজের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়ার মতো স্বাধিকারের চেতনায় উজ্জীবিত একজন হিসেবে তুলে ধরেছেন...। মতিজানের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেলিনা হোসেন সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। সমাজের প্রত্যাশিত আর্দশিক মূল্যবোধ যে নারীর প্রতি পীড়নমূলক তা থেকে নারীকে বের হয়ে আসতে হবে আর তা ব্যক্তিসত্তার উন্মেষের মধ্য দিয়ে ঘটাতে হবে। ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ নারীর মাঝে স্বাধিকারের চেতনা জাগ্রত করে। সেলিনা হোসেন মতিজানের আখ্যানের মধ্য দিয়ে লিবারেল নারীবাদের বক্তব্যকে বিবৃত করেছেন বলা যায়। যুগ যুগ ধরে সাহিত্যে আমরা নারীকে মোহিনী, রহস্যময়ী, ত্যাগ, অমানবী হিসেবে দেখেছি। প্রেম ও মাতৃত্বের আধার হিসেবে সাহিত্যিকরা নারীকে এঁকেছেন। কিন্তু নরীর ও যে পুরষের মতো জৈবিক বোধ আছে, আবার অহং বোধও আছে তা সাহিত্যে সফলভাবে স্থান পায়নি।'[৪]

'লিপিকার বিয়ে এবং অতঃপর' গল্পেও দেখি লিপিকার মধ্যে আত্মসচেতন নারীর আধুনিক রূপ। তার মাঝে 'আমিত্ব' সত্তার জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। তাইতো তার ব্যক্তি সত্তায় আঘাত করা শব্দে সে আহত হয় এবং প্রতিবাদ জানায়-

> 'দুপুরে ফোন করে জামেরী-মিসেস মাহবুব আছে ? লিপিকা প্রথমে থমকে যায় ও এখানো মিসেস মাহবুবে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। আফসারের বন্ধুরা ভাবী ডেকেছে, কিন্তু মিসেস মাহবুব কেউ বলেনি ও বুঝতে পারলো সম্পর্কের ডাকে ওর কোনা আপত্তি নেই, আপত্তি নামে। ও মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আমি লিপিকা বলছি।
>
> - আপনি নিসেস মাহবুব নন ?
>
> - ওটা তো আমার নাম নয়। এটি তো সামাজিক সত্য। এর বাইরেও আমার ব্যক্তি পরিচয় আছে।'[৫]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ লিপিকা তার আত্মপরিচয়কে পুরুষতান্ত্রিক নিয়ম নীতির কাছে বিসর্জন দিতে পারেনি। গল্পের সমস্ত কর্মকান্ডে সে থেকেছে আত্ম-সচেতন। অবিচল থেকেছেন তার নিজস্বতায়। পুরো গল্পটিতেই সেলিনা হোসেন নারী জীবনের নানা অর্থ খুঁজে বেরিয়েছেন। 'ব্যক্তিসত্ত্বার অবমাননা পুরুষকে যেমন আহত করে নারীকেও সমানভাবে তা আহত করে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কেউ স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বশীল হতে পারে কিন্তু সমাজে নারীর ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রথা লক্ষ্য করা যায়। লিবারেল নারীবাদ এমন প্রথাকে নিগ্রহমূলক মনে করে। নারীর স্বাধিকারকে লিবারেল নারীবাদ পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তুলে ধরতে চায়। লিপিকার মাঝে আমরা এমন স্বাধীকার চেতনার বিকাশ ঘটতে দেখি।'[৬]

লেখিকার আরেকটি গল্প, 'ইচ্ছার বাগান কবিতা আমার ভালোবাসা'-এই গল্পে কবিতার মধ্যে দেখা যায় মা হওয়ার এক চিরন্তন বাসনা। খেলার পুতুলগুলোর কাছে 'মা' ডাক শোনার ব্যাকুলতা,

'আমি ওদের কতো যত্ন করি, কিন্তু ওরা তো আমায় মা বলে ডাকে না?'[৭]

গল্পের নায়ক উপল কবিতাকে শুধু ঘরের চার দেয়ালের মাঝে দেখতে চায়না। কলসী কাঁখে পুকুর ঘাটে কিংবা রান্নাঘরের হাঁড়ির মাঝে কবিতা আবদ্ধ না থেকে সে সঙ্গী হোক-

'পাখি শিকারের-হোক বিলের জলের শাপলা ফুল কিংবা নিদেন পক্ষের একটা ডাহুক'-সেই কবিতাকে একদিন স্কুল বন্ধ করে দিয়ে বিয়ে দেয় বাবা-মা। পরিবারের প্রচলিত সনাতনী নিয়ম। কিন্তু আধুনিক মন-মননের সতেচন কবিতা একটি নপুংসক স্বামীর ঘরে সারা জীবন পড়ে থাকতে পারেনি। নিজের মত করে নিজের পথ খুঁজে নিয়েছে। তাইতে তার প্রশ্ন থাকে মানুষের কাছে, মানবতার কাছে :

Dhaka University Institutional Repository

'আমার ইচ্ছার জন্ম দিতে আমি যদি পথ খুঁজে পাই, তবে কি তা গ্রহণ করা আমার অন্যায়? .... বুকের ভেতর ইচ্ছার আগুণ পুষে রেখে সারাটা জীবন কেঁদে মরতে পারবো না।'[৮]

-এখানে কবিতার মধ্যে গল্পকার একজন আধুনিক এবং আত্ম সতেচন মেয়ের জীবনদৃষ্টি গভীর জীবনবাদী চেতনা দিব্য আলোয় ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পটিতে কবিতা কেবল প্রতীকী শরীর হয়েই থাকেনি, সে উঠে এসেছে একজন রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ হিসেবে। ঘোষণা করেছে নিজ অস্তিত্বের কথা। সে নপুংসক স্বামীকে আকড়ে ধরে বুকের ভেতর যন্ত্রণার আগুণ নিয়ে সনাতনী ভাবনায় জীবনের শেষ খোঁজেনি। সৃষ্টিশীল মন ও মননের পরিচর্যার তাগিদ থেকেই লেখা প্রতিটি ছোটগল্পে রয়েছে সেলিনা হোসেনের সচেতন নারী-জীবনের ছাপ। শিক্ষিত নারীর মানস শরীর-চিরাচরিত রীতিকে বর্জন করেই সজাগ হয় জীবন সম্পর্কে। সনাতনী সংসার জীবন ধারায় কর্মজীবি নারীর কর্মক্ষেত্র সব জায়গাতেই নারীকে তার একটি নিজস্ব পরিবেশ তৈরী করে নিতে হয়।

ঝর্ণা রহমানের 'জীবনের জল ও অনল' গল্পে নায়িকা হেমা চাকরিজীবি একজন আধুনিক মানুষ। একাধারে তাকে সামলাতে হয় গৃহকোণ আবার অন্যদিকে অফিস। তাইতো তার জেগে ওঠা যুগপৎ সূর্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে-

'সে হয় দশভূজা। থরে থরে সেজে ওঠে টেবিল। ছেলেদের স্কুলব্যাগ, টিফিন বক্স, পানির বোতল, জুতা জামা সবকিছু হাতের কাছে। টিপটপ হয়ে ওয়ে ওঠে রাতের বিছানা। কাপড়ের আলনা, জুতোর র‍্যাক, রান্নাঘর, ড্রইংরুম সব। একবার মুগ্ধ চোখে দেখে মুখ-গোমড়া টিয়ার মাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে অফিসে বেরিয়ে পড়ে হেমা।'[৯]

Dhaka University Institutional Repository

চাকুরীজীবি নারী এভাবেই ঘরে বাইরে কাজ করে দশভূজা হয়ে তাদের দৌড়াতে হয় সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে। তার পরেও নারীটিকে পরিবারে কিংবা সমাজে শুনতে হয় নানা শব্দ। অফিস শেষে বাড়ি এসে আবার শুরু হয় তার এ সংসার যাত্রা। চাকুরীজীবি নারীর এ পথ চলা বর্তমান সময়ের এক সুন্দর যুগ-চিত্র। লেখিকার 'বিন্দুর বৈধব্য' গল্পেও দেখা যায় বিন্দু তার নপুংসক স্বামীর অবর্তমানে দেবর অসীমের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। এতে বিন্দু গর্ভবতী হয়ে পড়লে স্বামী অসিত তাকে নানাভাবে পীড়ন করতে শুরু করে তখন বিন্দু স্বামীর কাছে নিজের ব্যক্তিত্বকে উচ্চকিত রেখেই-

> 'বিন্দুর শীতল কণ্ঠে ধারালো ছুরি নিঃশব্দে ঝলসে ওঠে-তুমি পুরুষ নও। কিন্তু আমি তো নারী?'[১০]

বিন্দু তীব্র ভাষায় নপুংসক স্বামীর প্রতারণার উত্তর দিয়েছে। যদিও তার এ মনোভাব সনাতনী সংস্কারের কাছে পরাভূত হয়েছে করুণভাবে। কারণ স্বামী তার পৌরুষে আঘাত লাগায় সে আত্মহত্যা করে। তাই অসীতের মৃত্যুর পর বিন্দুকে সমাজই মরতে বাধ্য করেছে যে সমাজ ব্যবস্থা থেকে লেখক বেরিয়ে আসতে পারেন নি। সমাজে বিন্দুর পরিচয়টা শাশুড়ীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন লেখক এভাবে:

> 'বিন্দু'র শাশুড়ি পাগলের মতো বিন্দুর গালে মুখে চড় চাপড় মারছে, ভেজা চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকিয়ে মাথাটাকে ঘাড় থেকে খুলে নিতে চাইছে। কলঙ্কী, পোড়ামুখী, কুলখাগী জাতখোয়ানী, ধর্মনষ্টা ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ অঙ্গারের টুকরার মতো বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে।'[১১]

বিন্দুর শ্বাশুরী হয়ে ভাষায় বিন্দুকে গালাগাল করেছে তা সমাজে একজন পুরুষ কখনই নিজের জন্য আশা করেনা। ছেলে অসীত নপুংসক জানত বিন্দুর শাশুড়ী তবুও ছেলেকে বিয়ে দিয়েছে। এখানে এসছে মানবতার প্রশ্ন:

Dhaka University Institutional Repository

'একজন নারীর জীবন নষ্ট করে দিল আর এক নারী?'[১২]

তাইতো, নপুংসক ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে বিন্দুর জীবনটাকে নষ্ট করতে বাধেনি কারো। নপুংসক হওয়া সত্ত্বেও সমাজের কাছে পুরুষতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী নারী-পুরুষ মনে করে-

'পুরুষের আবার কলঙ্ক কি ? পুরুষের কি শরীর আছে যে তা নষ্ট হবে ? পুরুষ যে দেবতা। অনঙ্গ! পুরুষের কি পেট আছে যে তা লোকে দেখবে ? পুরুষের আছে পৌরুষ লোকে তো তা-ই দেখবে! পুরুষ কি নারী যে তার লজ্জা থাকবে ? পুরুষতো সম্রাট! অহংকারই তার অলংকার।'[১৩]

নারীর জীবনের অধিকার কিভাবে ভুলুণ্ঠিত হয় নারীর কাছে, পুরুষের কাছে তথা সমাজের কাছে তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর এ গল্পটিতে পাওয়া যায়। সংস্কারের কাছে পরাভূত হয়েছে। খালেদা এদিব চৌধুরী তাঁর 'ফেরা' গল্পে ময়নার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন এমনই এক বিদ্রোহী নারীরূপ। যে তার জীবন যন্ত্রণার জন্য ভাগ্যকে দোষারোপ করে নিজেকে ছেড়ে দেয়নি। গফুর তাকে বিয়ের কথা বল্লে সে কোন ভনিতা না করেই জীবনের কষ্টকর অধ্যায়কে খুব সহজ সাবলীল ভাবে তুলে ধরে বলেছে-

'বিয়াতো করছিলাম এক হারামজাদারে। পোলাপান অয়না দেইখ্যা ছাইড়া দিল হালা আমারে। আবার তুমিও তাই কও। পোলাপান আমার চাই না। সেই জেদে এই টেরেনে টেরেনে চাইলের কারবার করি। পোলাপান আমার অইব না। মাথায় ঘোমটা দিয়া বৌ অইয়া তোমার পায়ের নিচেও থাকবার পারমুনা।.... আস, ফুর্তি করি কাটাইয়া দেই।'[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

এখানে ময়না তালাক প্রাপ্ত হয়ে জীবনকে শেষ না করে দিয়ে বরং জীবনকে সে উপভোগ করতে চায়। গফুর সন্তানের জন্য ময়নার পিছনে ছুটতে গিয়ে নিজের গর্ভবতী বউকে পিটিয়ে নষ্ট করে ফেলে তার স্বরচিত সন্তানকে। অথচ গফুরের স্ত্রী সোনাভান স্বামীর হাতে এত মার খেয়েও শব্দ তোলেনি স্বামীর বিরুদ্ধে। অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিকভাবেই নারীদের ভেতর সনাতনী এবং আধুনিক চেতনার বিকাশ দেখা যায়। কখনো বিদ্রোহে কখনো জীবন জটিলতার সংকটে সরল মেরুকরণেই তা লাভ করে সমগ্রতা। দ্বান্দ্বিক ভাষ্যে, জীবন পথের বুননে। লেখকদের লেখনিতে ধরা পরে আধুনিক মনস্ক নারীরা আজ অনেক দুর এগিয়ে গেছে। তারা আজ তাদের মনের কথা প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে। হেলেনা খানের 'দুই দিগন্ত' এর নায়িকা মুনা আরো এক ধাপ এগিয়ে ভাবতে পারে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সে যেকোন কিছু মেনে নেবে। এ ক্ষেত্রে সে তার মাকেও প্রতিপক্ষ হিসেবে মনে করছে। যে মা-

> 'কোলকাতা লরেটো স্কুল ও বেথুন কলেজে পড়া, ইন্টার-প্রভিন্সে গোল্ড মেডেল পাওয়া ক্লাসিক্যাল ড্যান্সার সায়েরা চৌধুরী।'[১৫]

যদিও সংস্কারমুক্ত উদার পিতাও তার সন্তান মুনার জন্য চেয়েছিল-

> 'মুনা মা আমার দেখতে তার ষোড়শী মায়ের দ্বিতীয় সংস্করণ! সব দিক দিয়ে সে তার মায়ের মতই হয়ে উঠুক, খোদার কাছে এই আমার প্রার্থনা!'[১৬]

অর্থাৎ তার মেয়েও মায়ের মতো ঘরোয়া হোক, শুচিতা সম্পন্ন হোক। কিন্তু মেয়ে তার বন্ধুর দেয়া 'নায়িকা' হবার প্রস্তাবে এতই উল্লাসিত যে, মায়ের শুভ্রবসন পর্যন্ত সে দেখতে রাজি নয়। মায়ের সংস্কারাচ্ছন্ন মন তার পছন্দ না। তাইতো তাকে বলতে শুনি-

Dhaka University Institutional Repository

'শুভ্রবসন। এই প্রতীক মূর্তিটা এ সময়ে চোখের আড়ালে থাকাই বাঞ্ছনীয়, যে কিনা পুরস্কার প্রাপ্তির পর তার শিক্ষক নৃত্যসহচরের অত্যধিক উল্লাস ও উচ্ছ্বাসের কোন এক মুহূর্তের প্রীতি ও আবেগ জড়ানো একটি মধুর উপহার-ওষ্ঠের একটু মিষ্টি ছোঁয়ার প্রতিবাদে স্বীয় শিল্পী সত্তার টুটি চেপে ধরেছিল, তাকে ঘেন্নায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল বহু দূরে! আর যা হোক, তাঁর মতো অমন কান্ডটি কক্‌খনো করবে না মুনা। অমন নিবুর্দ্ধিতার পরিচয়ও সে দেবেনা। প্রয়োজন হলে এক ধাপ এগিয়ে যেতেও তার কোনই আপত্তি নেই।'[১৭]

আধুনিক মনের অধিকারী মুনা সনাতনী নারীভাবনার বাইরে এসে সংস্কারমুক্ত জীবন-ভাবনায় বিভোর হতে পারে। সনাতনী ভাবনাচ্ছন্ন মায়ের সাথে তাই অতি সহজেই দূরত্ব তৈরি হয় মুনার। নারীর ভেতর সনাতনী এই রূপটি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। পূর্বসূরী লেখকদের লিখনিতেও সনাতনী ও আধুনিকতার এ দ্বন্দ্ব-চিত্র দেখা যায়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সতী' গল্পে এমনই দৃশ্য ধরা পড়ে। গল্পের নায়িকা নির্মলার সন্দেহপরায়নতা তার স্বামী হরিশচন্দ্রকে কিভাবে লাঞ্ছিত করে। তার মধ্য দিয়েই এ রূপটি ফুটে উঠেছে। হরিশ চন্দ্র যা-ই করুক না কেন সব কিছুতেই সতী স্ত্রী নির্মলা সন্দেহ করে। সে মক্কেলের সাথে কথা বল্লে, কীর্তন শুনলে কিংবা ক্লাবে গেলে সর্বত্রই তাকে উপায়হীন যন্ত্রণায় পড়তে হয়েছে। এ গল্পটিতে নারীর সন্দেহপ্রবনতার ভয়াবহ রূপ অঙ্কিত হয়েছে। তাই মাঝে মাঝে স্বামী হরিশের মনে হয়-

'পতিপ্রাণা ভার্যার, দুই চক্ষু দশ চক্ষু হইয়া দশ দিক হইতে পতিকে অহরহ নিরীক্ষণ করিতেছে।'[১৮]

'দর্পচূর্ণ' শরৎচন্দ্রের একটি অপূর্ব রচনা। এখানে জীবন উপলব্ধির ভিন্নতা ও মানবতায় আশ্বাসী দার্শনিক ভাবনা উঠে এসেছে। মর্মান্তিক মানবিক মনোভঙ্গি

Dhaka University Institutional Repository

আর্তস্বরে ধ্বনিত হয়েছে। ধনীর মেয়ে ইন্দুমতী বিয়ে করে চরিত্রবান, গুণবান অতিশয় ভদ্রগোছের নরেন্দ্রনাথকে, কিন্তু দৈনন্দিন ঘরকন্না করতে গিয়ে তার অর্থ অহংকার, অর্থ ও ভোগের লিপ্সা তাকে অসম্ভব স্বার্থপর করে তোলে। স্বামীর জীবন হয়ে ওঠে বিষময়। ইন্দুর মধ্যে অনুভূতি নেই, উপলব্ধি নেই-প্রবল প্রাণহীন এক নারী মনে হয় তাকে। ইন্দুর পাশাপাশি লেখক বিমলা চরিত্র সৃষ্টি করে পরস্পর বিরুদ্ধ দুই নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। ইন্দুমতীর মধ্যে আধুনিক নারীমনস্ক অবয়বটি সংগোপনে বসিয়ে দিয়েছেন যদিও ভেতরে সেই আদিম সংস্কারমনা মনটি তার থেকেই গেছে। অন্যদিকে বিমলা একেবারেই সনাতনী গৃহিণী হয়ে হৃদয়-আলোর ঐশ্বর্য ছড়াচ্ছে। তাইতো বিমলা যখন বলে-

> 'তিনি মালিক আমি দাসী বৈ ত নয়। তিনি তাড়ালে, কে তাঁকে ঠেকাবে বল?'[১৯]

তখন ইন্দু সহজেই বলে উঠে-

> 'ঠেকাবে রাজা, ঠেকাবে আইন। নিজের মুখে নিজেকে দাসী বলে কবুল করতে কি একটু ও লজ্জা হয় না? .....আপনাকে আপনি এমন হীন, এমন তুচ্ছ করে গৌরব বোধ করচ ?'[২০]

যদিও গল্পের শেষে দেখা যায় ইন্দুর এই উদ্ধত রূপ স্বামীর অবহেলায় ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে। শরৎচন্দ্র ইন্দুর ভেতর প্রগতিশীল মনের ভাবটি জাগিয়েই আবার ফিরিয়ে এনেছেন চিরপরিচিত বাঙালী নারী-হৃদয়ের আঙ্গিনায়। দেনার দায়ে নরেন্দ্রকে জেলে যেতে হয়েছিল এবং বিমলার অলংকার বাধা দিয়ে জেলে থেকে ছাড়া পেয়েছে এ কথা শুনে ইন্দু তার গায়ের সমস্ত অলংকার খুলে বিমলার কাছে ধরিয়ে দিয়ে বল্ল,-

Dhaka University Institutional Repository

'এই নিয়ে তোমার নিজের জিনিস উদ্ধার করে এনো ঠাকুরঝি,-আমি তাঁর কাছেই চললাম তুমি বলচ স্থান হবে না-কিন্তু আমি বলচি, এইবারেই আমার তাঁর পাশে যথার্থ স্থান হবে। যা এতদিন আমাকে আলাদা করে রেখেছিল, এখন তাই তোমার কাছে ফেলে দিয়ে, আমি নিজের স্থান নিতে চললুম।'[২১]

এভাবেই গল্পের নাম সার্থক হোল অর্থাৎ নায়িকা ইন্দুর অকারণ অভিজাত্যবোধ চূর্ণ হল। ইন্দুর একান্ত বুকের গভীরে যে মর্মত্ববোধ; তাই জেগে উঠল। শরৎচন্দ্র ইন্দুর ভেতর এক শাশ্বত নারীরূপ এঁকেছেন যার মধ্যে দিয়ে আধুনিক এক নারীর বিলোপ ঘটেছে এক সনাতনী নারীর ভেতর।

নাসরীন জাহান একজন শিল্পিত সংবেদনশীল ছোটগাল্পিক। যার ছোটগল্পে রয়েছে ধ্রুপদী কথাবস্তুর নৈপুন্য। নাসরীন জাহানের 'জনক' গল্পে দেখা যায়, নায়িকা একদিন আবেগে ভেসে যায় প্রেমিক জিতুর শব্দভাষ্যে :

'শুধু আমার একটি ভ্রুণ, আমার সব গভীরতার স্বাক্ষর, সৃষ্টিকর্তা যদি চান, তবে স্থাপিত হবে তোমার ভেতর। এই ভ্রুণের এটাই যোগ্য স্থান।'[২২]

এই ঘটনার পর থেকেই নায়িকার মধ্যে সনাতনী ভাবনা আর আধুনিকতার দ্বন্দ্ব ঢুকে পড়ে তাকে করে ক্ষত-বিক্ষত। তারপর নয়মাস কাটে বিধ্বস্ত মনের যন্ত্রণাময় সময়ে সাতার কেঁটে। স্বামী রায়হানের সরলতা এখানে নায়িকাকে আরও বেশি দগ্ধ করে। সে তার প্রেমিকের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবকে ঘৃণা করে। প্রেমিক জিতু দায়িত্বহীনভাবেই কেবল অধিকার আর তার অস্তিত্ব চেয়েছে। তাইতো নীলু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পেরেছে:

'কী চমৎকার হৃদয়ের বিশালতা, বিশ্বাসের বড়ত্ব, নিজের ভ্রূণের প্রতিপালন করবে অন্য মানুষ, তবুও ভ্রূণ দেয়া চাই, পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে নিজেকে

Dhaka University Institutional Repository

বাঁচিয়ে রাখার কি লোভী, ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা! এইসব ভেবে ভেবে ন'মাসে নিজেকে আমি শূন্যে নামিয়ে এনেছি। আমার সন্তানের কোনা যথার্থ বাবা নেই, এই শূণ্যতা আমি কোথায় লুকাই ? রায়হান যত সরল, আমার কষ্টের শেকড় ততটা গভীর।'[২৩]

নারী হৃদয়ের এসব জটিল বিভ্রাট তাকে করেছে নিঃস্ব অস্থির। সন্তানকে কখনো ভেবেছে রায়হানের কখনো জিতুর একটি নারীর মধ্যে এইযে, সংস্কারের টানাপোড়ে যা তাকে করে দেয় বিপর্যস্ত। এই অগোছাল ভাবনা তাকে অস্তিত্ব অনস্তিত্বের সংকটে ফেলে দেয়। চেতনাগত অর্ন্তদ্বন্দ্ব শব্দরূপ পেয়েছে এভাবে :

'আমার সন্তানের যথার্থ পিতাটি যদি একবার আসত। দাঁড়াত আমার পায়ের কাছটিতে। তার চোখ দেখে তাকে ঘৃণা করার যন্ত্রণাটি একবার যদি ভুলে যেতাম?'[২৪]

এই সত্য অন্বেষী সংস্কার তাকে ফেলে দিয়েছে এক মহা বিপর্যয়ের ঘেরাটোপে। সেজন্যই সে অবলীলায় ভাবতে পারছে, 'এই তো শুরু হেলা একটি শিশুর পরিচয়হীন জীবনের।' কিন্তু সকালের আলোয় সে উদ্ভাসিত হয় এক মহা আবিষ্কারের জ্যোতিতে। নিজেই নিজের বিপর্যস্ত প্রত্যাশার অবসান ঘটান-

'এত অপাংক্তেয়, এত ক্ষুদ্র করেছি নিজেকে নিজে! নিশ্চয়ই পরিচয় তার আছে। কুয়াশার জট থেকে বেরোতে বেরোতে রোদের আলোয় শিশুটিকে উল্টেপাল্টে দেখি। বিচিত্র আনন্দের মধ্যে জিতু নয়, রায়হান নয়, শিশুটির একমাত্র জনক হিসেবে এক সময় আমি নিজেকে চিহ্নিত করি।'[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

আদি মানুষের জীবন সভ্যতার স্পর্শে সে আবিষ্কার করে আসল সত্য। কুসংস্কারের উর্ধ্বে উঠে নিজেকেই জনক ভাবতে অভিলষিত হয়। কেটে যায় তার মনের ক্লিষ্টতা।

লায়লা সামাদের 'অমূর্ত আকাঙ্খা' গল্প গ্রন্থের বসন্তের পাখীরা যখন গান গায়' গল্পে দেখা যায় গল্পের নায়িকা শীলা রাজীবকে ভালবাসে, বিয়ে করতে চায় কিন্তু তার মা তাতে বাধ সাধে। নারীর জীবনে চাওয়া পাওয়ার উপরে পরিবারের, সমাজের এই যে বাধা এটা নারীকে কতখানি শূণ্য করে দেয়, তুচ্ছ করে দেয় তা শীলার মায়ের স্বগতোক্তিতে ধরা দেয় এভাবে:

> 'শীলার মত বাবা মার মুখে কথা বলার স্পর্ধা ছিল না। তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। জীবনের সর্বস্ব লাভের জন্য শিলার মতই তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছিলেন আপন দাবীতে। চেয়েছিলেন পালিয়ে যেতে। কিন্তু মায়ের চোখের জল বাবার স্নেহ আর সমাজের শাসনকে পারেননি উপেক্ষা করতে।'[২৬]

মেয়ের জীবনের ভালবাসার সন্ধিক্ষণে তার ফেলে আসা পিছন মনের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয় নতুন করে। তখন তার ভেতর আলোড়ন তৈরী হয় যে কষ্ট সে করেছে তা কী তার মেয়ের জীবনেও তিনি পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন এমন প্রশ্ন তাকে আকুল করে। সে তার জীবনের সাথে মেয়ের ঘটনাকে উপলব্ধি করে। তাইতো এক আধুনিক নারী হিসেবে তার মধ্যে অভিজ্ঞতালব্ধ অতীতকে ঘিরে দ্বন্দ্ব শুরু হয় :

> 'নিজের ঘরে কেঁদে কেঁদে হৃদয়ের ভেতরটা শূন্য করে দিয়েছিলেন কিন্তু ফিরে যাননি ফরিদের কাছে। আজ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি তারই জীবনে। মেয়েকে কি বলে বাধা দিবেন ? নিজের জীবনের যে ব্যথা একটু একটু করে প্রতিদিন তাকে দহন করে সে ব্যথা মেয়েও ভোগ করুক তেমনই কি তিনি চাইবেন?'[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

এখানে দেখা যায় শীলার মা-ও যৌবনে ফরিদ নামের একটি ছেলেকে ভালবেসেছিল কিন্তু বাবা মায়ের বাধার কারণে তাকে পায়নি জীবনে। তারই কষ্ট মেয়ের জীবনেও উপস্থিত তাইতো এখন সে দু'দিক থেকে দ্বন্দ্বায়িত। প্রথমত, তার অতীত জীবনের অপ্রাপ্তির অধ্যায় অপর দিকে আজ সে একজন অভিভাবক ও বটে। সে জন্যই শীলার বর্তমানের সময়কে সে আপন হৃদয়ের কষ্ট দিয়ে উপলব্ধি করে। গল্পের নায়িকা শীলা বর্তমান যুগের পরিবর্তীত সময়ের এক আধুনিক নারী। তার মন-মনন দ্বিধাহীন থাকায় দৃঢ়ভাবে নিজেকে মায়ের কাছে উপস্থাপন করতে পারছেন। সে তাই নির্দ্বিধায় তার ভালবাসার কথা বলতে পারছে:

> 'রাজীব আর আমি পরস্পরকে ভালাবাসি মা। আমরা এখন বড় হয়েছি। আমাদের বিয়ের বয়স হয়েছে এবং বিয়ে করতে প্রস্তুত আমরা।'[২৮]

এখানে দেখা যায় শীলা সনাতন নারী ভাবনা থেকে অগ্রসর হয়ে তার ইচ্ছে অনিচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে পারছে না। নারীর এই রূপ সমাজে পুরুষের সাথে সাথে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবাক্রান্ত নারীরাও মেনে নিতে পারে না। তেমনি একটি গল্প 'ইর্ষা'। নাসরীন জাহানের এই গল্পের শুরুতেই লেখক স্ত্রী'টির ভূমিকার পাশা পাশি উদাসীন বাউল প্রকৃতির স্বামী রূপটি তুলে দরেন এরকমভাবে :

> 'হিরু যখন গর্ভ যন্ত্রণায় ছটপট করছে,
> তার স্বামী তখন বটগাছের মগডালে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে।'[২৯]

স্বামীর এই আচরণ একটি মেয়ের জন্য অনেকখানি বিষাদের। গল্পের কথক হিরুর মা জিনি সমাজে সনাতন নিয়মকে আকড়ে থাকতেই বেশি পছন্দ করেন। তাইতো মেয়ে হিরু যখন তার স্বামী চাঁদকে সংসারের দায়িত্ব নিতে শেখাতে চায় তখন হিরুর মায়ের তা পছন্দ হয়না। তার মতে,

Dhaka University Institutional Repository

'স্বামী হইল দেবতা, তার পায়ের তলে বেহেস্ত, স্বামী হইল নারীর আব্রু, হেই স্বামীরে- হিরুর মা'র চোখ খাঁখাঁ করে ওঠে, চান্দু কি মানুষ? অরে আল্লায় নিজের হাতে বানায়া পাডাইছে। তুই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলস? পুরুষ কি আমি দেহি নাই? তুই হেরে পুরুষ বানাইবার চাস? লাথি খাইতি, দিনে দশবার স্বামীর ছেপ খাইতি, আমি খাই নাই? আবাগির বেটি, চান্দুতো পুরুষই। তর মাতায় কোন শয়তানে মন্তর দিল, তুই চান্দুরে মাদির মতন দেহস? অহন হেয় গেছে! গেছে! আঙুল কাডা রক্ত দেখলে যে স্বামী চিক্কুর দিত, তার মরণ চিল্লানি অহন হের কানে যায় না?'[৩০]

সমাজে কিছু নারী আছে যারা পরগাছার মত বেঁচে থাকতে চায়, স্বামীকে দেবতা মানে। স্বামীর পায়ের নীচে বেহেস্ত জানে এবং স্বামীকেই তার আবরণ মনে করে পূজা করে সে সব নারীদের জন্যই পুরুষরা তাদের আধিপত্যবাদী থাবাকে প্রসারিত করতে পারে। যার ফলে সমাজের সমস্ত নারীরাই পুরুষদের দ্বারা নির্যাতিত হয় সহজে। তাই পরিবার থেকে, সমাজ থেকে এই সনাতনী মূল্যবোধকে নির্মূল করতে পারলেই নারী মুক্তি সম্ভব। "বৃষ্টি যখন নামল" গল্প গ্রন্থের নাম গল্পে হেলেনা এক রূঢ় স্বামীর উগ্রমূর্তি এঁকেছেন। লেখকের ভাষায় দেখা যায়,

'বিস্ময়ে, বেদনায়, স্বামীর রূঢ়তায় সঙ্কুচিত, বিবর্ণ লুৎফাকে এই মুহূর্তে দেখে কে বলবে- এই স্বনামধন্যা মহিলাই কিছুক্ষণ আগে বিরাট এক জনসমাবেশে সুন্দর ভাষণ দিয়ে এসেছেন, অসংখ্য জনতার অজস্র প্রশংসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে ঘরে ফিরেছেন।'[৩১]

এখানে মেয়েটি যতই বিদূষী বা সম্মানী হোক না কেন তাকে ঠিকই পরিবারের ভেতর স্বামীর কটু বাক্য শুনতে হয়, দেখতে হয় অভদ্রজনোচিত বিসদৃশ আচরণ। স্বামী তার নিজের বাড়ীর দাবীতে সহজেই বলে উঠতে পারে-

Dhaka University Institutional Repository

'আমার বাড়ী থাকতে হ'লে আমার অধীন হ'য়েই থাকতে হবে! নইলে যাও- যেখানে খুশি চলে যাও! এই আমার সাফ কথা- হ্যাঁ! কড়া নির্দেশ দিয়ে ভেতরে চলে গেল মজনু। বেশ কিছুক্ষণ এক দিশেহারা লক্ষ্যহীনতায় ছট্ ফট্ করল লুৎফা। ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। সেখানে সব চেতনার পৃথিবী বিলুপ্ত।'[৩২]

খুব সহজে পরিবারের কর্তা পুরুষটি নারীটিকে চলে যেতে বলতে পারে। এই চরম অপমানে লুৎফা ঠিক করে:

'... হ্যাঁ চলেই যাবে। চলে যাবে এই মুহূর্তে! প্রহৃত, প্রত্যাখাত, অপাঙক্তের হ'য়ে এখানে পড়ে থাকার কি মানে থাকতে পারে! না সে থাকবেনা কিছুতেই না ... এই ক্লেদাক্ত, গ্লানিকর, দূষিত আবহাওয়া থেকে সে মুক্ত! হ্যাঁ, বাপের বাড়িই আসল বাড়ি। নিরাপত্তার স্থায়ী আগার। কে বলে- স্বামীর ঘরে নিজের ঘর? যদি তাই হ'ত, তাহ'লে মজনু আজ অমন দ্বিধাশূন্য স্পষ্টকণ্ঠে তাকে বেরিয়ে যেতে বলতে পারত?'[৩৩]

এখানে লুৎফাকে দেখা যায় প্রতিবাদী আর আত্মপ্রত্যয়ী নারী হিসেবে। লুৎফার ভেতর সনাতনী রূপটি থাকলে সে ঠিকই এই স্বামীর পা ধরে বসে যেত। কিন্তু আধুনিক মননের অধিকারী লুৎফা স্বামীর এ আচরণে 'রক্তাক্ত মন তার প্রচণ্ড এক বিক্ষোভে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল।' সে নিজেকে অসহায় আর অবলা ভেবে বসে থাকেনি। হুমায়ুন আজাদ এই বিষয়টিকে সুন্দরভাবে তার দ্বিতীয় লিঙ্গ গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

'আজকের নারীরা ন্যায় সঙ্গতভাবে বর্জন করতে পারে নারীত্বের কিংবদন্তিটি; সুনির্দিষ্ট উপায়ে দৃঢ়ভবে তারা ঘোষণা করতে শুরু করছে তাদের স্বাধীনতা; কিন্তু পরিপূর্ণরূপে মানুষের জীবন যাপনে তারা সহজে সমর্থ হচ্ছে না। নারীদের জগতে নারীদের দ্বারা লালিত হয়ে তাদের স্বাভাবিক নিয়তি হচ্ছে বিয়ে, যা বাস্তবে আজো বোঝায় পুরুষের অধীনতা; তার কারণ পুরুষের মর্যাদা আদৌ লুপ্ত হচ্ছে না, তা

Dhaka University Institutional Repository

আজো দাঁড়িয়ে আছে দৃঢ় আর্থনীতিক ও সামাজিক ভিত্তির ওপর। তাই আমাদের নারীদের প্রথাগত নিয়তি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হবে বিশেষ যত্নের সাথে।'[৩৪]

'প্রিয় লেখিকা' গল্পে এক পাঠকের আত্মানুভূতির প্রকাশ দেখি। পাঠক তার আত্ম গাঁথা লেখিকাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে। চিঠিতে দেখা যায়, একটি নারী উপন্যাসের নায়িকার সাথে নিজের জীবন মিলিয়ে অনেক হেসেছে কেঁদেছে। তার মনে হয়েছে যেন তারই কথা লিখেছে লেখিকা। তাই লেখিকার প্রতিও তার একটা আলাদা কৌতুহল ছিল। সেই লেখিকা একদিন বিয়ের জন্য তাকে দেখতে পাত্র হিসেবে আসা ডাক্তার ভাইয়ের সাথে আসে। তখন গল্পের কথক লেখিকাকে দেখে হতাশ হয়। কারণ উপন্যাসের স্রষ্টা লেখিকা আর মানুষ লেখিকার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করে। গল্পের কথকের ভাষায়-

> 'শুনলাম পাত্র আসবেন আর তার বোনও ভগ্নিপতি, সে বোন আপনি। যার লেখা পড়ে হেসেছি, কেঁদেছি, বিস্মিত হয়েছি, তাকে আমাদের এই ঘরে দেখতে পাব, ভাবতেই ভালো লাগলো। আপনি এলেন কিন্তু, যাকে আমি দেখতে চেয়েছিলাম, সে তো নন আপনি। দিয়ে গড়া তো নন আপনি। আপনাকে দেখে আমার মনে হলো আধুনিক উপন্যাসের অত্যাধুনিক নায়িকা। যারা সবকিছু বুঝেও না বোঝার ভান করে, চোখে কৃত্রিম ঔদাসীন্য ফুটিয়ে রাখে, আর ইংরেজী কায়দায় বাংলা বলে।
>
> এলেন আমাকে দেখতে, সংগে আপনার স্বামী এবং ডাক্তার ভাই।
> আপনি যে সুদর্শন স্বামীর গরবিনী স্ত্রী, সে কথা না বলে দিলেও বোঝা যায়। পাত্র হিসেবে আপনার ভাইটি শাঁসালো, চেহারাতে তাই।
> কিন্তু আমার দৃষ্টি সেদিকে নয়। আমি দেখেছিলাম আপনাকে। কি ভয়ানক পার্থক্য আপনি আর আপনার সৃষ্টিতে।

Dhaka University Institutional Repository

আমাকে দেখলেন। চোখে আপনার পরীক্ষকের দৃষ্টির কঠোরতা। ঠোঁটের ভঙ্গিতে তাচ্ছিল্যের লেখা। স্পষ্টই বুঝলাম, এবারও ফেল করলাম পরীক্ষায়।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এবারের পরীক্ষায় পরীক্ষক আপনি। আমাদের মতন মেয়েদের বেদনায় আপনার লেখনী যে কতবার সজল হয়ে উঠেছে সে হিসেব হয়তো আপনিও দিতে পারবেন না।'[৩৫]

-অর্থাৎ পাঠক গল্পের ভেতর নিজেকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখে। নিজের জীবনের সাথে মেলাতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টা থেকেই পাঠক পাত্রির-

'মনে হয়েছে আমার কথাই মনে হয়েছে আমার কথাই লিখেছেন আপনি, আমাদের সবার মনের মুকুর আপনার চোখে এমন স্বচ্ছ হয়ে ফুটে ওঠে কি করে। কিন্তু এখন দেখছি সব ভুল, লেখিকা আপনি, আর মানুষ আপনি এক নন। আমাদের সমস্যা আপনার মনকে স্পর্শ করেনি। সমস্যাকে আপনি করুনার দৃষ্টি দিয়ে সামান্য ছুয়ে গেছেন মাত্র।'[৩৬]

তাইতো কথককে তার কল্পনার জগৎ আর বাস্তব জগৎ অনেক দ্বন্দে ফেলে দিয়েছে। এই দ্বান্দ্বিক মুহূর্তটি তার কাছে আরও স্পষ্ট হয়েছে যখন লেখিকা পাত্রি দেখে মন্তব্য করেছিল। কথকের মনো চেতনায় বিষয়টি ধরা পড়ে এভাবে:

'স্পষ্ট শুনতে পেলাম নামতে নামতে বলছেন- "উঃ কি টিপিক্যাল মাষ্টারনী মার্কা চেহারা! হরিবল!' সেই মুহুর্তে আমার মনে হলো, আপনার সমস্ত সাহিত্য আপনি লাথি মেরে ধুলোয় লুটিয়ে দিলেন।

নীরবে আমার চোখ থেকে দুফোটা পানি গড়িয়ে পড়লো। না, পরীক্ষায় হেরে গেছি বলে না, আপনার লাঞ্ছিত সাহিত্যের সমবেদনায়।'[৩৭]

কথক বা পাঠক এখানে লেখিকাকে দেখে কতখানি মর্মাহত হয়েছে তার সুন্দর প্রকাশ দেখিয়েছেন। লেখিকার লেখার ভেতর কথক সনাতনী রূপটিকে এবং

Dhaka University Institutional Repository

লেখিকার ভেতর আধুনিক রূপটি প্রত্যক্ষ করেছেন। নারী নিজেই তার অগোচরে অলক্ষ্যে পুরুষতান্ত্রিকতাকে এভাবেই আত্মগত করে নেয় যার ফলে নারী দ্বারাই নারী হয় নিগৃহীত।

বাংলাদেশ পিতৃতান্ত্রিক প্রথা সমৃদ্ধ একটি দেশ। এখানে তাই নারীদের মধ্যে সমাজ সংস্কৃতি ধর্ম সংস্কার এমনভাবে প্রোথিত যে এর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেও হাঁটতে হবে অনেক পথ। যুগ যুগ ধরে যে সনাতনী ভাব-ভাবনা নারীরা আত্মস্থ করেছে তা অনেক গভীরে শেকড়ায়িত হয়ে আছে।

'সনাতন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'চিরবর্তমান', 'শ্বাশ্বত', 'বহুকাল-প্রচলিত'-অর্থাৎ সমাজে প্রচলিত এমন প্রথা যা চিরস্থায়ী নিয়ম পদ্ধতি যা নিত্যই প্রবহমান, যুগ থেকে যুগোত্তির্ণ তাকেই সনাতন বলে আখ্যা দেয়া যায়। আর এসব সনাতনী রীতি-নীতি আচার-আচরণ নারীরা বেশ ভাল ভাবেই রপ্ত করে নেয়। নারী তার চিন্তা চেতনায়, ভাবনায় চিরন্তন এ বলয়ের মধ্যে ক্রমান্বয়ে আবর্তিত হতে থাকেন। সনাতনী চেতনায় আচ্ছন্ন নারী কেবলই পশ্চাৎ পদ থাকতে পছন্দ করে। প্রাচীনপন্থী ধ্যান ধারণায় সে হয় বিশ্বাসী। তারা মনে করে ছেলে সন্তানই বংশের প্রদীপ, মেয়ে সন্তান বোঝা স্বরূপ, ছেলেকে শিক্ষিত করতে হবে মেয়েকে ঘরের যাবতীয় কাজ শেখালেই চলবে ইত্যাদি। তারা নিশ্চিন্তে পুরুষের অধীন থাকতে পছন্দ করে। সত্যানুসন্ধান কিংবা তথ্যানুসন্ধান তাদের জীবন ধারায় থাকে অনুপস্থিত, যুগ পরম্পরায় যে সব সংস্কার সমাজে স্থির অবস্থান নিয়েছে সে সবই হয় তাদের আদর্শ। সনাতনী ভাবনা দ্বারা আক্রান্ত নারীদের সমাজের মূল আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা যায়না। সামাজিক কোন কাজে নারীর অংশ গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান আগ্রহী হন না। গতিশীলতা বা মন-মানসের চেতনাগত পরিবর্তনের বিরোধী তারা। ঐতিহ্যিক বিষয়ে আস্থা স্থাপন করে পুরুষের অধীন থাকাকে নারীর স্বভাবজাত ধর্ম মনে করেন। নারী পুরুষের মধ্যে যে বিদ্যমান

Dhaka University Institutional Repository

বৈষম্যকে তারা নারী নিয়তি বলে মেনে নেয়। পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় আবৃত হয়ে রক্ষণশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

নারী তার চিন্তা-চেতনাকে কতদূর অগ্রসর করতে পেরেছে। নিজের সম্পর্কে সে কতটুকু সচেতন। তার চাওয়া-পাওয়ার সামঞ্জস্যতা আছে কিনা তা উপলব্ধি করা। অর্থাৎ যাপিত জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে সক্রিয় এবং সংগ্রামী কিংবা। সমাজে নারী পুরুষ সমতা, নারীর প্রাপ্য অধিকার আদায়, মানুষ হিসেবে তার মানবিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার বিষয়ে একজন আধুনিক মন মনস্কের অধিকারী নারী হন সচেতন থাকেন। আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক সর্বত্র একজন নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক অংশগ্রহণের ধারাকে গতিশীল করতে প্রথমেই নারীকে তার নিজের জগৎকে জানতে হবে। জ্ঞানের অনুষ্ঠানিকে বিকলিত করতে হবে। 'আধুনিক' এর আভিধানিক ভাষাটা হল অধুনাতন, নব্য বা সাম্প্রতিক। সমাজের বর্তমানকালীন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন কোথায় কতটুকু হয়েছে তা একজন আধুনিক নারী অবশ্যই জেনে থাকেন। তার জীবনবোধ থাকে যুগোপযোগী। নারীর অবস্থা ও অবস্থান হয় উন্নত। সম্প্রতি কোথায় কি হচ্ছে একজন শিক্ষিত নারী তা সহজেই বোধগম্য করতে পারে। শিল্প সাংস্কৃতিক বোধ একজন আধুনিক নারীকে সচেতন করে, উদ্বুদ্ধ করে। সে তার প্রাতিস্বিক জীবনমান সম্পর্কে হয় সতর্ক। সামগ্রিকভাবে নারীর অবস্থানকে উন্নততর করতে নারীর ভেতর আধুনিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হবে। নারীকে শিক্ষিত হতে হবে সময়ের দাবী এসে এখন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন নারী তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক সচেতন ও সমৃদ্ধ। নারীর মধ্যে তার ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে পারে একজন আধুনিক চেতনায় ঋদ্ধ নারী। নারী নির্যাতন রোধে তাই এর কোন বিকল্প নেই। নারী সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে নারী মুক্তির কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। পরিবারের ও সমাজের সবার সহযোগিতা থাকলে একটি নারী তার সঠিক অধিকার পেতে পারে এবং সে সুখী হতে পারে মানসিকভাবে। নারী তার আত্মমর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে অর্জন করতে পারে নারীর নিজস্ব সম্মান এর মধ্যে স্বণির্ভরতা,

Dhaka University Institutional Repository

আত্মবিশ্বাস, সমকক্ষতা বেধে জাগ্রত হলে নারীর মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

তথ্যপঞ্জি

১. হাসনা বেগম, নারী ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রু-২০০২, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ-৪৭-৪৮

২. সেলিনা হোসেন, মতিজানের মেয়েরা, মতিজানের মেয়েরা, গল্প সমগ্র, বইমেলা-২০০২, সময় প্রকাশন, ঢাকা। পৃ-২৯৪-৯৫

৩. প্রাগুক্ত, পৃ-২৯৮

৪. রাশিদা আখতার খানম, নারীবাদী চিন্তা ও মতিজানের মেয়েরা, উলুখাগড়া, সম্পাদকঃ সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১২, ফেব্রুয়ারী-২০০৬, সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, ঢাকা, পৃ-১৮০-১৮২

৫. লিপিকার বিয়ে এবং অত:পর, মতিজানের মেয়েরা প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪১

৬. রাশিদা আখতার খানম, নারীবাদী চিন্তা ও মতিজানের মেয়েরা, উলুখাগড়া, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮২

৭. ইচ্ছার বাগান কবিতা আমার ভালোবাসা, মতিজানের মেয়েরা, প্রাগুক্ত, পৃ-৩২

৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫

৯. ঝর্ণা রহমান, জীবনের জল ও অনল, ঘুম-মাছ ও একটুকরো নারী, ফেব্রুয়ারী-২০০২, ঐতিহ্য প্রকাশন, ঢাকা। পৃ-৪৭

১০. বিন্দুর বৈধব্য, প্রাগুক্ত, পৃ-৭০

১১. প্রাগুক্ত, পৃ-৬৯

১২. প্রাগুক্ত, পৃ-৭১

Dhaka University Institutional Repository

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ-৬৬

১৪. খালেদা এদিব চৌধুরী, ফেরা, নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ, বইমেলা-২০০২, শোভা প্রকাশ, পৃ-৪৯

১৫. হেলেনা খান, দুই দিগন্ত, কারাগারের ভেতরে ও বাইরে, ফেব্রু-২০০০, মধুকুঞ্জ প্রকাশনী, পৃ-৩৯

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৫

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৮

১৮. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সতী, শরৎচন্দ্র রচনা সমগ্র ২য় খণ্ড, মার্চ ১৯৯৯, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা। পৃ-৩৬৯

১৯. প্রাগুক্ত, দর্পচূর্ণ, পৃ-৮৩৮

২০. প্রাগুক্ত, পৃ-৮৩৮

২১. প্রাগুক্ত, পৃ-৮৫৪

২২. নাসরীন জাহান জনক, নির্বাচিত গল্প, ফ্রেব্রু-২০০২, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ-৫৫

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ-৫৬

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ-৫৮

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ-৫৯

২৬. লায়লা সামাদ, অমূর্ত আকাঙ্খা, অমূর্ত আকাঙ্খা, ডিসেম্বর-১৯৭৮, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ-৪৯

Dhaka University Institutional Repository

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৯

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৫০

২৯. নাসরীন জাহান, ইর্ষা, নির্বাচিত গল্প, ফ্রেব্রু-২০০২, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ-৭০

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ-৭৪

৩১. হেলেনা খান, বৃষ্টি যখন নামল, বৃষ্টি যখন নামল, মে-১৯৭৮, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ-৭০

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ-৭৫

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ-৭৬

৩৪. হুমায়ুন আজাদ (অনুদিত), দ্বিতীয় লিঙ্গ, দ্বিতীয় খন্ডের ভূমিকা, ফেব্রুয়ারী-২০০২, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ-৩১

৩৫. মকবুলা মন্‌জুর, প্রিয় লেখিকা, নক্ষত্রের তলে, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৯, পল্লব পাবলিসার্স, ঢাকা, পৃ-৬০-৬১

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৫৯

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৬১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহিলা ছোটগল্পকারদের গল্পে নারীর নিজের ঘর নিজের পৃথিবী

Dhaka University Institutional Repository

নারীর যাপিত জীবনের নানা ক্যানভাসে নানা রঙ আর থাকে ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্নঘুড়ির নানা গান। নারীর সামাজিক সংসার যাত্রার পরিধির ফোকরগলে তাই কখনো কখনো ধরা দেয় 'আসিত্বের' এক চিলতে রোদ। যা নারী-জীবনের আপন সৃষ্টিশীল ছাঁয়াসঙ্গী। নিজের মাঝে লালন করা স্বপ্ন আর আশার পঙ্‌তি কখনো বিস্তারিত হয় আকাঙ্খার নতুন আলোয়। একজন নারীর অধিকার রয়েছে নিজের অস্তিত্বকে প্রকাশ করার। নারী তার কল্পনা আবেগ অনুভূতির প্রতিফলন দেখাতে পারে কাজে চিন্তায় চেতনায়। ছোটগাল্পিক দিলারা হাশেম যার ছোটগল্পে রয়েছে গভীর জীবনবোধ আর নান্দনিকতার ছোঁয়া। তাঁর 'দিন যায় রাত আসে' গল্পে দেখা যায় ঘরের চার দেয়ালের ভেতর গুমরে পড়ে থাকা হাস্না প্রতিমুহূর্তে ছটফট করে স্বামীকর্তৃক ঠান্ডা নিস্পৃহ মানসিক নির্যাতনের ফলে। তারপরও হাস্না নিজেকে বাঁচাবার পথ খোঁজে। ছোটবেলায় স্কুল কলেজে নাচত সে। কিন্তু স্বামী সামাদ পছন্দ না করায় ধূলো জমে যায় তার রেকর্ডগুলোসহ সব কিছুতে। তাইতো সে-

> 'সেই ধুলো পড়া রেকর্ড মুছে চালিয়ে দিয়ে হাস্না লুকিয়ে নাচে, একটা গোপন নেশা ধরেছে তার। পানু চলে যাবার পর যে বিবর্ণ অবসরে মৃতের মত অবশ মনে হয় নিজেকে-সেই অবসরে যেন বেঁচে আছে তার প্রমাণ দিতেই সে নাচে। নাচতে নাচতে গায়ে ঘাম ঝরে, মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। .....হাত পা ছড়িয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে ক্লান্তিতে এবং আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে। নির্ঘুম রাতের সমস্ত অভাব মিটিয়ে বোঘোরে ঘুমায়।'[১]

এভাবেই আপনমনে বেঁচে আছে হাস্না। স্বামী সামাদ কর্মব্যস্ততা কিংবা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিয়ে এতই মশগুল থাকে যে স্ত্রীর দিকটা দেখার তার সময়ই হয়না। স্ত্রীকে ঘরের আসবাবের মতই জড় পদার্থ মনে করেছে সামাদ। তখন হাস্নার প্রতিবাদী মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে:

Dhaka University Institutional Repository

'হাস্নার ইচ্ছেগুলোকে যেভাবে প্রতি মুহূর্তে জবাই করে সামাদ, প্রায়ই তার প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে তার। যা সে পাচ্ছেনা তাই ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে সামাদকেও। তাই সামাদ তাকে কোন কাজে বললেই যেন সেটা প্রতিরোধ করার একটা স্বয়ংক্রিয় স্পৃহা জাগে হাস্নার ভেতরে।'[২]

হাস্না তার ভেতরে আমিত্বের স্বপ্ন জাগায় দূর্বার এক আক্রোশে। যদিও তা প্রতিবার ধ্বসে যায় সংসারের সনাতনী সংস্কারের কাছে। জীবনবোধ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় সামনের দিকে। রঙিন স্বপ্নের নব নব দাঁড়ে উপলব্ধির শেকল ভাঙে উজানিয়া আবেগ। উত্তরাধুনিক মন ছুটে যায় জীবনের বিলাস ভূমিতে। তাইতো নারী-হৃদয়ের এক দীপ্ত প্রকাশ হাস্না। যার জীবন-শূণ্যতা, দগ্ধ সময়ের কাছে হয় উন্মোচিত আর পুরুষতান্ত্রিকতার কাছে হয় পদদলিত। নাসরিন জাহান একজন শিল্পীত সংবেদনশীল ছোটগাল্পিক। যার ছোটগল্পে রয়েছে ধ্রুপদী কথাবস্তুর নৈপুন্য। নাসরিন জাহানের 'এলেনপোর বিড়াল' গল্পে এমনই মর্মবেদনার আরেকটি শব্দ শোনা যায় মেয়েটি সংসারের চাকায় ঘুরতে ঘুরতে ক্ষয়ে যাওয়ার পরও স্বামীর নির্বিকার প্রত্যাশার কথা শোনে-

'বিয়ের পর থেকে তুমি শুধু নিজের মধ্যেই চক্কর খেয়েছ, নিজেকে নিয়েই পড়ে থেকেছ, আমাকে কিচ্ছু দাও নি।'[৩]

স্বামীর এ কথা শুনে হতবিহ্বল হয়ে থমকে যায় কিছুক্ষণ, তখন সে নিজেকে আবিষ্কার করে এভাবে,

'তাই তো, কাউকে তো সে কিচ্ছু দেয়নি, দিনের পর দিন সে নিজের হৃৎপিন্ড কেটে কেটে অন্যকে সুখী করতে চেয়েছে। সে নিজের রক্ত খুলে দেয়নি, মাংস কাটে নি- হৃৎপিন্ডের মৃত্যুতে কার এমন কী প্রাপ্তি হয় ? কার কী জাগতিক চাহিদা মেটে?'[৪]

Dhaka University Institutional Repository

নারীটির এই যে তীল তীল করে ক্ষয়ে যাওয়া তা কারো দৃষ্টিতে পড়েনা। একটি নারীর মানস-শরীর সমাজে দেখার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়না। তখন সে নিজেই আত্মসচেতন হয় এবং এরপরই সে সন্ধান পায় তার ভয়ংকর যন্ত্রণাদগ্ধ চেতনার শব্দরূপ-

> 'বরং এই করে করে সে নিজেকে ভয়ানক বিপন্ন আর শূণ্য করে ফেলতে ফেলতে অনুভব করছে, সবচাইতে বড় অপরাধ যা সে করেছে, সে নিজেকেও ঠকিয়েছে।'[৫]

এভাবেই একটি নারী সংসারকে সমাজকে দিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হলেও তাদেরই কাছ থেকে আবার হতে হয় প্রশ্নবিদ্ধ। তার অবস্থান থাকে চেতনার অন্তরালে সংসারে নারী নিজেকে শেষ করে দিলেও আধিপত্যবাদী পুরুষের মন ভরেনা। স্ত্রীকে দাবিয়ে রাখার জন্য পুরুষ কর্তৃক এটি একটি হীন প্রচেষ্টা। নারীকে অধিনস্ত করার জন্য পুরুষ কৌশলী হয় এবং তারা অকারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করে থাকে। রেডিক্যাল নারীবাদ নারীর উপর এ ধরণের নির্যাতনকে পুরুষের ক্ষমতার অপ্রতিবোধ্য অবস্থাকে দায়ী করে। দিলারা হাশেমের 'মেহেদী' গল্পেও এর প্রতিচ্ছায়া ধরা পড়ে। গরীব বাবার মেয়ে সাজু বাবার বয়সী সিরাজ মিঞার বউ হয়ে যায় একরাতেই কিছু স্নো-পাউডারের বিনিময়ে। কিন্তু পরদিনই পৃথিবীর নগ্ন লোভের কাছে বলি হয়ে যায় সে তার পিতা এবং একদিনের স্বামীর প্রতারণায়। বাবা হাফিজুদ্দিন টাকার বিনিময়ে তিন অপরিচিত যুবকের কাছে বিক্রি করে দেয় নিজের ঔরসজাত সন্তানকে। সাজু তখন শেষ মুহূর্তের শঙ্কাতুর আওয়াজ তোলে-

'ঃ বাজান, আমারে থুইয়া কই যাও বাজান' (মেহেদী, পৃ-২৪)?

রিকশায় বসা হাফিজুদ্দিন মেয়ের প্রশ্নের কোন উত্তর দেয়ার প্রয়োজন মনে করে না। শুধু নিশ্চিন্তে হাত নাড়ে সে। তখন সাজু উপলব্ধি করে এই ভয়ংকর পৃথিবীতে সে আরও ভয়ংকর একা-

Dhaka University Institutional Repository

'এখন আর কোন অবলম্বনের প্রয়োজন নেই তার। পৃথিবীর অন্তহীন পথে এই সে পা রাখল একা। সম্পূর্ণ একা অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। কতদূর সে জানে না। শুধু এটুকু জেনেছে সে একা।'[৬]

সাজু তার প্রত্যাশার পাখা মেলতে না মেলতেই ধরা পড়ে যায় এক দুঃস্বপ্নের চারদেয়ালে। জীবনের আলোড়ন-সংক্ষোভ-স্বপ্ন তাকে পোঁছে দেয় এক নিস্তরঙ্গ জীবন ধারায়। সে ভুলে যেতে চেষ্টা করে তার জীবনের সব পরিচয়কে। তাইতো সে নির্মোহ চেতনায় আবিষ্কার করে আত্মপরিচায়কে :

'সাজুর আর কোনো পরিচয় নেই। সে কন্যা নয়, ভার্যা নয় ভগ্নী নয়। ফোক্সওয়াগণের গহ্বরে ওরা সনাতন মানুষ মানুষী।'[৭]

সে হয়ে যায় এক সনাতন মানুষী। এভাবেই রচিত হয় নারীর নিজের ঘর নিজের পৃথিবী। হেলেনা খানের 'আমি কাঁদতে চেয়েছিলাম' গল্পে রুনু নিজের সাজান সংসারে স্বামী সন্তান নিয়ে ভালই ছিল কিন্তু লম্পট স্বামীর লাম্পট্য সীমা ছাড়িয়ে যায়। রুনুর ভাষায়-

'দু'দিনের জন্য স্বামী বাইরে গেলেন। ফিরলেন আমাদের বড় মেয়ে মনিরই বয়সী এক মেয়েকে সাথে করে। পুত্র সন্তান লাভের অজুহাতে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন। সেদিন আমার আত্মা রক্তাক্ত হয়েছিল। মর্মে মর্মে আমি লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত হয়েছিলাম। ....নতুন বৌকে ঘরে তোলবার ভার পড়ল আমারই ওপর। কান্না বুকে চেপে চোখে মুখে হাসি ফুটিয়ে আমি বৌকে ঘরে তুলেছিলাম।'[৮]

Dhaka University Institutional Repository

একজন নারীর জীবন তার সংসারে, তার পরিবারে যদি এরকম দৃশ্যের হয় তবে সে নারীটির বাঁচার পথ কোথায়। আমাদের সমাজে পুরুষদের স্বেচ্ছাচারিতার এ চিত্র নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার এরপর ঘরে তার দিন কাটে আরও নির্যাতনের ভেতর দিয়ে। গৃহটি স্বামীর তাই অনায়াসে চলতে থকে নির্যাতন। এখানে উঠে এসেছে সমাজের এক দল পুরুষের হীন পৌরুষত্ব। যারা স্ত্রীর উপর একচেটিয়া অধিকার বোধ থেকে এবং আধিপত্যবাদ মনোভাবের কারণে নারীর উপর নির্যাতন করতে দ্বিধা বোধ করেনা। রুনু তার স্বামীর আচার-ব্যবহারের স্বরূপ একেছেন এভাবে :

> 'গোলমাল হতে থাকে অকথ্য ও অস্রাব্য যার পরিসমাপ্তি ঘটে দৈহিক আঘাত ও প্রহারে।'[৯]

তাইতো সম্মান নিয়ে টিকে থাকার জন্য ঘর ছাড়া হয় রুনু। তারপর আত্ম প্রতিষ্ঠিতা লাভ করে একটি স্কুলের শিক্ষিকা হয়ে। এভাবেই রক্ষা হয় নারীর সম্মান বোধ কিংবা আত্ম পরিচয়। জীবনের বহতা নদীটি কখন গড়িয়ে যায়- কেবলই গড়িয়ে যায়। একটি নারীর বয়স বাড়ার সাথে সাথে মুখ থুবরে পড়ে যায়। সময়ের বালুচরে। সমাজ তাকে একাকিত্বের গবরে ফেলে দেয়। হতাশা তখন শ্রী হীন হয়ে ধরা পরে। এমন-ই একটি গল্প 'ভালবেসেছিলাম'। রাবেয়া খাতুনের এ গল্পটিতে দেখা যায়-কথক গল্পের প্রধান চরিত্র চুমকিকে ভালবেসেছিল। শুধু কথক একা নয়, আরো অনেকে। ভরা যৌবনবতী চুমকির বিহ্বল সময়কে এভাবে এঁকেছেন তিনি:

> 'সবদিক থেকে সবচেয়ে ব্রাইট মেয়ে ছিল ও প্রয়োসর থেকে ফাষ্টবয় সবাই ওর প্রতি ছিল ঔৎসুক। বলতে গেলে ওকে একটু দেখার জন্য আমাদের ক্যাম্পাস থেকে আর্কিটেকচার ভবনে আসতাম। পাত্তা কখনও পেতাম না।'[১০]

Dhaka University Institutional Repository

সেই চুমকি বয়সের খেলায় নিঃসঙ্গতার কারণে অনেক রাত জেগে একা একা কাঁদে। তখন সে অসহায়ভাবেই হারানো প্রেমের মধ্যে আশার আলো খোঁজে। কথককে তাই সহজেই বলে-

'তুই একদিন তোর ঘরে যাবার কথা বলেছিলি। খুব বেশি দিনের কথা নয়। তোর মনে আছে?' (ভালোবেসেছিলাম,পৃ-৪১)

যে নারীর অহংবোধ ছিল দীপ্র আলোর মত, সে আজ নিঃস্ব হয়ে যায় জীবনের কাছে, সমাজের কাছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এভাবেই একজন নারীকে অসহায় করে রাখে।

কথক পেয়ার তখন সময়ের কাছে বাধা পরে ভাবত থাকে অন্য কথা :

'চুমকীর চোখ আমার চোখে তলিয়ে যেতে চাচ্ছে। দৃষ্টি না নামিয়ে আমার উপায় নেই। আমার কোনও আপত্তিই ছিলো না। ও আমার প্রথম ভালোবাসা, কিন্তু সময়ের বিচ্ছিন্নতায় জীবনে এসেছে আর একজন। ....কুমকুমের তো কোনও দোষ নেই। মন যেমনই করুক চুমকীকে ফিরিয়ে দিতে হবে।'[১১]

লেখক এখানে সময়ের বিচ্ছিন্নতায় চুমকীর অসহায়ত্বকে তুলে ধরেছেন। চুমকীর জীবনের অহং বোধকে লেখক প্রচ্ছন্নভাবে পুরুষতন্ত্রের কাছে ভুলুণ্ঠিত করেছেন। জীবন কত বিচিত্র আর কত ভিন্ন মাত্রিক হতে পারে তার বাস্তব চিত্র এ গল্পটি। নারীর জীবনে হতাশাকে জড়িয়ে দেয় পুরুষতান্ত্রিক এ সমাজ ব্যবস্থা।

'ভালবাসার সেই মেয়েটি' গ্রন্থে রাজিয়া মজিদ তার 'পাপী গল্পে দেখিয়েছেন একটি নারীর টিকে থাকার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা। রাইয়ান যে নিজেকে এবং মাকে বাঁচাতে সমাজের দৃষ্টিতে 'চোর' হয়ে দু'বারে তার দুটো হাত কাটা যায়। হাত

Dhaka University Institutional Repository

কাটায় তার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু চুরির জন্য তার কোনই আফসোস নেই। তাই বিদ্রোহী এ নারী কেবল শেষে দুঃখ করে বলে-

> 'যে সমাজে আমি জন্মেছি। সেই সমাজ আমাকে মুক্তি না দিলে আমার মুক্তি নেই। আমি পাপ করতে চাই না। তবু আমি পাপী হই, শুধু আমার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যই'[১২]

-এখানে দেখা যায় সমাজ ব্যবস্থাই নারীটিকে পাপের পথে টেনে এনেছে। সে এর থেকে মুক্তি চায় আর মুক্তি তার তখনই হতে পারে যখন সমাজ থেকে দূর হবে সব অসাম্য দুর্নীতি। যখন সমাজ, রাষ্ট্র তার পেটের ক্ষধা নিবারণের পথ প্রশস্ত করবে, দায়িত্ব নেবে। এখানে কথক রাইয়ানের ভেতর দিয়ে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে এনেছেন। রাইয়ানেরও একই উক্তি যে, চুরি করেছে পেটের দায়ে। সুতরাং সে নিজে পাপ করেনি সমাজ করিয়েছে। সমাজ তার ও তার মায়ের ভরণ পোষণ না দেয়ায় সে এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। 'অন্ধকারে চন্দ্রের দহন' গল্পে পাপড়ি রহমান অপত্য মাতৃস্নেহের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রামের হাসুর মায়ের এক অদ্ভুদ বাচ্চা জন্ম নেয়। যার দুই চোখের পরিবর্তে কপালের মাঝখানে একটি পল্লবহীন চোখ আর ঠোটহীন একটি গর্ত সদৃশ মুখ দেখে সবাই বলত রাক্ষস হয়েছে। লেখকের ভাষায় সেই কথিত রাক্ষসকে এক মা কিভাবে দেখত তার নমুনা পাই:

> 'লোকজন তাকে একনজর দেখে ভয়ে প্রায় পালিয়ে যেত। কিন্তু হাসুর মা অপত্য স্নেহে তাকে ঠিক আগলে রেখে ছিল।'[১৩]

এখানে নারীর বহুমাত্রিক দিকের একটি হল মাতৃত্বের ধারা সেটি সুন্দরভাবে এঁকেছেন একজন মায়ের কাছে রাক্ষস নয় একটি সন্তান হিসেবেই প্রতিপালিত হয়েছে কত অনায়সে।

Dhaka University Institutional Repository

মকবুলা মনজুরের 'শকুনেরা সব খানে' গল্পে দেখি রাজনীতিবিদরা তাদের স্বার্থের জন্য গ্রাম থেকে গরীব মানুষদের নিয়ে আসে লোভ দেখিয়ে। এমনি এক লোভে পরে অর্থাৎ বিরিয়ানীর লোভে স্বামীর হাত ধরে শহরে আসে আমিনুদ্দির স্ত্রী কিন্তু সেখানে বোমা বিস্ফোরণে লন্ডভন্ড হয়ে যায় আমিনুদ্দিদের সব স্বপ্ন। সব হারিয়ে আমিনুদ্দির স্ত্রী-

> 'শুধু বাড়ি যেতে চায়। বাড়িতে ওর দুধের বাচ্চা, বুড়ি শ্বাশুড়ী। সেখানে ওর ঘর আছে। ভাঙা হলেও ঘর। এই খোলা পথে ও আর কতক্ষণ দাড়িয়ে থাকবে ?'[১৪]

-সমাজের সর্বত্র শকুনের বাস। লেখক এখানে দেখিয়েছেন এই অসহায় নারীটিকে কিভাবে সমাজের পুরুষ নামের জানোয়ার গুলোর থাবার শিকার হতে হয়। এমন সময়ে নারীর শরীর ছিড়ে খায় এক ট্রাক ড্রাইভার আর তার হেলপার। পড়ে থাকে শূণ্যে এক নারীর আর্তচীৎকার। সমাজ ব্যবস্থায় নারীর এ পর্যুদস্ত ও ভারাক্রান্ত জীবন লেখক অনুসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বৃহত্তর পরিসরে নারীর প্রতি এই নির্যাতন নারীর অগ্রযাত্রাকে করে দেয় স্থবির। লেখক এখানে এই অমানবিক পুরুষদের 'শকুন' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এভাবেই পুরুষ কর্তৃক ভুলুন্ঠিত হয় নারীর সম্ভ্রবোধ। খালেদা এদিব চৌধুরীর 'চেনা ঘর, অচেনা মানুষ' গল্পে দেখা যায় মন্তাজ আলীর আর লতিফার সংসার সুখেরই ছিল কিন্তু দুঃখ ছিল কোন সন্তান না হওয়ার। তখন লতিফা প্রায়ই স্বামীকে আরেকটা বিয়ে করার জন্য বলত কিন্তু স্বামী যে তাকে অবহেলা করে তা করবে সে-সব লতিফার ভাবনায় আসেনি। এখানে লতিফার উদারতা আর মন্তাজ আলী অনুদার মনের তীব্র প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাইতো মন্তাজ আলীর পরিবর্তনে 'লতিফা অবাক হতো-প্রায় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সের মন্তাজ আলী হঠাৎ এমন সৌখিন হলো কেন। বুকটা ধক করে উঠত।' একদিন সত্যি সত্যি দুলালী নামের একটি মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনে মন্তাজ আলী। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় লতিফার উপর

Dhaka University Institutional Repository

তার অত্যাচারের কাহিনী। তবুও যে সন্তানের আশায় মন্তাজ আলী বিয়ে করে তা তার পূর্ণ হয়না কারণ-

> 'পয়তাল্লিশ বছর বয়সের মন্তাজ আলী বুঝতে পারে.....এতদিন পরেও যখন দুলালীর গর্ভ ওর কোন সন্তান এল না, তখন সমস্ত দোষই ওর নিজের এবং একথা মনে হতেই ও ভীষণভাবে শিউরে উঠে। ও নিজেই তাহলে দোষী? পৌরুষত্বের অপমানে ও জ্বলতে থাকে।'[১৫]

লেখক এখানে পুরুষের দোষ সন্তান না হওয়ায় তার পৌরুষত্বে যে আঘাত লেগেছে তার চিত্র এঁকেছেন এবং এ জন্য একটি মেয়ের জীবন যে কিরকম দূর্বিষহ হতে পারে তা তিনি অনুপুঙ্খ সূক্ষ্মতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাইতো যে সন্তাানের আশায় মন্তাজআলী লতিফাকে দুঃখ দিয়েছে সেই সন্তানের জন্যই একদিন অসুস্থ মন্তাজআলীকে দুঃখে ভাসিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী দুলালী অন্যের হাত ধরে চলে যায়। লেখক খালেদা এদিব চৌধুরী তাঁর লেখনিতে গ্রাম গঞ্জ শহরের প্রেক্ষাপটে সমাজ বাস্তবতার চিত্র খুব আটপৌড়ভাবে তুলে এনেছেন। সেলিনা হোসেনের 'বৈধব্য' গল্পে দেখি উনিশ বছরের মেয়ে আছিয়া ওর চেয়ে দ্বিগুণ বয়সী বউমরা আবদেলকে সনাতনী এক ভাবনা থেকে বিয়ে করে। তার মতে, 'বয়স দিয়ে কি হয়? বয়সের হেরফেরে কি এসে যায় ? মানুষের হৃদয়ই সব' এই ভাবনার পিছনে আছিয়ার মধ্যে যে বিষয়টি কাজ করে তা হলো সে পালাতে চেয়েছিল বাবার সংসার থেকে। এই চিন্তা চেতনা নিয়ে-

> 'ওর শুধু মনে হয়েছে আবদেলের সঙ্গে বিয়ে হলে ওর জীবন স্বচ্ছন্দেই কেটে যাবে। তাছাড়া বিয়ে নিয়ে এতো ভাবাভাবির কি আছে। বরং চোখের সামনে থেকে সরে গেলে বাবা-মার মন কষাকষি থেমে যাবে। মার ওপর প্রচন্ড অভিমান ওকে অবুঝ করে তোলে।'[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

-একটি গ্রাম্য সরল মেয়ের প্রতিচ্ছবি আছিয়ার ভেতর পরিলক্ষিত হয়। যার মধ্যে আছে জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানোর এক তীব্র আকাঙ্খা। যার জন্য সে বাচার পথ খোঁজে আবদেলের ঘরনী হয়ে। এই অসম বিয়ের মধ্যে জীবনের স্বস্তি খোঁজা ছিল ওর জীবনের বড় পরাজয়। যা সে আগে বোঝেনি। লেখক এই বিষয়টিকে প্রকাশ করলেন এরকমভাবে-

> 'বছর গড়তেই আছিয়া বোঝে ওর দিনগুলো সব শেয়ালের গর্তে চলে গেছে। আবদেলের সাহচর্যে ওর জন্য কোনো উত্তাপ নেই। যে আবেগ নিয়ে মানুষটি ওরসঙ্গে বাঁশবনে কথা বলতো, যে ব্যাকুলতা নিয়ে মানুষটি জলপাই গাছে নিচে এসে দাঁড়াতো, যে তীব্রতায় ওর হাত ছোঁয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠতো, সেই ব্যাকুলতা এখন শুধু আছিয়ার বুকে। আবদেল এর থেকে অনেক দূরে। সকালে বেরিয়ে গেলে সারাদিন খোঁজ থাকেনা, যখন ফিরে তখন থাকে ক্লান্ত। আছিয়ার সেবা করতে হয়, যত্ন নিতে হয়। এতে মন ভরে না, পিপাসা মেটে না। এক অস্থির তাড়না আছিয়াকে মরমে মারে।'[১৭]

বিয়ের কিছুদিন পরেই আছিয়া যে যন্ত্রণা উপলব্ধি করে, যে 'প্রচণ্ড এক শূন্যতা কুরে খায় ওকে' সেই নিরব কষ্টই অধিকাংশ নারীর জীবনে বয়ে যায়। পুরুষ বিয়ের পর একটি মেয়ের শরীরের উপর অধিকার পেয়ে মনে করে সব পেয়ে গেছি। নারীর যে একটি মন আছে সে ব্যাপারে তার কোনো উৎসাহ থাকেনা। এটিই নারীর জন্য এক বিরাট অপমান। এটাই আছিয়ার উপলব্ধিতে সুন্দরভাবে ধরা পড়ে-

> 'আবদেল ওকে যত্ন করে। হাট থেকে ভালো মাছ তরকারী কিনে আনে। তেল, সাবান, ডুরে শাড়ি এনে দেয়। আছিয়ার ভালো লাগে না। ও আবদেলের কাছে আরো আবেগ চায়। সে আবেগ ওর নতুন যৌবনের জন্যে প্রয়োজন।'[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

আছিয়ার নব যৌবন যে আবেগ কামনা করে আবদেল তা উপেক্ষা করে চলে। যে কারণে 'বিয়ের বছর দেড়েকের মাথায়' আবদেল মরে গেলে 'এই বৈধব্যের জন্যে আছিয়ার কোন দুঃখ নেই।' তাইতো নির্ভার হয়েই আছিয়া বলতে পারে-

'তুমি কষ্ট পেয়োনা বাবা। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। আমার কোনো দুঃখ নেই।

-তুই কি এমন চেয়েছিলি ? আছিয়া নুরু মুন্সীর চোখে চোখ রাখে।

- হ্যাঁ বাবা।'[১৯]

আছিয়ার মতো নারীরা আসলে এভাবেই প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধ করে চলে পরিবারের সাথে নিজের সাথে, সংসারে সমাজে। এমনকি সমঝোতা চলে নিজের মন ও মননের সাথেও। এই সমঝোতা করতে করতে এক সময় নারী জীবন-যাপন হয়ে পরে ক্লান্ত। জীবনের স্বস্তি খোঁজে কোন জ্যোতির্ময়ী শূন্যতায়।

সেলিনা হোসেনের আরেকটি গল্প 'মুখ'। সেখানেও আছে নারীর স্বপ্ন-ভঙ্গের তীর্যক যন্ত্রণা। বাবা-মাহীন মেয়ে নুহারিন। বাড়তি মানুষ হিসেবে ভাইয়ের ঘরে গলগ্রহ হয়ে থাকা জীবনের স্বপ্ন ও নিজেই নিজের মধ্যে তৈরি করে। তাতে থাকে ওর আপন মুগ্ধতা। একই বয়সী টগবগে মেয়ে আলিমনের মধ্যে ও কল্পনার আবাস গড়ে কিন্তু আলিমন অতি সাধারণ যার মধ্যে তারুন্য নেই গভীরতা নেই-এই বোধ নুহারিনকে কষ্ট দেয়। কষ্টগুলো দীর্ঘতর ছাঁয়া ফেলে যখন শুনে প্রেমের কথা জানাজানি হওয়ায় ওর পড়া বন্ধ হয়ে যায়। নুহারিন যখন বলে: 'কেমুন দুখের কথা। পড়াটা শেষ করতে পারলি না' তখন আলিমন যা বলে তা নুহারিনের পছন্দ হয়নি, আলিমন সনাতনী এক সাধারণ নারীর মতো করে বলে ওঠে:

Dhaka University Institutional Repository

'ধুর, মাইয়া মানষের পইড়া কি আইবো? ক্যাবলা তো তো হাঁড়ি ঠেলা..... নুহারিন অনুভব করে আলিমনের মুখে সেই মুগ্ধতা নেই ওর মুখটা এখন অন্যরকম বয়সী নারীর মতো। তবে কি ওর স্বপ্নের দিন ফুরিয়ে গেছে?'[২০]

স্বপ্ন বিলাসী নুহারিন কষ্টের সিড়ি ভাঙ্গে এভাবে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে বাস্তবতার কঠিন আঘাতে। অবশেষে নুহারিন নিজের ভেতরে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। নিজের মধ্যে একান্ত নিজস্বতায় চলে এসে সে আবিষ্কার করে,

'আলিমনের মনের চকচকে শরীর আছে, ওর আছে হৃদয় সে হৃদয় ফুটে আছে, কিন্তু দেখার কেউ নেই।'[২১]

আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কিছু খণ্ড চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে সমাজে নারীর অবস্থা, নারীর ভাবনা, নারীর ভেতর জমে যাওয়া সমাজ সংস্কার অদ্ভুদ বিষন্নতায় উঠে এসেছে। সেলিনা হোসেনের 'মেয়ে লোকটা' গল্পে পরিবার সমাজ-রাষ্ট্র একাকার হয়ে ধরা পড়ে। পরিবারে তারাবানু হয় অচ্ছুত স্বামী কিংবা সন্তান সবার কাছেই। একদিন তাই সারারাত উপোস থাকার পর ঘর থেকে বের হয়ে ভাবে:

'ঘর? ও পেছনে ফেলে আসা রাস্তার দিকে তাকায়। ওর তো কোনা ঘর নেই। যে স্বামী জুলুম করে সেটা কি স্বামীর ঘর? নাকি নিজের ঘর হতে পারে ? যে ছেলে বের করে দিতে চায় সেটাই বা কেমন ঘর?

তাইতো স্বামী ওসমান কবে মরেছে ওর মনে নেই-মনে করতেও চায় না-বরং যেদিন মরেছে সেদিন ওর মনে হয়েছে জ্বালা জুড়োলো।'[২২]

এভাবেই জীবনের হিসেব কষতে কষতে তারাবানুও একদিন এক অচেনা গায়ে গিয়ে বেওয়ারি লাশ হয়ে যায়। তার মৃত্যুর পর সমাজের রূপটি লেখক তুলে

Dhaka University Institutional Repository

ধরেছেন। সমাজ একটি নারীকে জীবিত কিংবা মৃত কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করতে চয়না। কারণ সমাজে নারীটি যে ক্ষমতাধর নয় তাইতো তারাবানুর মৃত্যুর পর সমাজের দৃশ্যটি লেখক তুলে ধরেন এভাবে যে, তার লাশ দেখতে আসা গ্রামের মানুষদের মনোভাব হল এই-

> 'ও আমাদের এলাকার কেউ নয়। ওকে অনেকেই দূর থেকে হেঁটে আসতে দেখেছে। পাগল-টাগল হবে হয়তো। মেয়েলোক তো আর ভবঘুরে হতে পারেনা। ওরা তো ঘরেই থাকবে।' কিংবা, 'নারী-পুরুষ, ছেলে বুড়ো অনেকে। সবার মুখে স্বস্তি। ও কারো আত্মীয় নয়, দূর সম্পর্কের কেউ না, গাঁ সুবাদেও পরিচিত নয়। বিপদ থেকে বেচেঁ যাওয়ার আনন্দ নিয়ে লোকজন কথা বলে।'[২৩]

লেখক এখানে দেখিয়েছেন যে, সমাজ কিভাবে একটি নারীর ক্ষেত্রে দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। মেয়েলোকদের জন্য ঘরে থাকাই যেন নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। লাশের কথা শুনে থানার দারোগা পর্যন্ত মহাবিরক্ত। এরপর চেয়াম্যানতো দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলেই বসে-

> 'মেয়েলোকটা মরার আর জায়গা পেলো না! কেন যে এদের ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হয়। .....আর তখন মর্গে মেয়েলোকটা ফুলতে থাকেও আর তারাবানু নয়। মানুষ নয়। মেয়েলোক। ওর মৃতদেহ পচন ধরেছে। এখন ডোমই ওর ভরসা।'[২৪]

নারীর জীবনে ঘর কোথায়! যে জীবনে কিংবা মৃত্যুতে কোথাও নিজস্ব একটা ঘর পেলনা। পিতৃতান্ত্রিক আর পুরুষতান্ত্রিকতা এক হয়ে সমাজে নারীদেরকে করে রাখে ঘর ছাড়া। পুরুষের জন্য ঘর তার জন্মগত অধিকারে পাওয়া আর নারীর জন্য ঘর-হয় বাপের, নয়তো স্বামীর কিংবা ছেলের। তাইতো পুরুষ ক্ষমতা দিয়ে নারীকে নির্যাতন করতে এতটুকু দ্বিধা করেনা। সমাজে বা রাষ্ট্রে এভাবেই তারাবানুরা মানুষ

Dhaka University Institutional Repository

না হয়ে মেয়েলোক হয়ে যায়। ক্রমশ যন্ত্রণাবিদ্ধ হতে থাকে এসব মেয়েলোকেরা। জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হতে হতে কেউ হারিয়ে যায়, আবার কেউবা হয় প্রতিবাদী, নারীর এই পথচলা তাই থেমে থাকে না। যুগ পরম্পরায় নারীদের এ যাপিত জীবন চলতে থাকে ঘর এং বাইরের সামাজিকী আবহে। লাশ হওয়ার পরও সময়ের সংকটে 'ও আর তারাবানু নয়। মানুষ নয়। মেয়েলোক।' 'মেয়েলোকটা' গল্পটি এক দরিদ্রপীড়িত, নিঃসঙ্গ, আপনজন পরিত্যক্ত অসহায় নারীর কিন্তু এই সবকিছু ছাপিয়ে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী ধরণা গল্পে স্থান পেয়েছে লেখকের ছোটো ছোটো কিন্তু তীক্ষ্ম মন্তব্যগুলোতে। দরিদ্র সমাজে নারী ও পুরুষ সকলেই দুঃখ-কষ্টে পীড়িত থাকে কিন্তু তার মাঝেও নারী পীড়িত হয় কেবল দারিদ্র্যের কারণে নয় নারী হওয়ার কারণেও।'[২৫]

লায়লা সামাদের 'অমূর্ত আকাঙা' গ্রন্থের 'আলোকিত অন্বেষণ' গল্পে ঘর-সংসারের ভালবাসা-বাসির মধ্যেও বলতে শুনি,

'ঘর-সংসারের কাজ করতে সেলিনার মোটেও খারাপ লাগেনা। তবুও মাঝে মাঝে কেমন জানি একঘেঁয়ে মনে হয় সব কিছু। সময় বেধে কাজ আর নিয়ম করে চলা এই পরিচিত জীবন থেকে হাপিয়ে উঠে। বিরক্তিতে বিদ্রোহ করে মন।'[২৬]

এখানে নারীর আত্ম চেতনার উন্মেষ লক্ষ করা যায়। নারী তার জন্য নিজস্ব কিছু খুঁজে বেড়ায়। মনের গভীরে হাতরে কি যেন খুঁজতে চায়। সেলিনার এই যে আকুতি এটা অনবদ্য। তাই সে জীবনের অতীত-বর্তমান হাতরে ফেরে এবং অদ্ভুদ সব প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ায় সে:

> 'কি আশ্চর্য ! এই কি জীবনে চেয়েছিল সে ? স্বামী, পুত্র, সংসার এ নিয়ে এক অতি সাধারণ জীবনের ছবিই কি এঁকেছিল মনে ? মনের গভীরে হাতরে কি যেন খুঁজতে চায় সেলিনা।'[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

এখাবেই ঘরে নারী আটকে পরে এক নিয়ম বাধা পরিসরে এবং বিসর্জন দিতে হয় তার নিজস্ব সব স্বপ্নগুলোর। এরই হতাস আর্থি সেলিনার কণ্ঠে উঠে এসেছে এভাবে-

'স্বামী সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে নিজের আশা-আকাঙ্খাকে ও বিসর্জন দিয়েছে।'[২৮]

পুরুষতান্ত্রিক ছকে নারী নিজেকে বৃত্তায়িত করে। ঠিক পুরুষ নারীকে যেভাবে চায় সেভাবে, সে ছকেই। নারী তার নিজের জীবন পরিচালিত করে পুরুষের চাওয়ার ইঙ্গিতে, এবং আবর্তিত হয় পুরুষতান্ত্রিক ধ্যানজ্ঞানে। এটা নারী করে সমাজে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে গিয়েই। সেলিনা হোসেন তাঁর 'আকালির স্টেশন জীবন' গল্পে কিন্তু তিনি পুরুষতান্ত্রিকতার এ ছকটিকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। এখানে দেখা যায় সুযোগ সন্ধানী পুরুষ কর্তৃক ঠকলেও আকালির মধ্যে তৈরী হয় একটি নিজস্ব চেতনাপ্রসূত ভাবনার। যে ভাবনায় সে মালিকের ছেলের দোষ দেখেনি সে ভেবেছে-

'যে সুখটুকু ও নিজে ভোগ করেছে, তার জন্য কাউকে দায়ী করতে ওর ঘেন্না লাগছিল।'[২৯]

আকালির জীবনদর্শন দিয়ে পুরুষতন্ত্রকেও প্রবলভাবে ঝাকানি দিয়েছে। তাই তো সে আশ্রয় দাতা নিশি ওর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে- 'নিজের সর্বনাশ নিজে বুঝস নাই'? তখন আকালী নির্দ্বিধায় বলে ওঠে:

'ক্যান সর্বনাশ, সর্বনাশ করেন? আমার কুনু সর্বনাশ অয় নাই'

নিশি দাঁত কিড়মিড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, ব্যাডাডা কেডা?

-জাইনা কি অইবো ?

Dhaka University Institutional Repository

আমি গিয়া জিগামু, বিচার চামু।

বিচার ? আকালির মাথা ঘুরে ওঠে। অন্যায় কোথায় যে বিচার ? কেউ তো কোনো অপরাধ করেনি, তবে বিচার কিসের? সঙ্গে সঙ্গে সেই সুখের মুহূর্তগুলো মনে পগলে ওর শরীর ঝিম মেরে যায়, যেন এই মুহূর্তে সুখটা ওর ভেতর চারিয়ে যাচ্ছে-ও একটা গভীর আনন্দে প্রবেশ করছে, পৃথিবীর সব অন্ধকার মুছে যাচ্ছে ওর চোখের সামনে থেকে।

চিৎকার করে ওঠে নিশি, কবি না ব্যাডাডা কেডা ?

আকালি প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়ে বলেছিলো, না।

-তোর সন্তানের বাপ লাগবো না ?

-না'[৩০]

নিশি যতই ওকে বুঝায় দোষটি ছেলেটির ও ততই 'বড়োশক্ত মেয়ে' হয়ে বলতে থাকে-

'ভোগ তো আমিও করছি। আমার তো ভালই লাগছিলো। তয় হের একলা দোষ অইবো ক্যান?'[৩১]

সেলিনা হোসেন এখানে নারীর আত্মমুক্তির একটি নতুন মাত্রা তুলে ধরেছেন। নারীর মধ্যেও তার নিজস্বতার বোধটিকে তিনি জাগ্রত করতে চেয়েছেন। সমাজ জীবনে নারীরও যে নিজস্ব একটা জগৎ আছে, আছে তার প্রকাশ লেখক এ গল্পে তারই চিত্র তুলে এনেছেন। 'আকালির স্টেশনের জীবন' গল্পটিতে সেলিনা হোসেন নারী মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রয়াস পেয়েছেন। গল্পটি আকালি মেয়েটির ক্ষত-বিক্ষত জীবনকে ঘিরে। মাতৃহীন, দরিদ্র, অশিক্ষিত নারী মানুষের সমাজে বেঁচে থাকতে পারল না। পুরুষের কাছে নারী অসহায় হয়ে পড়ে শারীরিক দিক থেকে। জৈবিক দিক থেকে লাঞ্ছিত নারী সমাজের কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি পায় না। কিন্তু লজ্জা, অপমান, গ্লানি সর্বোপরি আত্মমর্যাদাবোধ থেকে নারী যে আত্মহননকে বেছে নেয় তা সাহিত্যিকরা কখনো গণ্য করেনি। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ যেহেতু

Dhaka University Institutional Repository

নারীত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সেহেতু নারীর দৈহিক গুণাবলিকেও মর্যাদা দিয়ে বিবেচনা করে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ মনে করে যে পিতৃতন্ত্র গড়ে উঠেছে নারী-পুরুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের কারণে। এমন পার্থক্যকে পুঁজি করে নারীকে দৈহিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়, অসম্মান করা হয়। নারীর মাঝে এই লাঞ্ছনা ও অসম্মানবোধ ক্ষোভের সঞ্চার করে, কখনো প্রতিশেধ স্পৃহা জেগে ওঠে, কখনে গ্লানির ভারে তা ক্ষয়ে যায়। নারীর মানবিক গুণগুলোকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ স্বীকার করে না, স্বীকার করলেও তা স্তরায়নের মাপকাঠিতে মর্যাদা পায় না। কেন ও কীভাবে তেরো বছরের একটি মেয়ে অভিশপ্ত জীবনে জড়িয়ে পড়ল তা 'আকালির স্টেশনের জীবন' গল্পে বর্ণিত হয়েছে। এ গল্পে সেলিনা হোসেন ইঙ্গিত করেছেন কীভাবে অধস্তন লিঙ্গীয় মর্যাদা নারীকে ক্ষমতাহীন করে রাখে; কীভাবে নারীর সকল কর্ম তৎপরতা, আশা-আকাঙ্খার পরিধি তাতে নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। সমাজে নারী যে শোষণের শিকার এ কথাটাই নারীবাদ বলতে চায়। নারীর শোষণের ভিত্তি কী? এ প্রসঙ্গে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ মনে করে নারীর দৈহিক পার্থক্যকে ভিত্তি করেই নারী-পুরুষ দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে এবং দৈহিক পার্থক্যকে কেন্দ্র করে নারীকে সমাজ নানাদিক থেকে বঞ্চিত করেছে।'[৩২]

ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থের 'মুখ ফেরানো দিন' গল্পে দেখা যায় নায়িকা ঝুমুর আমেরিকার প্রবাসী। স্বামীর সাথে সেখানে থাকে একদিন স্বামী বিভাসের সাথে ইউসুফ সাহেবের মেয়ের জন্মদিনের পার্টিতে সে ঘুমিয়ে পরলে স্বামী বিভাস তাকে বলে উঠে 'মা বাবা একে বারে মোমের পুতুল বানিয়ে রেখেছে' তখন ঝুমুরের রাগ লেগেছিল। সে তখন ভাবছিল-

> 'স্বামী মানেই কি শাসক? যখন তখন ধমকে দিবে, যখন তখন শাসন করবে- শুধু ভালবাসতেই ভুলে যাবে।'[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

নারীর এই উপলব্ধির মধ্যে ধরা পড়ে পুরুষদের আধিপত্যবাদের চিত্র। অন্যদিকে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে বিয়ের আগে শেখা গানের একটু ঝালাই করে নেয়ার ওস্তাদের কাছে গেলে সেখানে ও ঘঠে তার স্বপ্নভঙ্গ। লেখকের ভাষায় :

> 'ওস্তাদজি বার বার গায়ে হাত দেয় ঝুমুর তা সরিয়ে দেয়। এতে বিরক্তিতে মুষরে পড়ে ঝুমুর।'[৩৪]

নারীর প্রতি পুরুষদের এই বিচিত্র নির্যাতন নারীকে সমাজে স্থিতি হতে দেয়না। নারীর প্রতি সমাজ এবং পুরুষের এই ব্যবহার লেখিকা তীব্র ভাষায় তুলে এনেছেন। লায়লা সামাদের অমুর্ত আকাঙ্খা গল্পগ্রন্থের নাম গল্পে পিতৃতান্ত্রিক মূল মন্ত্রের দিক্ষীত 'জোবেদা বেগমের বাসায় পিতৃ-মাতৃহীন সুরমার ঠাঁই হয়। জোবেদা বেগমের ছেলে সেলিমের সাথে ছিল তার ছোট বেলার বন্ধুত' ছোট বেলার সেলিমের সাথে ছায়ার মত লেগে থাকা সুরমা এবং সেলিমের সে ঘনিষ্ঠতাকে অবশ্যই পছন্দ করেন নি তিনি। সময় থাকতে সাবধান হতেই সে ছেলেকে পাঠায় জেলা শহরে পড়াশুনা করতে। আর এই সুযোগে ছেলেকে না জানিয়ে সুরমাকে সপে দিলেন শহর আলীর হাতে-

> 'তখন অসহায় সুরমা কোন প্রতিবাদ করেন নি ফেলে নি এক ফোটা চোখের জল। জীবনের সবকিছুকে সে নির্বিকার সহিষ্ণুতায় যেমন করে স্বীকার করে নিয়েছে, তেমন ভাবেই শহর আলীকে ও গ্রহণ করেছে সে।'[৩৫]

এভাবেই নারী তৈরী করে নিজের জন্য নিজস্ব একটা জগৎ। সুরমার মনে হয় দু'টো জগৎ আছে পাশাপাশি। 'একটাতে সে থাকে অন্যটা সে অনুভব করে। অনুভূতির জগতে যখন নিজেকে ভাসিয়ে দেয় তখন কি অপার আনন্দ তার। পরক্ষণই আবার যখন বাস্তবের মুখোমুখি প্রত্যক্ষ সত্যকে দেখতে হয় তাকে দু'নয়ন মেলে, তখন সব আনন্দ চুপসে গিয়ে সংকুচিত হয়ে যায় মন'। নারীর অতৃপ্তি,

Dhaka University Institutional Repository

বেদনা সমাজ কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া। সমাজ যে নারীকে, নারীর মনের চাওয়াকে তার প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করে সে সমাজেরই প্রতিনিধি এই জোবেদা বেগম। যার কারণে সুরমা এবং সেলিমের দুঃখবোধ নিবারন সম্ভব হয়নি। তাইতো সেলিমের নতুন বউয়ের বেনারসি শারীর ভেতর পদ্মকলি মুখ দেখে সুরমার নিজের কথা মনে হয়:

> 'এমন সোহাগ রাত, বধূয়া সুরমাও কামনা করেছিল। কামনা করেছিল একটি মানুষকে। যে তার সর্বস্ব দিয়ে গ্রহণ করবে তাকে। জীবনে মরণে তারা হবে সাথী। যাকে চায়নি, যার কথা কল্পনাও করেনি ক্ষণিকের জন্য সেই এসেছিল সুরমার জীবনে, কিন্তু সে এমনভাবে এসেছিল যেন জীবনের পরম আনন্দের লগ্নকে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিতেই। এখন সব শেষ, ধুয়ে মুছে মিশে গেছে। সেই পরম লগ্ন আর ফিরে আসবে না। শুধু বধূ হবার এক গোপন বাসনা তীব্রতর হয়ে মনকে আচ্ছন্ন করে থাকে। কি অসম্ভবের স্বপ্ন কি অবাস্তরের তৃষ্ণা বক্ষ জুড়ে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে ওঠে।'[৩৬]

নারীর এই দীর্ঘশ্বাস সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতাপের কাছে পরাজিত হয়। মুছে যায়না এ দীর্ঘশ্বাস। কেবলই এক নারী থেকে অন্য নারীতে সংক্রমিত হয় যুগ পরম্পরায়। নারী তার জীবনের এই উপলব্ধিক ক্ষতে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে কেবল। 'ঘর' গল্পে সেলিনা হোসেন দেখিয়েছেন একটি ঘরকে কেন্দ্র করে একটি পুরুষ কতখানি স্বার্থান্ধ হয়ে পুরুষতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে ঘরে বসবাসরত স্ত্রীটিকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করতে পারে। স্বামীর ক্রমাগত অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে স্ত্রী তাহমিনা অন্যত্র চলে যায় তখন স্বামী মুশফিক তার উপলব্ধিজাত অনুভূতি তাহমিনাকে ফোন করে জানায়। এখানে পাওয়া যায় ঘরের উপর অধিকার বোধ সম্পন্ন স্বামীর আত্ম-উন্মোচন তাহমিনা-মুশফিকের দাম্পত্য জীবনের ভেতর দিয়ে লেখক ঘরকে একটি প্রভূত্বমূলক স্থানের অবয়ব দান করেন এভাবে:

Dhaka University Institutional Repository

'তাহমিনা ফোন রেখে দেয়। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবে, ঘর এবং নারী পেলেই পুরুষের প্রভূত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কখনো কখনো নারীরও। তাহলে ঘর কি একটি ভীষণ জটিল জায়গা! হবে হয়তো।'[৩৭]

এখানে তাহমিনার মধ্যে ঘর নিয়ে তার মানসিক দ্বন্দ্ব সবশেষে প্রশ্নবোধক ভাবনা হয়ে ধরা দেয়। 'হবে হয়তো'-এমন হেয়ালী গোছের শব্দ বের হয় কিন্তু নারীর ভেতর দৃঢ় নারী সত্তার প্রকাশ দেখা যায় না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অনেক সময় নারীর নিজস্ব উপলব্ধিকেও রুদ্ধ করে দেয়। নাসরীন জাহানের 'আমাকে আসলে কেমন দেখায়' গল্পেও দেখা যায় নিরন্তর দ্বান্দ্বিক ক্ষত-বিক্ষত নিরিক্ষাধর্মী ব্যক্তি মানসের জীবন বীক্ষণ। নায়িকা গল্পের কথক নিজেই যার ভেতরে ছিলো অনেক স্বপ্নের জাল বোনা আর আত্ম-বিশ্লেষণ। লেখক গল্পের বিষয়টিকে মনো চৈতন্যকেন্দ্রিক অন্তর্বাস্তবতার মাধ্যমে উম্মোচন করেছেন। গল্পে দেখা যায় কথক বলছে যে, অসংখ্য স্বপ্নভঙ্গ তার জীবনকে অসম্পূর্ণ করে রেখেছে। এই 'স্বপ্নভঙ্গ তাকে বেপরোয়া করতে চেয়েছে কিন্তু তিনি নিজেই উপলব্ধি করেন এমন লজ্জা সঙ্কোচহীন সে নয়। লেখক কথকের অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন এভাবে :

'পুরো রাতের নিদ্রার মধ্যে ঢুকেছিল বিষ। কী অসহ্য রাত, কুয়াশা পতনের শব্দটি পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিলাম। এরপর গা ঝেড়ে দাঁড়িয়েছিলাম, প্যান্টশার্ট পরে গটগট হাঁটব। গলির মুখে দাঁড়িয়ে সবার মুখে সিগ্রেটের ধোঁয়া ছুড়ে মারব।

কিন্তু এ আমার প্রকৃতি নয়। জন্মাবধি একটা মিনমিনে ভাব আমার মাথা নিচের দিকে নামিয়ে রাখে। চিন্তার মধ্যে আমি যত বেশি মারকুটে, প্রকাশ্যে ততটাই শিথিল। এ জন্যই দুই সত্তার যুদ্ধ মাঝে মধ্যে প্রাণান্তকর হয়ে ওঠে।'[৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

কথকের ভেতর আর বাহিরের এ দ্বন্দ্ব সমাজ সৃষ্ট। সমাজ তাকে নারী হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা না দেয়ায় তার মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। নারীর এই নিজস্ব জগৎকে নিষ্কন্টক করতে বৈষম্যহীন সমাজের পরিচর্যা করা দরকার। 'অরণ্য কুসুম' গল্পে সেলিনা হোসেন দেখিয়েছেন, বস্তি জীবন, বস্তিবাসীদের শঠতা, ভিক্ষাবৃত্তি ও শহরের কর্মচঞ্চল ব্যস্ত জীবনের পাশাপাশি বিরাজমান দরিদ্র সমাজের চিত্র। ভোগবাদী সমাজে নারীর মর্যাদা, তার আচরণগত স্বরূপ কত নিচে চলে যায় তা এখানে লেখক তুলে এনেছেন। গল্পে শহরের ভদ্র সমাজের অন্তরালে নারীদের অসহায় অবস্থার চিত্র সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। গল্পে দেখা যায় চেয়ারম্যানের ছেলে বজলু কর্তৃক প্রথম ধর্ষিতা হয়ে কেসে জড়িয়ে পড়ে সর্বস্ব হারায় তার পিতা। তখন পুষ্পলতা ঢাকা চলে আসে, তারপর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে তার জীবনে দিনের পর দিন। এতে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়লে আশ্রয়দাতা ছবির মা বলে ওঠে:

> 'বাপের তো হদিস নাই পালবি কেমনে ? তার উত্তরে মেয়েটি বলে, রাস্তার পোলাপান আবার পালা লাগে নাকি অরাতো এ্যামনে এ্যামনে বড় অয়.... ভাবে ওর নিজেরতো বাপ আছে। দিন মুজুর বাপ। সেইবা ওর জীবনের কি এমন বড় কাজে এসেছে!'[৩৯]

বস্তির নারীর জীবনের এই অঙ্গতিটি সমাজ কর্তৃক নারী নিগৃহীত হওয়ার এক করুন চিত্র। নারী এভাবে তার নিজস্ব মনুষ্যত্ববোধকে অর্থাৎ তার নিজস্বতাকে নষ্ট করে ফেলেছে। তাইতো ওর জীবনের কোন সুন্দর কালীক অধ্যায় নেই। সমাজ, পুরুষ মিলে এভাবেই নারীকে ঘর ছাড়া করে, করে জীবন ছাড়া।

মকবুলা মনজুর তাঁর "তৃষ্ণার্ত ধরিত্রী" গল্পে পুরুষের লালসার শিকার ময়নার যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনকে তুলে ধরেছেন। ময়নার মা অসুস্থ হলে ম্যাসের কাজে ময়নাকে

Dhaka University Institutional Repository

পাঠায়। তখন ম্যাসের সদস্য শঠ, প্রবঞ্চক আসাদ সাব ময়নার সর্বনাশ করে পালিয়ে যায়। তারপর থেকেই ময়নার শুরু হয় কঠিন জীবন। লেখকের ভাষায়:

'রাত্রি বোধ হয় শেষ হয়ে এলো। সারারাতে দু'চোখের পাতা এক হয়নি ময়নার। এমনি নির্ঘুম রাত ওর নিত্যসংগী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘুম ওর সেই রাত্রি গুলোতেও আসতো না। যখন আসাদ এসেছিল ওর জীবনে সহস্র প্রলোভনের হাতছানি নিয়ে। নিয়ে এসেছিল সুখের প্রলোভন, ভদ্র জীবনের প্রলোভন আর ভালোবাসার আশ্বাস। আলোকে অন্ধ পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল ময়না। ওর চোখে তখন সুখী ভদ্র জীবনের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন বস্তির কদর্য জীবনের গ্লানি থেকে হাত ধরে এক অপার্থিব সুখের আশ্বাসে ওকে উন্মাদ করে দিয়েছিল। তবু ভয় যেতো না ময়নার, তবু ভরসা পেতোনা ওর আঠারো বছরের ভয়াতুর হৃদয়।'[৪০]

এভাবেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ কর্তৃক নারী প্রতারিত ও নির্যাতিত হয়। পাপড়ি রহমানের 'মধ্যরাতের ট্রেন' গল্পে দেখা যায়, মুক্তি-যুদ্ধের সময় আহত কাজল তার 'অপ্রত্যাশিত পঙ্গুত্ব' নিয়ে অথর্ব জীবন যাপন করছে যা তার নিঃসঙ্গতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তার নিঃশব্দ জীবনে পুরানো চাকর করিমচাচা তাকে আগলে রাখে। তখন কাজল তার অতীত জীবনের চিত্র তুলে আনে এভাবে: 'কাজলদের সংসারে ঘাত-প্রতিঘাত তো কম হয়নি। কিন্তু করমালি চাচা একটুও বদলালো না। বাবা আরেকটা বিয়ে করে শহরেই থেকে গেলেন। মা কাজল আর সজলকে নিয়ে ঝাউতলিতে। বাবা কালেভদ্রে খবর নিতেন। বাবা শহরে বিয়ে করার পর মা কখনো কাঁদেনি। কাঁদলেও হয়তো আড়ালে কেঁদেছে। কাজল বিকেলে ফুটবল খেলে এসে দেখতো মায়ের চোখমুখ ফুলোফুলো। চোখের পাপড়িতে জলের কণা। মাকে তখন বর্ষাভেজা দোলনচাঁপার মতো দেখাতো। অসম্ভব সতেজ অথচ স্পর্শকাতর। মায়ের অমন চেহারা দেখেও কাজল কিছুই জিজ্ঞেস করার সাহস পেতো ন। করমালি চাচা নিঃশব্দে ঘরে ঘরে আলো জ্বেলে দিতো।'[৪১]

Dhaka University Institutional Repository

এখানে দেখা যায় স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের পর একটি নারীর জীবন কি অসহ্য যন্ত্রণায় ভরে যায়। একটা গোপন কষ্টের ধারা তাকে ভেঙ্গে-চুরে দেয়। অথচ সমাজের পুরুষেরা থাকে নির্বিকার আর নিষ্ঠুর অবয়বে। মাফরুহা চৌধুরীর 'কোথাও ঝড়' গল্পে দেখা যায় এরকমেরই দুটো পরিবারের শান্ত-অশান্ত রূপ। গল্পের নায়ক শফিকের ভাষায় সুন্দরভাবে বিষয়টি উঠে এসেছে:

> 'দুটো বাচ্চা ফেলে ডাক্তারের স্ত্রী একদিন চলে গেল। মা লজ্জায়, ঘৃণায়, মমতায় কেদে ফেললো। ডাক্তারের চোখ দুটি নেচে উঠলো। কিন্তু সে যা ভাবে তাই কি জগৎ! তা যদি হতো তবে তো তার সব কুল রক্ষা হতো! শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করেছিল। সব সাজিয়েছিল। লোহার দরজা বসিয়েছিল সদরে! সবাই বলতো ডাক্তারের বাড়ি একটি দুর্গ। সোণার খাঁচা বানিয়েছিল সবার জন্য! ডাক্তার বুঝেনি যে, মনবেড়ি পায়ে থাকলে কিছুরই দরকার হয় না আর। বাবা আর মা। এর দুজনে মিলে সংসার করেছে। ছেলেমেয়ে মানুষ করেছে'[৪২]

শফিকের পিতা অসুস্থ হলে তার মা কেঁদে চোঁখ ভাসায়। অন্যদিকে ডাক্তারের বউ স্বামীর ঘর ছেড়েই চলে যায়। গল্পের শেষে দেখি ডাক্তারটি আত্মহত্যা করে জীবনের সব জ্বালা থেকে মুক্ত হয়। গল্পটিতে দেখা যায় নারী বা পুরুষ যদি পৃথিবীকে ভালবাসতে হয়। ভালবাসা শান্তি দেয়। 'দুঃসময়ের অ্যালবাম' গল্পেও পূরবী বসু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কার কিছু পরিবার, কিছু পরিবেশের চিত্র তুলে ধরেছেন। যুদ্ধের সময় কত মা-বোন বিধবা হয়েছে, সন্তানহার হয়েছে। হয়েছে শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার। যুদ্ধকালীন সময়ে প্রতিটি মেয়ের জীবনই ছিল নিরাপত্তাহীন। বাবা-ভাইকে বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী ধরতে এসেছে ঘরের মেয়েটিকে বলাৎকার করে চলে যায়। যুদ্ধের ইতিহাসে তাই মেয়েদের এই ত্যাগের চিত্রটিই বেশি মর্মান্তিক। গল্পের কথক কামালের ভাষায় দেখা যায়- 'যাবার মুহূর্তে শেফালীদি পাশের গ্রামের সালেহার কথা তুলল। ওর বাবা আর ভাউকে খুন করতে এসে দুর্বৃত্তরা উপর্যুপরি মেয়েটির ওপরই বলাৎকার করেছে। বাড়ির কাউকে আর

Dhaka University Institutional Repository

মারেনি। সেই থেকে সালেহা নাকি আর কথা বলছে না। শেফালীদি হঠাৎ বলে ওঠে, জানিস কামাল, ওরা যদি বাবাকে না মেরে আমাকে মেরে ফেলতো বা আমার ওপর অত্যাচার করত তাহলেও অনেক ভাল হতো। পুরো সংসারটা এমন ছারখার হয়ে যেত না।'[৪৩]

'অবিচ্ছেদ্য' গল্পে মকবুলা মনজুর এক অসহায় মায়ের আর্তি তুলে ধরেছেন। কাজের মহিলা কলিমন যার কিডনী দিয়ে বেগম সাহেবাকে বেঁচে উঠতে সাহায্য করেছে সেই কলিমনের নিজের মেয়ে রাবুর যখন কিডনী দরকার হল তখন সে তা দিতে পারলনা। সেই মুহূর্তে- 'কলিমনের সমস্ত শরীর যেন কন্নায় টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। রাবুকে সে একদিন নিজের শরীর থেকে নাড়ী ছিঁড়ে বের করে এনেছিলো, কিন্তু তার সেই নারী ছেঁড়া ধনকে বাঁচাবার জন্য শরীরের অংশ দিতে পারবে না? ... কলিমন ডাক্তারদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাবুর দিকে তাকালো। ওর চোখ দু'টো এখন শুকনো খটখটে। ও রাবুর শয্যায় শারমিনকে দেখতে চাইলো, যে শারমিন এখন পাহাড়ী হাওয়ায় স্বাস্থ্য ফেরাতে গেছে।'[৪৪]

কলিমন আশ্চর্য হয়ে নিজের দিকে ফিরে তাকায়। তার শরীরের অংশ দিয়ে বেগম সাহেবা শারমিনকে বাঁচাতে পারলেও নিজের মেয়েকে বাঁচাতে পারেনি। কলিমনের এই নিঃশব্দ যন্ত্রণা নারী হৃদয়ে ক্ষত-বিক্ষত অনুভূতিতে সমুদ্রের ঢেউ হয়ে আঁছড়ে পড়ে। মাফরুহা চৌধুরীর 'আকাশে উদ্যান' গল্পে দেখা যায় পূর্ব পুরুষদের খান্দানে বিভোর মানুষের দুর্দশার চিত্র। রাজমিস্ত্রি সুলতান আলী পিতার পথ ধরে একই কাজে হাত পাকিয়েছে। সে চায় তার ছেলেও পড়াশুনা বাদ দিয়ে একাজে নেমে পড়ুক। সে গর্বভরে বলে উঠে- 'আমি ল্যাখাপড়া না জানলে কি অইবো আমাগো বাপ-দাদার নাম আছে। এক ডাকে আমাগো চেনে সবাই।'- এই অংহকারই সে তার ছেলেকে রাজমিস্ত্রির কাজে নিয়ে যেতে চায়। তখন তার স্ত্রী এর প্রতিবাদ করে বলেছিল-

Dhaka University Institutional Repository

'রাজের কাম কইরা কত ওস্তাগরে বাড়ীতে দালান তুললো। আর আপনের যে ব্যাড়ার ঘর সেই ব্যাড়ারই রইলো! পোলাডা পড়া ল্যাখা করবার লাগছে- তারেও ওইকামে ঢুকাইয়া ডুবাইবেন! আর দ্যাখেন গিয়া- বলতেই ধমক দেয় সুলতান- আরে চুপ থাহো!'[৪৫]

এভাবেই একজন রাজমিস্ত্রিও তার স্ত্রীর কথায় খেঁকিয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ পরিবারে যেন শুধু পুরুষটির কথাই প্রাধান্য পাবে নারীর যেন কিছুই বলার থাকেনা। বলতে গেলেই থামিয়ে দেয়। পুরুষতান্ত্রিকতা এভাবেই ঘরে ঘরে নারীকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে। 'ঝিনুকের মালা' গল্পে মাফরুহা চৌধুরী দেখিয়েছেন টোকাইদের জীবনের কিছু খণ্ড চিত্র। গল্পের নায়িকা সাদিকা ঢাকা থেকে সাগরে বেড়াতে যায় তখন স্থানীয় এক টোকাইর সাথে তার পরিচয় হয়। পরিচয়ের পর সাদিকার সাথে তার একটা হৃদ্ধতা গড়ে ওঠে। তখন তার সামনে ফলবানুর অনেক কিছুই ওঠে আসে। ফুলবানুর মা তাকে ভালোবাসে না একথা শুনে সাদিকা- 'ফলবানুর সংগের একটি মেয়েকে সাদিকা একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল- ওর মাকে বলো, ওকে যেন আদর করে! বলো, এক বেগম সাহেব বলেছে, এক মেমসাব-ওকে আদর করে যেন।'[৪৬] বালির উপরের একটি ফুল গাছের লতা উঠিয়ে আনায় সাদিকার স্বামী রহমান জিজ্ঞেস করে এটা কি হবে? ঢাকা নিয়ে টবে লাগাবে শুনে সে বলেছিল- 'এখানে বালির ওপরে আপনা থেকে হয়েছে। যত্ন করলে হবে কে বলেছে!'[৪৭] এখানে ফুলবানুর সাথে বালির উপরে প্রাকৃতিক নিয়মে গজিয়ে উঠা লতানো ঘাসের সাথে অনেকটা মিল পাওয়া যায়। যেন দুজনই প্রাকৃতিক দুটো দৃশ্য।

'আমার মেয়ের মুখ' গল্পে হেলেনা খান কন্যা দায়গ্রস্ত এক সহজ সরল ভালোমানুষ পিতার অর্ন্তদ্বন্দ্বের চিত্র এঁকেছেন। গল্পের কথক একদিন বন্ধু রহমানের সুন্দরী মেয়ে মালিহার জন্য প্রস্তাব নিয়ে যায়। তখন মালিহার পরিবর্তে নিজের মেয়ের কথাই বলে বসে। এরপর থেকেই শুরু হয় তার অর্ন্তদ্বন্দ্ব। তার ভাষায়:

Dhaka University Institutional Repository

'বঙ্গ রহমানের সুন্দরী মেয়ে মালিহার নামটা কি ক'রে আমার মেয়ের নিজের মেয়ের নাম মারেফায় রূপান্তরিত হয়েছিল, সে কথা এখন আমি স্বজ্ঞানে ঠিক ভেবে উঠতে পারছিনা। রহমানের অনুরোধে তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবের বার্তাবহ হয়েই আমীন সাহেবের বাসায় আমার যাওয়া।'[৪৮]

আমীন সাহেবের উপযুক্ত ছেলে মোস্তফার জন্য বঙ্গ রহমানের মেয়ের বদলে কথকের নিজের মেয়ের নাম উত্থাপন করে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হতে থাকেন। তার বারবার মনে হয় : 'পিতৃত্বের কোমল অনুভূতিটুকু জীইয়ে রাখার জন্য বিষাক্ত ছোবলে নীল করে তুলেছিলাম আমার আত্মা, আমার মন, আমার সমগ্র অস্তিত্ব।'[৪৯]

মারেফার মুখটাই বার বার ভেসে উঠেছিল তার চোখের সামনে। কালো রঙ, চওড়া কপাল, টানা টানা চোখ ... ছোট চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। তাই সে মুহূর্তেই নিজের মেয়ের নাম বলেছিলেন। অবশ্য অর্ন্তদ্বন্দ্বে আহত পিতা নিজেই অনুভব করেছে সব কিছু বাদ দিলেও, মারেফাকে অনূঢ়া ও অলক্ষুণে নামের অপবাদ থেকে রেহাই দিতে পেরেছি, এটা একটি মস্ত বড় সান্তনা।'[৫০]

যদিও বিয়ের কিছুদিন পরই পিতা দেখতে পায় মারেফার মুখ বিমর্ষ ও বিব্রত। মোস্তাফার মুখের পেশীতে রূঢ়, কাঠিন্য ভাব। তখন নিজেই উপলব্ধি করে যে 'ঝলমলে চাদের আলো ঠিকরে পড়ছে আমার মেয়ের বিবর্ণ মুখে। চাঁদের আলোর প্রতিফলন যেন দুঃসহজনক এক উপহাস!' এখানে কথক মেয়ের জন্য সুখের ঠিকানা তৈরী করতে চেয়েছিল। যদিও তা সফল হয়নি তবুও তৈরী হয়েছে তার একটি নিজস্ব ঘর-মন-পৃথিবী। যার আলোক বিন্দু পিতার চোখেও ঠিকরে পড়েছিল। 'রঙধনু আঁকা ছবি' গল্পে হেলেনা খান দেখিয়েছেন একটা মেয়ের নিজস্ব বলয়িত জীবন। গল্পের নায়িকা পান্না যে নিজেই নিজের সৃষ্ট বলয়ের ঘুরে ফিরে অনেক মিথ্যের জাল বুনে, আপন মনের রং ছড়ায়। বান্ধবীরা কেউ বোঝে কেউ বোঝেনা। কেউ প্রতিবাদ করে কেউ করে না। এমনি চলছিল মেধাবী ছাত্রী, স্ট্যান্ড করা স্কলারশিপ পাওয় মেয়ে পান্নার। সে তার বড়লোক বান্ধবীদের কাছে এক

Dhaka University Institutional Repository

সামান্য মহুরীর মেয়ে হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করতো। এ অবস্থায় নিজেকে খুবই ছোট ভাবতে শেখে পান্না। একদিন মেধাবী ডিবেট প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হওয়ায় বান্ধবী বিথীর ভাই মিহির তাকে ভালোবেসে একটি চিঠি দেয়। তাতে পান্নার কাছে নিজের দৈন্যতা আরো তীব্র হয়ে ধরা পরে। তখন সে উপলব্ধি করেঃ

> 'ভেতর ভেতরে ক্ষয়ে গেছে পান্না। বড্ড ক্লান্ত। প্রচণ্ড এক জোয়ার এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে- ওলট পালট করে দিয়েছে সব। ভাঙ্গা স্বরে বলে সে, তোর দাদা তো আমাকে চেনেন না, চিনলে, জানলে ঘেন্নায় তক্ষুনি তিনি মুখ ফিরিয়ে নেবেন। ... বড়ই করুণ শোনায় পান্নার স্বর, ... হ্যাঁ, তাই, তিনি আমাকে ঘেন্না করুণ। তার ঘেন্নাই আমার পাওনা এর বেশি কিছু নয়- কিছু না।'[৫১]

একটি মেয়ের সামাজিকভাবে অসহায়বোধ করলে সে নিজেকে কতটা গুটিয়ে নেয় এবং অকারণে একটা পর একটা মিথ্যের বেড়াজালে জড়িয়ে ফেলে নিজেকে তার সুন্দর চিত্র এখানে লেখক তুলে ধরেছেন।

'ঘর' শব্দটি দিয়ে সুন্দর এবং নিরাপত্তাময় এক আশ্রয়স্থলকে বোঝা যায়। একটি মেয়ের জীবনে 'ঘরের' সাথে 'বর' এর গভীর যোগসূত্র আছে। নারীর জন্য তার বাবার বাড়ী থাকে নয়ত থাকে স্বামী বা বরের বাড়ি। কখনো একটি ঘর নারীর নিজের হয়না। এর পেছনে পরিবার প্রথাই প্রধানত দায়ী। কারণ, পরিবারে যখন ছেলে সন্তান হয় তখন তাকে ঐভাবে বড় করা হয় যে সে যেন বড় হয়ে নিজেই একটি 'ঘর' তৈরী করতে পারে আর বাবার থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার-তো আছেই। অন্যদিকে মেয়ে সন্তানকে শিক্ষা দেয়া হয় সে কিভাবে পরের ঘরে গিয়ে অভিযোজিত হতে পারে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই যে বৈষম্য এটাই একটি নারীকে পঙ্গু করার জন্য যথেষ্ট। পারিবারিক সামাজিক ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের মূলেই রয়েছে নারীদের প্রতি এই বাস্তুহারা নীতি। পিতৃতান্ত্রিক প্রথা এটি দ্বারা সুকৌশলে নারীদেরকে বঞ্চিত করছে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। একটি শিশু ভূমিষ্ঠ

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার পর থেকেই সৃষ্টি হয় নারী-পুরুষ বিভেদ। মেয়ে শিশুকে শুরু থেকেই করা হয় অবহেলা। সে উপেক্ষিত হয় সমস্ত ভালবাসা-আদর থেকে। তাকে মনে করা হয় সমাজের বোঝারূপে। তাই এখান থেকেই শুরু হয় শিশু নির্যাতনের প্রথম ধাপ। যে ঘর একটি সন্তানের আশ্রয়স্থল সেখান থেকেই মেয়ে সন্তানটিকে করে দেয়া হয় নিরাশ্রয়, অধিকারহীন-নিরাপত্তাহীন। অন্যদিকে ছেলে সন্তানটিকে দেয়া হয় সার্বিক আশ্রয়, উত্তরাধিকার এবং নিরাপত্তা। 'ঘরে'র আভিধানিক অর্থে ও নারীকে উপস্থাপিত করা হয় 'অন্য' রূপে। একটি নারী সে শুধু বাস করতে পারবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে। 'ঘর' মানে 'গৃহ' 'বাড়ি', 'বাসভবন' 'সংসার', 'পরিবার' ইত্যাদি (বাঙলা সংসদ অভিধান, পৃ-২১৩)। ঘরের ক্রিয়া বাচক পদে আছে 'ঘর করা' অর্থাৎ একটি মেয়ের গৃহিনী বা বধু হইয়া সংসারে বাস করা। 'ঘর কন্না' মানে-গৃহস্থালি বা সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম করা। ঘর থেকে এসছে 'ঘরনী'। যার মানে স্ত্রী, পত্নী, সংসার পরিচালয় নিপুণা রমণী। এতে বোঝা যায় নারী শুধু ঘরের কাজের জন্য নির্বাচিত আর ঘরটি যার সেই পুরুষ ব্যক্তিটির ক্ষেত্রে ঘরের কাজের সাথে কোন সম্পৃক্ততা নেই, নেই 'ঘরনী'র আদলে কোন বিশেষ বিশেষণ। তাই এই ঘরের কর্তাব্যক্তিটির সাথে যদি নারীটি অভিযোজিত হতে না পারে তখনই তাকে করা হয় 'নিঘরনী'। মেয়েদেরকে প্রতিনিয়ত পরিবারের ভেতর থেকেই বৈষম্য করা হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা জন্মলগ্ন থেকেই জেণ্ডার বৈষম্যের শিকার হয়। পরিবারের অবজ্ঞা, অবহেলা, উপেক্ষা, বঞ্চনা, একটি নারীর জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। অনাকাঙ্খিত করে তোলে তার জন্মাবস্থা। করে রাখা হয় শিক্ষাবঞ্চিত। এভাবেই সমাজে প্রোথিত হয় নারী নির্যাতনের বিষাক্ত বীজ। এর থেকে মুক্তি কেবল সচেতন ও কার্যকরী পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্ভব। পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে-সর্বত্র নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত করলেই এবং নারীর প্রাপ্য অধিকার দিলেই কেবল নারী সহিংসতা বা নারী-নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব হতে পারে। সমাজিকভাবে বঞ্চিত নারীর 'পৃথিবী' বা নিজস্ব গন্তব্য পথ আর কতটুকুইবা হতে পারে। নারীর দেখা পৃথিবী কেবলই পুরুষতান্ত্রিক নির্যাতনে পরিপূর্ণ। নারীর শারীরিক, মানসিক নির্যাতন এবং নারীর উপর পুরুষের আধিপত্যবাদ, পুরুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বলিত

Dhaka University Institutional Repository

সমাজব্যবস্থা, সবই নারী সহিংসতার হাতিয়ার। 'পৃথিবী' মানে ভূমণ্ডল, ধরনী, জগৎ ধরা, মহী, ধরিত্রী, বসুমতী অভিধানে পৃথিবীর পাশেই আছে 'পতি' অর্থাৎ ভূপতি, রাজা, সম্রাট অর্থাৎ সব বিশেষণে বিশেষায়িত হয় শুধু পুরুষ জাতিই । তাই নারীর পৃথিবী বলতে নারীর নিজস্ব জগৎকেই বোঝান হয়েছে। নারীর নিজস্ব পরিমণ্ডলে পারিবারিক গণ্ডিতে তার জন্য নির্ধারিত করে দেয়া আবাসন আর নিজের মন ও মনের প্রযত্ন। নারী নিজেকে কিভাবে দেখে, নিজের জন্য কি চিন্তা করে তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নারীর প্রতি নারীর দৃষ্টিভঙ্গি কিরকম তার অনুপুঙ্খ প্রকাশ থাকা চাই, নারীর জীবনোপলব্ধির জন্য, নারীর বিকাশের জন্য। বাংলাদেশের ছোটগাল্পিকদের গল্পে নারীর এই বিষয়টি সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে।

তথ্যপঞ্জি

১. দিলারা হাশেম, দিন যায় রাত আসে, গল্প সমগ্র, ফেব্রুয়ারী-২০০১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা পৃ-৬১

২. প্রাগুক্ত, পৃ-৫৩

৩. নাসরীন জাহান, এলেনপোর বিড়াল, নির্বাচিত গল্প, ফেব্রুয়ারী-২০০২, অন্য প্রকাশ, ঢাকা পৃ-১৩

৪. প্রাগুক্ত, পৃ-৮

৫. প্রাগুক্ত, পৃ-১৪

৬. দিলারা হাশেম, মেহেদী, গল্প সমগ্র, ফেব্রুয়ারী-২০০১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা পৃ-২৪

Dhaka University Institutional Repository

৭. প্রাগুক্ত, পৃ-২৫

৮. হেলেনা খান, আমি কাঁদতে চেয়েছিলাম, বৃষ্টি যখন নামল, মে-১৯৭৮, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ-৩৫

৯. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫

১০. রাবেয়া খাতুন, ভালোবেসেছিলাম, মুক্তি যোদ্ধার স্ত্রী, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৬, সন্ধানী প্রকাশনী, পৃ-৩৭

১১. প্রাগুক্ত, পৃ-৪১

১২. রাজিয়া মজিদ, পাপী, ভালোবাসার সেই মেয়েটি, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৬, পালক পাবলিশার্স, পৃ-৩২

১৩. পাপড়ি রহমান, অন্ধকারে চন্দ্রের দহন, হলুদ মেয়ে সীমান্ত, বইমেলা-২০০১, দিব্য প্রকাশ, পৃ-৩৯

১৪. মকবুলা মনজুর, শুকনেরা সবখানে, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৮, চিশতিয়া আর্ট প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা। পৃ-৮

১৫. খালেদা এদিব চৌধুরী, চেনাঘর অচেনা মানুষ, অন্য এক নির্বাসন পৃ-১৯

১৬. সেলিনা হোসেন বৈধব্য, মতিজানের মেয়েরা, গল্পসমগ্র, ফেব্রুয়ারী-২০০২, সময় প্রকাশন, ঢাকা, পৃ-৩১০

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৩১২

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৩১২

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ-৩১৩

Dhaka University Institutional Repository

২০. প্রাগুক্ত, মুখ, পৃ-৩৩২

২১. প্রাগুক্ত, মুখ, পৃ-৩৩৩

২২. প্রাগুক্ত, মেয়ে লোকটা, পৃ-৩৩৪

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩৬

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩৭

২৫. রাশিদা আখতার খানম, নারীবাদী চিন্তা ও মতিজানের মেয়েরা, উলুখাগড়া, সম্পাদক: সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১২, ফেব্রুয়ারী-২০০৬, সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, ঢাকা, পৃ-১৮৩

২৬. লায়লা সামাদ, আলোকিত অন্বেষণ, অমূর্ত আকাঙ্খা, ১৯৭৮, সন্ধানী প্রকাশনী- ঢাকা, পৃ-৫৪

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৫৪

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৫৯

২৯. সেলিনা হোসেন, আকালীর স্টেশন জীবন, পৃ-৩০০

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ-৩০১

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ-৩০১

৩২. রাশিদা আখতার খানম, নারীবাদী চিন্তা ও মতিজানের মেয়েরা, উলুখাগড়া, সম্পাদক: সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১২, ফেব্রুয়ারী-২০০৬, সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, ঢাকা, পৃ-১৮২-১৮৩

৩৩. ঝর্ণাদাশ পুরকায়স্থ, মুখ ফেরানো দিন, প্রমীলা সুন্দরী মালতী মালা থেকে মোনা রায়, পৃ-৯৯

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ-১০২

৩৫. লায়লা সামাদ, অমূর্ত আকাঙ্খা, অমূর্ত আকাঙ্খা, সন্ধানী প্রকাশনী-১৯৭৮, ঢাকা, পৃ-১১

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ-১৩

৩৭. সেলিনা হোসেন, ঘর, অবেলার দিনক্ষণ, পৃ-৯৬

৩৮. নাসরিন জাহান, আমাকে আসলে কেমন দেখায়, নির্বাচিত গল্প, পৃ-১৯

৩৯. সেলিনা হোসেন, অরণ্য কুসুম, নারীর রূপকথা, অনন্যা, ফেব্রু-২০০৭, পৃ-৭০

৪০. মকবুলা মনজুর, তৃষ্ণার্থ ধরিত্রী, সায়াহ্ন যূথিকা, জুন -১৯৭৮, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ-৪৯-৫০

৪১. পাপড়ি রহমান, মধ্য রাতের ট্রেন হলুদ মেয়ের সীমান্ত, ফেব্রুয়ারী-২০০১, দিব্য প্রকাশ, পৃ-৮৪-৮৫

৪২. মাফরুহা চৌধুরী, কোথাও ঝড়, কোথাও ঝড়, মে ১৯৮০, মৌসুমী পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ-৩০

৪৩. পূরবী বসু, দুঃসময়ের অ্যালবাম, নিরুদ্ধ সমীরণ, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৬, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ-৫৮

৪৪. মকবুলা মনজুর, অবিচ্ছেদ্য, দিন রজনী, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৩, বস্তু প্রকাশন, ঢাকা, পৃ-১০১

৪৫. মাফরুহা চৌধুরী, আকাশে উদ্যান, নিঃশর্ত করতালি, জানু-১৯৮৪, মৌসুমী পাবলিশার্স, পৃ-৫৫

৪৬। ঝিনুকের মালা, প্রাগুক্ত, পৃ-১৫

Dhaka University Institutional Repository

৪৭। প্রাগুক্ত, পৃ-১৬

৪৮। হেলেনা খান, আমার মেয়ের মুখ, কালের পুতুল, অক্টোবর-১৯৭৮, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ-৯

৪৯। প্রাগুক্ত, পৃ-১০

৫০। প্রাগুক্ত, পৃ-১৪

৫১। হেলেনা খানা, রঙ-ধনু আঁকা ছবি, ফসলের মাঠ, অক্টোবর-১৯৮৯, বুক ভিলা, ঢাকা, পৃ-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মহিলা ছোটগল্পকারদের গল্পে নারীর পরিসরঃ গৃহ ও বাইরের জগতের দ্বন্দ্ব।

Dhaka University Institutional Repository

পরিসর মানে ব্যাপ্তি, বিস্তার, সীমা। নারীর পরিসর হিসেবে বলা যায় নারীর দেখা বা নারীর জন্য বিস্তার করা পথ। নারীর উপলব্ধিক সীমাকে ঘিরে পরিব্যপ্ত যে পথের নিশানা। আর গৃহ বলতে ঘর, বাড়ি, বাসস্থান, আবাসকে বুঝে থাকি। অর্থাৎ যেখানে জীবন ধারণের জন্য বসবাস করা হয়, সেই জায়গাটি। গৃহ ভালবাসার আশ্রয়স্থল। শব্দের উপকরণে নারীর জন্য এক ছন্দোবদ্ধ জীবন অনুভূত হয় কিন্তু এই আশ্রয়ও নারীর জন্য নিষ্কন্টক নয়, আছে দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব কখনো পরিবারের সদস্যদের ঘিরে কখনো বহির্জীবন থেকে। কখনো জেণ্ডার বৈষম্যের বিরুদ্ধে আবার কখনো পুরুষতান্ত্রিক মূল মন্ত্রের বিরুদ্ধে। ঘর-সংসার-বাহিরের হাজারো ঝঞ্ঝায় নারীর পরিসর বা তার নিজস্ব জগত তৈরি হয়। ঘরে প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় গৃহকর্তা থেকে শুরু প্রতিটি সদস্য। এর পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রের প্রতিযোগিতা, কলিগদের দৃঢ় অথবা রূঢ় আচরণ, শাসন-ত্রাসন এতকিছুর পাশ কাটিয়ে কর্মক্লান্ত নারী গৃহে এসে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ফারজানা সিদ্দিকা এরকমই একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন তার 'শিক্ষিত' নারীর মাথার ভেতর ভিন্ন রকম ভায়োলেন্স' প্রবন্ধে। তিনি এখানে দেখিয়েছেন কিভাবে একজন কর্মজীবী নারী পরিবারে গৃহে কর্মক্ষেত্রে নীরব যন্ত্রণার শিকার হন। তাঁর মতে :

> 'ঐ নারী শিক্ষকের স্বামীটি যদি শিক্ষক হন তিনি কিন্তু অনায়াসে দরজা বন্ধ করে পড়তে বসে যান। একই বাড়িতে নারী শিক্ষকটি সন্ধ্যা থেকে বাচ্চার হোমওয়ার্ক, পরের দিনের খাবারের মেন্যু ঠিক করা, আত্মীয় স্বজনদের মেহমানদারী, বাচ্চাকে রাতের খাবার খাওয়ান, ঘুম পড়ানো ইত্যাদি শেষ করে পরিশ্রান্ত হয়ে যখন বই পত্রের সামনে বসেন তখন ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসে।'[১]

পেশাজীবি নারী সনাতনী ধারার গৃহকোণ ছেড়ে বাইরের বৃহত্তর পরিসরে পা রাখেন। এখানে তাকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয় পুরুষের সাথে সমান তালে। আবার সংসার জীবনের সমস্ত দায়িত্বও সে পালন করে। এতে করে তার

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে তৈরী হয় এক দ্বন্দ্বায়িত ধারা। নারী শিকার হয় শারীরিক-মানসিক টানাপোড়েনের। ক্ষত-বিক্ষত হয় তার জীবন যাত্রা। পরিবারে, সমাজে যদি পুরুষ সর্বক্ষেত্রে সর্বকাজে নারীকে সাহায্য করে একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে তবেই ভারসাম্যপূর্ণ এবং শান্তিময় সহাবস্থান হয়ে উঠতে পারে উভয়ের জন্য। নারীরা তাদের ঘরে বাইরে দীর্ঘপথ পাড়ি দেয় এক প্রতিকূল পরিবেশে। এ প্রতিকূলতা আসে তাদের পরিবার থেকে, সমাজ থেকে, রাষ্ট্র থেকে। নারী-পুরুষ উভয়ের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আসলেই কেবল সম্ভব নারীর মুক্তি আর তাতে অগ্রগতি ঘটবে নারীর পথচলায়। দিলারা হাশেমের 'দিন যায় রাত আসে' গল্পে দেখা যায় একটি নারীর জন্য গৃহের মাঝে দিনের পর দিন স্বামীর অবহেলায় ক্লান্তিকর দিন আর রাত শেষ হয়। তাইতো গল্পের নায়িকা হাস্না তার প্রতীক্ষিত সংসার যাত্রায় বিধ্বস্ত হয়েছে বারবার। বহুবারের মতো কোনো এক সন্ধ্যায় তাই তার আবারো মনে হয়েছে,

> 'এ ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে যাবে। এই বিছানায় উঠতে ঘৃণা হয়েছে, বিষ লেগেছে এ বাড়ির সব কিছু। কিন্তু অত:পর সে এই বিছানাকে আশ্রয় করেই যাতনা ভোলার জন্যে এ পাশ ও পাশ করেছে।'[২]

হাস্নার এই কষ্টকে উপেক্ষা করে স্বামী সামাদ কত সহজেই গ্রহণ করে কাজের মেয়ের শারীরীয় সুখ। হাস্না তাই কেবলই ঘুরপাক খায় আত্ম দহনে। অন্যদিকে 'বিসর্পিল' গল্পে দেখি বাবা-মা মরা মেয়ে মুন্নি খালার আশ্রয়ে দু মুঠো ভাতের বিনিময়ে সমস্ত কিছু করেও মন পায়না খালা কিংবা দাদি'র মত নারীদের মন। পিতৃতান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন এ নারীরাই হয়ে ওঠে নারী নির্যাতনের হাতিয়ার। মুন্নিকে ভালবেসে বিয়ে করতে চায় রাঙা দাদির নাতি এম. বি. এ. করা তারিক। তাতে বাধ সাধে সমাজের খালা দাদিরা। হিংসাকাতর হয়ে খালা বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য উঠে পরে লেগে যায় কিন্তু খালার ছোট মেয়ে ঝর্ণা না বুঝেই উচ্ছ্বসিত হয়। নিঃস্ব এ মেয়েটি অসহায় ভাবেই ঝড়ে যায় বিত্তশালীদের গৃহকৌণিক অসৌজন্যতায়-

Dhaka University Institutional Repository

'মুন্নি তাকালো ওদের দিকে। আপনিই নুয়ে এলো দৃষ্টি। কলোচ্ছ্বাস থেমে গেছে ঝর্ণার। মুখটা কালো ক'রে সে তার মুন্নি আপার দিকে তাকিয়ে আছে। মুন্নির দৃষ্টিটা তখন সামনের রিক্ত উঠানটায় কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।'[৩]

মুন্নির মনে হচ্ছে ওর জীবনের মতই যেন উঠোনটাতে-

'এক ফালি সোনালী রোদ সেখানে থমকে আছে। পড়ন্ত বেলার মিঠে মিঠে রোদ। বড় ভাল লাগত মুন্নির। ....সেই রোদটা আজ কেমন আবছা আবছা...ধোয়াটে।'[৪]

বিত্তহীন মুন্নি গৃহে সমাজে কত অসহায়। লেখক এখানে সহায়হীন নারীর এক মর্মন্তুত কল্প চিত্র এঁকেছেন। নাজমা জেসমিন চৌধুরীর 'প্রচ্ছন্ন অনল' গল্পে দেখা যায়, আতিক তার স্বভাব সুলভ পুরুষ ভাবনা থেকে স্ত্রী শাহীনের সাথে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খারাপ আচরণ করতে থাকে। তখন শাহিনের কাছে সংসারটিকে এক দুর্বিসহ যন্ত্রণার মত মনে হয়। জীবনের এমনি মুহূর্তে আতিকের বন্ধুর সাথে ঘনিষ্ঠতা হয় যা আতিক পছন্দ করেনা। একদিন তাই শাহিনের হাতে ফুল দেখে বুঝে যায় কার দেয়া ফুল। আর তখনই-

'হিংস্র পশুর মত একলাফে গর্জনকরে ফুলগুলো শাহীনের হাত থেকে টেনে নেয় আতিক। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে শাহিন। গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। ফুলের কাটায় হাত ছড়ে গেছে গভীর হয়ে। রক্তের লাল ফোঁটা টুপটাপ ঝড়ে পড়ছে পাপড়ির ওপর। দু'জনে বিমূঢ় হয়ে চেয়ে থাকে রক্তাক্ত পাঁপড়িগুলোর দিকে।'[৫]

-পুরুষ আতিক গৃহের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় স্ত্রীর প্রতি সামান্য সৌজন্য বোধটুকুও তার লুপ্ত হয়ে গেছে। নারীর সম্মান-নারীর নিজস্বতাকে এখানে পুরুষ প্রতীকটি...'রক্তাক্ত গোলাপ পাপড়ি' গুলোর মতই রক্তাক্ত করেছে। পরিবারে

Dhaka University Institutional Repository

নারীর এই নির্যাতন এর যেন কোন প্রতিকার নেই, প্রতিকার হয়না। সমাজ-ধর্ম-রাষ্ট্র সর্বত্র এই নারীদের জন্য নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে সবাই।

'অনাহুত ইচ্ছা' গল্পে হেলেনা খান দেখিয়েছেন আরেফা আর রফিক হাসনাতের দাম্পত্য জীবন সুখের ছোঁয়ায় ভরপুর। কিন্তু সন্তান না থাকায় সমাজ তাকে ইঙ্গিত করবে বন্ধ্যা নারী হিসেবে তাই গোপনে তারা দত্তক নেয় মেয়ে রিমিকে। আরেফার ভাবনায় এই বিষয়টি নগ্ন হয়ে ধরা পড়ে এভাবে যে:

> 'দূর সম্পর্কের এই বিত্তহীন ভাইটি তার জীবনের একটা পরিপূর্ণ সম্পূরক। তার ও রফিক হাসনাতের দাম্পত্য জীবনের ভাঙ্গনের মুখে বাঁধ দেয়ার সহায়ক।'[৬]

নিজের সন্তান না থাকলেও সমাজের ভয়ে অন্যের সন্তানকে ভালবেসেছে অবলীলায়। রক্ষা করেছে দাম্পত্য জীবন। সমাজের ভয়ে নারী থাকে সন্ত্রস্ত-ভীত গৃহে কিংবা বাহিরে-সর্বত্রই। 'কারাগারের ভেতরে ও বাইরে' গল্পগ্রন্থের 'সূর্যোদয়' গল্পে হেলেনা খান দেখিয়েছেন কিভাবে ক্রমাগত বাইরের আঘাতে রক্তাক্ত হতে হয় একটি নারীকে। নিম্ন বিত্ত পরিবারের এক ধর্মীয় সংস্কারাচ্ছন্ন মেয়ে মাসুদা ভাইয়ের মাধ্যমে আমেরিকার মত স্বপ্নের দেশে পাড়ি জমায়। কিন্তু সেখানে সে পদে পদে বাইরের আঘাতে বিধ্বস্ত হয় ক্রমাগত। কোথাও নিরাপত্তার নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায়না। গৃহের মধ্যে অসহায় হয়ে পড়ে ভাইয়ের বিদেশী ম্যাম লিনেটের আগের ঘরের ছেলে চার্লস এর দ্বারা আবার বাইরে যখন যায় সেখানে নির্যাতন করে অফিসের বস কার্লস। সবার দৃষ্টি মাসুদার শরীরের উপর। এক দিন বস্ কার্লের আচরণে হতবিহ্বল মাসুদা ভাইকে এসে সে ঘটনা জানায় কিন্তু ভাই :

Dhaka University Institutional Repository

'ঘটনা বিবৃত করার সাথে সাথেই ভাই সজোরে একটা চড় বসিয়ে দিল তার গালে, এটা কি একটা স্বাভাবিক কাজ হল ? এক ধাপেই তোর প্রমোশন হয়ে যেত! ডলারের অঙ্কটাও কত তাড়াতাড়ি বেড়ে যেত! স্টুপিড্ ন্যাকা মেয়ে।'[৭]

মাসুদা দেখে তারই বড় ভাই তাকে চড় মেরে নোংরা পথে যাওয়ার ইঙ্গিত করে। নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করা ভাইয়ের এই রূঢ় আচরনের সাথে যুক্ত হল ভাবীর বাক্য বান। তার নিজস্ব জগৎ সচেতন মাসুদা ভেঙ্গে পরে, জীবনের পথ চলায় তাইতো সবাই হাসের পালকের মত সব সম্পর্ক ঝেড়ে ফেললেও-

'দুই যুগ উত্তীর্ণ মাসুদার মাঝে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আত্মসচেতনতা, দেশের আবহাওয়া ও ঐতিহ্য বিশেষ করে ধর্মের পবিত্র চেতনা সম্বলিত দৈহিক শুচিতাবোধ।'[৮]

এখানে লেখক মাসুদার এই অসহায় জীবনকে কারাগারের সাথে তুলনা করেছেন। যে শুচিতা নিয়ে মাসুদা বড় হয়েছে তা নিয়েই আজ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে কিছু পুরুষতান্ত্রিক মহলের পুরুষ কর্তৃক।

'কালের পুতুল' গল্পগ্রন্থের 'ধুপছায়া' গল্পে একটি নারীর মাতৃত্বের কাছে পরাভূত হয়েছে গৃহের ও বাইরের সমস্ত দ্বন্দ্ব। পিতৃ-মাতৃহীন আঞ্জু শেখ তার মায়ের পরকীয়া প্রেমের জন্য মাতা এবং পিতাকে হারিয়েছে। এ কথা শোনার পর থেকে মুনিব স্ত্রী রায়হানার পরিবর্তনে আঞ্জু বিচলিত হয়েছে। তার ছোট্টমন সংকুচিত হয়ে উপলব্ধি করে :

'আঞ্জু কাজে অকাজে কাছে এলে, তার মুখে যে ছায়া পড়ে, তা দেখে বিচলিত হয় ওই ছোট ছেলেটাও। তার দৃষ্টি আগের মত মমতায় সুস্মিত নয় বরঞ্চ সে দৃষ্টি রূঢ় ও নিষ্ঠুর?'[৯]

Dhaka University Institutional Repository

এই নিষ্ঠুরতার ভয়ে ভীতু আঞ্জু বুঝতে পারেনা কোথায় তার ত্রুটি। এদিকে রায়হানার এগার বছরের বন্ধ্যাত্ব জীবনের অবসান ঘটে। কোলে আসে ছোট্ট শিশু সেতু। রায়হানা দেখে 'আঞ্জুর পাশে ঘুমন্ত সেতু দুটি নিস্পাপ মুখ।' তারপর রায়হানার মাতৃহৃদয় অনুতাপে ভরে গিয়ে ক্ষমা করে দেয় আঞ্জুকে। রায়াহানা উপলব্ধি করে সব শিশুরাই নিস্পাপ আর সমান। নারীমন মাতৃত্বের কাছে পরাজিত হয় সব সময়ই। সমগ্রভাবে এই পরাজয়ই একজন নারীকে গৃহকোণে তাকে মমতায় আবদ্ধ রেখেছে। মাতৃত্বের কাছে বিলিয়ে দিয়েছেন নিজের নিজস্বতাকে।

'স্ফুলিঙ্গ' গল্পে লেখক দেখিয়েছেন বাইরের ছায়া গৃহে পরে কি মর্মন্তুত পরিণতির মুখোমুখি হয় দাম্পত্য জীবন। গল্পের নায়ক মনসুর অসুস্থ হলে স্ত্রী শিরিন তাকে ডাঃ দেখাতে নিয়ে যায় জোড় করে। ধুরন্দর ডাক্তার রোগী পেলেই খারাপ রোগের ইঙ্গিত দিয়ে W.R. টেষ্ট করতে বলে। এই টেষ্টের মাধ্যমে ডাক্তার হাতিয়ে নেয় মোটা অঙ্কের টাকা। এই ব্লাড টেষ্টকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় দাম্পত্য জীবনে তীব্র দ্বন্দ্ব। এক পর্যায়ে স্বামীর বন্ধু সিরাজ এসে ডাক্তার আমিনের কুকীর্তির কথা বলে দেয়ায় শিরিনের ভুল ভাঙ্গে। শিরিনের ভাবনায় ধরা পড়ে-

> 'গুমোট কয়েকটি মুহূর্ত। মনসুর যেন নিশ্চল প্রকট একটা পাথরের স্তুপ। ওর নিস্পৃহতা পীড়াদেয় শিরিনকে। সন্দেহের জোনাকিটা থেকে থেকে তার আলো জ্বলে। সে আলো যেন একেবারে নিভে যেতে চায়না।'[১০]

এভাবেই বাইরের পরিবেশে তৈরী হওয়া ঘটনা দাম্পত্যজীবনকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় সমস্ত সুখ-শন্তি আর আশাকে। 'সাগর শুকায়ে যায়' গল্পেও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে গৃহও বাইরের দ্বন্দ্বে দাম্পত্য জীবনের অস্থিরতা। তৌহিদা একটি স্কুলের শিক্ষিকা। তাকে ঘর এবং বাইর দু'দিকই সামলে

Dhaka University Institutional Repository

চলতে হয়, তবুও মাঝে মধ্যে স্কুলে লেট হওয়ায় বকা শুনতে হয় প্রধান শিক্ষকের আবার ঘরে আসলে দেখতে হয় শাশুরীর মুখ ঝামটা-

'আবার যখন ঘরে ফেরে তখন শোন শাশুরীর বাজখাই গর্জণ-'রোজ রোজই তোমার দেরি করে আসা চাই। এদিকে তোমার দুই ছেলেকে সামলায় কে ? দুপুরে একটু ঘুমোবার যো আছে ? পারতো ও দুটোকে সাথে করে নিয়ে যেও আর নয়তো কোন এতিম খানায় দিয়ে দাও।'[১১]

এভাবেই চলে নারীর নিত্য নৈমিত্তিক জীবন। এরপর বড় বাচ্চাটাকে পড়িয়ে, ছোট বাচ্চাকে না ঘুমানো পর্যন্ত কোলে নিয়ে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে যখন স্কুলের খাতা নিয়ে বসে তখন আসে ক্লাবের তাসের আড্ডা ছেড়ে স্বামী আজমল।

'এসেই গায়ের শার্টটা খুলে ছুড়ে দেয় সামনের চেয়ারটার মাথায়' তারপর স্যান্ডেল পড়তে গিয়ে বিরক্তির সাথে বলে ওঠে-

'ধ্যাত্তেরী, স্যান্ডেলগুলো ঠিক জায়গায় রাখতে পার না ? কি, কর কি সারাদিন?'

আজমলের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব পরিপূর্ণরূপে উপস্থিত তাইতো পায়ে পায়ে দোষ খুঁজে বেড়ায় এবং তার স্বামীত্ব জাহির করতেই বলে ওঠে-

'আমি স্বামী, বাড়ির কর্তা, আমার সুখ-
সুবিধা আমি চাইব।'[১২]

গৃহকর্তা আজমল স্বামী তাই সে, জোড় গলায় বলছে যে, তার সুখ শান্তি-সুবিধাই সে শুধু চাইবে তাতে স্ত্রী'টি শরীরে কিংবা মনে বাঁচুক আর নাই বাঁচুক স্বামীর কিছু যায় আসে না তাতে। তারপর স্ত্রীর শরীর সম্পর্কেও কটুক্তি করতে ছাড়েনা স্বামী আজমল-

Dhaka University Institutional Repository

'এখন তুমি মাষ্টারনী, বিগত যৌবনা' কিংবা 'ওই চাকুরী ছাড়া তোমার আর কি আছে ? এক কালীতারা চারখানা হাড্ডী ছাড়া।'[১৩]

এভাবেই ঘরে বাইরে যুদ্ধ করতে হয় নারীদের। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের কাছে পরাজিত হয়ে একদিন দাসীবৃত্তিতে জড়িয়ে ফেলে নিজেকে এবং 'ঝাপসা চোখের পানি কোন শূন্যে মিলিয়ে শুকিয়ে' যাবার মতই নিজেরাও একদিন পুরুষতান্ত্রিক ছকে বাধ পড়ে যায়। হারিয়ে ফেলে নিজস্ব সত্তা। অস্তিত্তের সংকটে পড়ে যায় নারী, নারী মন আর নারীর পথ চলা। 'নিরেট সত্য অথবা প্রতিভাসের গল্প' নামক গল্পে আকিমুন রহমান দেখিয়েছেন একটি মেয়েকে একই সাথে কিভাবে ঘর-বাহির এবং নিজের জীবন সামলে চলতে হয়। শিক্ষিত মেয়ে রেজিনা জাহানকে বাবা মা এক বিদেশী পাত্র পেয়ে তড়িঘড়ি বিয়ে দেয় কিন্তু কিছু দিনের মাথায় আবার ডিভোর্স লেটারও চলে আসে। জীবনের এই যে ভাঙ্গনের শব্দ সে থেকে রেজিনা জাহানের মুক্তি ঘটেনি। এটা আটপৌঢ়ে মেয়ে-জীবনের প্রতিদিনের শব্দচিত্র। তুবও অফিসের কাজ তাকে কিছুটা মুক্তি দিয়েছে কিন্তু সেখানেও প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে পুরুষ সহকর্মীদের সাথে। যারা তাকে নারী হিসেবে প্রতিটি কাজেই দমিয়ে রাখতে চায়। তাইতো পুরুষ সহকর্মী সুপারভাইজার, তার পাঁচ মিনিট দেরী করার জন্য তাকে ফেলেই গন্তব্য স্থানে চলে গেল। এর ফলে রেজিনা জাহান অফিসে অনেক সমস্যায় পড়তে পারে সে ভাবনা থেকেই সহকর্মীটি এ কাজ করেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কিংবা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নীতি নির্ধারণকারী পুরুষরা চায়না নারী স্বাবলম্বী হোক, নারী স্বচ্ছন্দে পথ চলুক। বৈশ্বিক পুঁজিবাদ নারীকে তাদের প্রয়োজনে ঘরের গৃহকোণ থেকে বাহিরে নিয়ে আসলেও কর্মক্ষেত্রে নারীর যোগ্যতা বা তার মেধার প্রকাশকে পুরুষরা মেনে নিতে পারেনা। নারীর কোনো দক্ষতাকে পুরুষ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করতে পারেনা। কারণ তারা মনে করে, এতে সমাজে পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব বা একক ক্ষমতার বলয়টি ভেঙ্গে যেতে পারে। তাদের আধিপত্য বিস্তারের পথে কর্মজীবী নারীকে প্রতিদ্বন্দ্বি মনে

Dhaka University Institutional Repository

করে। রেজিনা জাহান নারী তাই তাকে সহজেই এই মানসিক অস্বস্তিতে ফেলেছে পুরুষ সহকর্মী। ঘটনার পর হতবিহ্বল অবস্থায় তাইতো-

> 'তার মনে হতে থাকে এই সংবাদ-সংস্থার প্রধান মাথা পর্যন্ত পৌঁছুবে বা ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়ে ও থাকতে পারে। তার দিকে আসতে থাকবে বা আসছে জবাবদিহিতার বা কারণ নির্দেশের নানা ধরনের পত্র। কোনোটি তার ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে। এই যে তার এই দেরি এবং এই যে তাকে ফেলে রেখে কোঅর্ডিনেটরের চলে যাওয়া এটি তার দায়িত্বহীনতার স্পষ্ট পরিচয়। এটি দায়িত্ব অবহেলা ও ইনসিনসিয়ারিটির ধ্যাবড়ানো এক উদাহরণ তো হয়ে উঠেছেই ইতিমধ্যে- আরো কী কী বলা হবে একে, তা সে ভেবে উঠতে সেই মুহূর্তে ব্যর্থ হয়। শুধু ভয় পেতে থাকে সে।'[১৪]

রেজিনা জাহান একজন নারী হওয়ার কারণেই পুরুষ সহকর্মীটি নির্দ্বিধায় তাকে তার জন্য রেখে গেছে 'জবাবদিহিতার নির্দেশের' এক অশরীরী হুলিয়া অথচ অফিসে এই দেরি করে আসার জন্য সে নিজেও দায়ী নয়। সেখানেও বাধ সাধে তার পরিবার। অধুনিক চিন্তা-চেতনাগত সচেতন নারী রেজিনা জাহান অনেক বেশি আত্মসচেতনও। তাইতো তার নিজ সম্পর্কে উপলব্ধিটিও তার অনেক স্বচ্ছ :

> 'এই যে মোচন অসাধ্য গ্যাঞ্জামটি হলো-তার জন্য কী সে নিজে দায়ী! কোথায়! তার কোথায় হাত ছিলো। কিন্তু কে শুনবে সে কথা-কে বুঝতে চাইবে। না বাসার লোকজন না অফিস অথরিটি। অফিসে সে তার বাসার গ্যাঞ্জাম প্রবলেম শোনাতে যাবে নাকি- সেতো অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে এমনটি করতে। আর বাসায় বলতে যাও- শুনে বলবে বাসার প্রবলেম না সামলালে চলবে!'[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই একটি নারীকে ঘরে বাইরে জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। যে কারণে অবশেষে তার কেবল এটাই মনে হয়:

'আর, কোনো হুজ্জোত কোথাও তার ভাল লাগে না আর- না বাসায়, না নিজের শরীরে, না অফিসে।'[১৬]

একটি নারীর কর্মক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মীদের অসহযোগী মনোভাবের কারণে কর্মক্লান্ত হয়ে পড়ে একটি নারী। নারী মন, নারী শরীর শিকার হয় সমাজের পুরুষ আর পুরুষতান্ত্রিকতা দ্বারা। যা একটি নারীকে ক্রমশ মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়। যে কারণে নারীটি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয় পড়ে জীবন চলার বাঁকে। রাবেয়া খাতুনের 'মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী' গ্রন্থের নাম গল্পে দেখিয়েছেন যুদ্ধাত্তার স্বামীহারা এক নারীর অসহায়ত্ব। আপন বড় ভাইও তার জীবনটাকে পুঁজি করে আয়ের উৎস করে নিয়েছে। গল্পের শুরুতেই দেখি নারী বাস্তব জীবনের ঘূর্ণনে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দিহান হয়ে ওঠে-

'আমি ভুলে গেছি আমার একটা নাম ছিল। একটা নয় কয়েকটা। ভালো নাম ডাক নাম। স্বামীর মুখের আদুরে সংক্ষিপ্ত নাম। আরও একজনের দেওয়া নাম অগ্নিমিতা। এখন আমার একটাই পরিচয়-মিসেস আলমগীর।'[১৭]

যুদ্ধের সময় তার স্বামী আলমগীর সাহেবকে কিছুলোক ধরে নিয়ে যায়। আর তাকে মেরে ফেলার ঘটনা তিনি জানেন তখন যখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন হওয়া দেশে তাকে সাদা থান কাপড় মুড়িয়ে কিছু মানুষ তাদের স্বার্থ সিদ্ধি করে। তার ভাষায়-

'আমার নবরূপের রূপকার ভাইয়া। তিনি বোঝালেন আমি নামি দামী শহীদের স্ত্রী' (মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, পৃ-৩১)

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ নারীটিযে তার নিজস্ব পথে চলবে স্বাধীনভাবে তাতে বাধসাধে নারীরও সমাজের রূপকার পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন কিছু স্বার্থান্বেষী পুরুষ। একদিন জীবনের স্বাভাবিক বিষয়টি উপলব্ধি করে কথক নারী তাই বলছেন-

> 'আমি মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী। তার জন্য সব রকম সম্মান উপলব্ধি আমার রয়েছে। থাকবে যদ্দিন বেঁচে থাকব। কিন্তু আমি তো জীবত মানুষ। জীবনের সঙ্গে প্রাণধারী মানুষের কিছু ক্ষিদে তৃষ্ণার সম্পর্ক থাকে। সাধারণ মানুষ তা অস্বীকার করতে পারে না। হয় তাকে সাধু হতে হবে। নয় ভন্ড আমি দুটোর কোনটাই নই। বাঁচার জন্য সঙ্গী চাই।'[১৮]

একথা শুনে নতুন রূপের রূপকার তার বড় ভাই ভীষণ রেগে গিয়ে বলেন-

> 'দেশের জন্য স্বামী উৎসর্গ করে নিজেকে দেবী ভেবে বসেছো না' (মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, পৃ-৩৪)?

অর্থাৎ বোনটি বিয়ে করলে তার স্বার্থে আঘাত পড়বে তাই সে সহ্য করতে পারছেনা বোনের সঙ্গী নেয়ার কথা। তাইতো স্বার্থান্ধ ভাইটি একবারও বোনের জীবনের কথা ভাবতে চাচ্ছেনা। বোনকে কটুক্তি করতেও তার বাঁধেনি। আধুনিক মন ও মননের অধিকারী নারী তাই সহজেই বলতে পারলো-

> 'স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা হয়েছি একথা ঠিক। কিন্তু তাকে উৎসর্গ করিনি। ঘটনাচক্রে সেটা ঘটেছে এবং তুমি তার সুযোগ নিচ্ছো।'[১৯]

এভাবেই নারীকে ঘরে বাইরে সর্বত্র দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে হয়। তার ভাই এতটাই পুরুষতান্ত্রিক নীতিতে অবিচল যে, বোনের স্বপ্নকে ভেঙ্গে দিতে এবং বোনের বন্ধু ইস্রাফিলকে গুম করে ফেলতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। বোনটি তখন

Dhaka University Institutional Repository

'দিনে দিনে প্রাণবন্ত এক যুবতী পরিণত হলো পাথরে' এবং সে তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েই বলছে-

> 'এ অবস্থা যার তৈরী সুযোগটা সে নিলো পুরোপুরি। ভাইয়া এখন বিখ্যাত নেতা। আর আমি।'[২০]

অবশেষে নারী একটি প্রশ্ন রেখে যায় 'আর আমি ?' এই প্রশ্ন তার সমাজের কাছে রাষ্ট্রের কাছে। এই প্রশ্ন থেকেই পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায় নারী।

পুরুষের লাম্পট্য, সামাজিক ষড়যন্ত্র আর তথাকথিত নারী দ্বারা নারী নির্যাতন সমাজে নারীকে কোন অবস্থায় নিয়ে যায় তারই শব্দ চিত্র 'নক্ষত্রের তলে' গল্পে পাওয়া যায়। গল্পের একটি চরিত্র ময়না। এক গরীব মায়ের সন্তান। যে মা তাকে সব সময় পুরুষের দৃষ্টি থেকে আগলে রাখত। সেই ময়না একদিন ঠিকই এক লম্পট পুরুষ আসাদ সাহেবের কু-দৃষ্টিতে পড়ে যায়। আসাদের মিথ্যে ভালবাসার ষড়যন্ত্রে একদিন ময়না গর্ভধারণ করে সমাজের কাছে, মানুষের কছে দুর্বিষহ জীবন যাপন করেছে। সেই ময়নাই তার গর্ভের সন্তান দিয়ে অন্য এক নারীর সংসার বাচিয়েছে। সেই নারীটি ও আর কেউ নয়, আসাদেরই স্ত্রী। যে পরপর তিনটি মৃত বাচ্চার জন্ম দিয়ে গঞ্জনার শিকার হয়েছে। সমাজে পুরুষের এ নির্যাতন বা লাম্পট্যের কোন বিচার হয়না। আপন বলয়ে টেনে নেয় তার সব দোষ। সমাজ ধৃষ্টতার সাথে শুধু নারীর দোষটিই খুঁজে বেড়ায়। ঘটনার আবর্তে ময়নার বাচ্চা আসাদের কোলেই বড় হয় কিন্তু অসহায় ময়না একদিন সব যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে চলে যায়। কেবল তখন আসাদের মনে হয়,

> 'ময়না যেন আসাদেরই নিলর্জ্জ ধৃষ্টতা দেখে লজ্জায় ঘৃণায় অমন বীভৎস ভাবে দাঁতে জিভ কেটে ঝুলছে'[২১]

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুর আগে ময়নার অবশ্য মনে হয়েছে তারই সন্তান কোলে আসাদের উজ্জ্বল হাসি দেখে-

> 'সবাই খুশীতে জ্বল জ্বলে চোখে দেখছে ওদের। শুধু লাইলীই মনে হয় লজ্জায় বেরোয়নি ঘর থেকে। কেনই বা বেরোবে ? তার ঘরের মানুষই তো ঢুকবে ঘরে গিয়ে। কিন্তু ময়না ? ময়না এখন কি করে ? সে কি হাড়ি খাওয়া কুকুরের মত পালিয়ে যাবে পেছন দরজা দিয়ে ? না কি সবার সামনে ছুটে গিয়ে টুটি টিপে ধরবে ঐ হঠকারী পুরুষের যে কিনা ঘরে বউ রেখে ভালোবাসার মুখোস চড়িয়ে ময়নাকে এমন করে পথে নামিয়েছে।'[২২]

সমাজে ময়নার মত নারীরা এভাবেই কিছু প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে ঝড়ে যায় জীবন থেকে। লেখকও তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি সমাজের ভ্রুকুটির জন্য। এ প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের 'শিউলিমালা' ও 'অগ্নি গিরি' গল্প দুটোর ব্যর্থ প্রেমের নীরব যন্ত্রণা এক অনির্বচনীয় রূপ-কল্পে বহুকৌণিক মাত্রা পেয়েছে। এখানে লেখকের শিল্প কুশলতায় নারীর প্রতীকী ব্যঞ্জিত হয়েছে। এক নান্দনিক বলয়ের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে, 'অগ্নি-গিরি'তে দেখি নিরিহ-শান্ত মাদ্রাসার ছাত্র সবুর প্রায়ই কিছু গুন্ডা ছেলেদের দ্বারা অপমাণিত হয়। সবুরের এ পরাজয় দেখে নায়িকা নূরজাহান সহ্য করতে পারে না। সে প্রতিবাদ করতে বলে। এক পর্যায়ে সত্যি সত্যি সবুর প্রতিবাদ করে কিন্তু ঘটনা চক্রে একটা ছেলে মারা যাওয়ায় তাকে জেলে যেতে হয় এবং তার সাত বছর সাজা হয়। এদিকে সমাজের ভয়ে সমাজ ছেড়ে অনেক দূর চলে যেতে হয় নূরজাহানদের পরিবারকে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে। কারণ নূরজাহান দোষ না করেও সমাজের কাছে দোষী। নূরজাহানের মায়ের উক্তিকে তা স্পষ্ট :

> 'তিনি জানতেন মেয়ের যা কলঙ্ক রটেছে, তাতে তার বিয়ে আর এদেশে দেওয়া চলবে না। আর, এ মিথ্যা বদনামের ভাগী হয়ে এদেশে থাকাও চলে না।'[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই সমাজ নিরিহ মানুষদের বিশেষ করে নারীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়। মিথ্যে কলঙ্ক নিয়ে চলে যেতে হয় দূরে কোথাও। অন্যদিকে সরদার জয়েন উদ্‌দীনের 'গোলাপীর সংসার' গল্পে ফুটে উঠেছে প্রতিবাদী নারীর উজ্জ্বলরূপ। গল্পাবর্তে দেখা যায়। গোলাপী ও তার স্বামী নিজামতের সাজান সংসার ছেরামত মাতব্বরের কুচক্রী ষড়যন্ত্রের ভেঙ্গে পড়ে এবং তাদের দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। তাইতো গোলাপীর কণ্ঠে শোনা যায় এক দ্রোহী নারীর সাহসী প্রতিবাদ :

> '....গোলাপী চোখ কান বুঁজে দিশেহারা হয়ে পাগলের মতো ছুটে চললো। সে ভাবলো দুনিয়ায় যারা জুলুম করে আর যারা জুলুম সয় এই দুটো জাতির আজ বোঝা পড়া হিসাব নিকাশের দিন এসেছে'
> অত্যাচারিত জাতি হয়ে আজ তাকে প্রথম এ জেহাদের উদ্বোধন করতে হবে, আর ছেরামত মাতব্বর, সে হবে তার প্রথম বধ্য।'[২৪]

এভাবেই নিঃশেষ হয়ে যাওয়া গ্রামীণ নারী রুখে দাঁড়ায় সমাজ শক্তির বিরুদ্ধে। বিদ্রোহী হয়ে জানায় চরম প্রতিবাদ। নারীর এ দ্রোহ লেখকের বাস্তব জীবনবাদেরই পরিচায়ক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নারীরা হারায় তাদের সন্তান, স্বামী, পিতা, ভাই। সবচেয়ে বেশি হারিয়ে ফেলেছে তার শরীর, তার সম্ভম। পুরুষ নারীকে দেখে মাংসল শরীর রূপে। যুদ্ধকালীণ কিংবা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সমাজের কাছে পুরুষের কাছে নারী থাকে একই অবয়বে। সেলিনা হোসেন তার 'দু রকম যুদ্ধ' গল্পে এরকম এক নারীর জীবনালেখ্য তুলে ধরেন। তাতে দেখা যায় নূরজাহান যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, পাক সেনা খতমের আপারেশনে যায়। পাকসেনারা ওর উপর অমানসিক নির্যাতন চালায়। তারপর লোহার রডের সাথে-

> 'ঝুলিয়ে রেখেছে উলঙ্গ শরীর। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে'[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধে নারীর উপর এই নির্যাতন যা আজও বন্ধ হয়নি। নারীরা পুরুষের সাথে সমান ভাবে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলেও নারী নির্যাতন কমেনি। ভিন্ন মাত্রায় তা সমাজের ভেতরে শক্ত শেকড় গেঁথে বেঁচে আছে। তাইতো তাঁর 'বাড়ি ফেড়া' গল্পে দেখা যায় পিতার সামনে থেকে টেনে হিচড়ে মেয়েকে নিয়ে ধর্ষণ করে কতিপয় ছেলে, এ দৃশ্য লেখক আকেঁন এভাবে-

> 'ইটের পাঁজরে আড়ালে ওরা ওরই শাড়ি দিয়ে ইটের সঙ্গে ওর দুহাত বেঁধে রাখে, তারপর একে একে..... কতোবার..... মেঘলা মনে করতে পারেনা। ও জ্ঞান হারায়'। আর পিতা আছিরুদ্দীন 'বসে থাকে। বসে না থেকে উপায় নেই। মৃত্যু ভয় নয়, ধর্ষণের দৃশ্যটি দেখার গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ও ছেলেগুলোর সামনে যেতে চায় না।'[২৬]

নুরজাহান কিংবা মেঘলা একই দৃশ্যপটের শিকার। এ শিকার নারীজীবন থেকে চিরতরে মুছে যায় না। যুদ্ধও থামাতে পারে না এ দৃশ্য। যুগ-যুগান্তর ধরে চলছে নারীর উপর এ দৃশ্য। পুরুষতান্ত্রিকতা নারীকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে। 'মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ' নামক গল্পে লায়লা সামাদ এমনই এক বৃত্তাবদ্ধ নারীর উপলব্ধি দেখিয়েছেন। গল্পের কথক মেয়েটি তার মায়ের জীবনের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া কষ্টগুলোকে তুলে আনেন। কথকের মা প্রথম স্বামী মারা গেলে বাচ্চাগুলো নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে সমাজের এবং জীবনের প্রয়োজনে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধাক্রান্ত প্রবল পুরুষ দ্বিতীয় স্বামী নানা নির্যাতন চালায় নারীটির উপর। পরবর্তীতে মা বাবার ছাড়াছাড়ি হলে কথক নারীটি অর্থাৎ মেয়েটি উপলব্ধি করেঃ

> 'ক্রমাগত টানাপেড়েন আর ঝড়ঝাপটা মায়ের জীবনীশক্তি অনেকটাই নিঃশোষিত করে দিয়েছে। আমার মা এখন আর কারো দাসী নয় মিথ্যে আভিজাত্য আর বংশ মর্যাদার অহঙ্কারে তাকে আর নির্যাতন করার কেউ নেই। আমরা সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।'[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েটি উপলব্ধি করে তার মা আজ স্বাধীন। পিতা বা পুরুষের মিথ্যে আভিজাত্যিক অহংকারের কালো থাবা নারীটিকে স্পর্শ করতে পারছে না। 'কাঁটাতার' গল্পে বাস্তব জগতের মর্মান্তিক দ্রোহ আর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা মিলে গল্পের নায়িকা কুন্তলার মনো বিকলন ঘটে। বাস্তব আবার পরাবাস্তবের মিলিত আবহে কুন্তলাকে ব্যক্তিক জীবন সঙ্কটের টানা-পোড়েন ফেলে দেয়। কুন্তলা প্রকৃতির ডাকে সারা দিয়ে গরে ফিরতেই 'চারটে অন্ধকার মানুষ' তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তারপর ধর্ষণের ফলে গর্ভপাত হয়ে যায়। তারপরও বাঁচার তাগিদে কুন্তলা ঘরের দিকে পা বাড়ায়। লেখকের ভাষায়:

> 'তরতর বেরোনো রক্ত পায়ের পাতা স্পর্শ করছে। আঠায় জড়াজড়ি দু'পা সামনে ফেলে হাঁটতে গিয়ে বারবারই সে হুমড়ি খায়। তার বড় আপন ঘর, পরিচিত বিছানার স্বপ্নে তাড়িত হয়ে এক তীব্র ঘোরের মধ্যেই কুন্তলা এগোয়। কী আশ্চর্য! ওই তো ঘর ? কুন্তলার অবদমিত আত্মা আবিষ্কারের পরিতৃপ্তিতে উন্মুখ হয়ে ওঠে..... দরজায় চিরদিনের অভ্যাসী পা বাড়াতেই, ক্ষীণাঙ্গী বৃদ্ধা বিশাল আকৃতি নিয়ে দরজার সমস্ত ফটো বন্ধ করে টানটান দাঁড়ায়।'[২৮]

সমাজে নারীর জীবন ঘরে বাইরে সর্বত্রই নিরাপত্তাহীন। যা একটি নারীকে শেকড়হীন করে দেয় তার পথ চলাকে। কুন্তলা জীবনের এই কষ্টের মাঝে ধর্মের আবরণে পথ খোঁজার চেষ্টা করেছে। নারীর জন্য রুদ্ধ হয়ে যায় সমস্ত জগৎ তাইতো কুন্তলার জীবনে চিরচেনা ঘরের দরজা ক্ষীণাঙ্গী বৃদ্ধা শাশুড়ি বিশাল আকৃতি নিয়ে দরজার সমস্ত ফুটো বন্ধ করে টানটান দাঁড়ায়। একটি নারী জীবন ঘরে-বাইরে পুরুষ এবং নারী উভয়ের সাথে নিরন্তর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হতে পারে লেখক এখানে প্রথাগত রূপরহস্যের মধ্যদিয়ে জীবন সংকটের বিচিত্রতা উন্মোচন করেছেন। 'দাহ' গল্পে নাসরীন জাহান সমাজের মেড়লদের ঘৃণ্য গ্রামীন রাজনীতি তুলে ধরেছেন। খা এবং তালুকদাররা পরস্পর আক্রমনাত্মক বিবাদে লিপ্ত হয়। এতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত

Dhaka University Institutional Repository

হয় ভূমিহীন তালুকদারদের কৃষক হাফিজ ও তার পরিবার। তালুকদারের ঘরে সার বেঁধে সাজান নতুন ধানের গাঁদায় কে বা কারা আগুন লাগিয়ে সব পুড়ে ফেলে সেই সাথে সেখানে উপস্থিত ঘুমুন্ত কৃষক হাফিজও পুড়ে যায়। এমন সময় হাফিজের বউয়ের ছোট ভাই এসে খবর দেয়- 'দুলাভাই, বুবুর পোলা অইছে' (পৃ: ৩৯)। আগুনে পুড়া যাওয়া হাফিজ খবর শুনে :

> 'হাফিজের চোখের সামনে একটা শিশু হামাগুড়ি দেয়। তার যুবতী বউ চোখের তারা নাচিয়ে হাসতে থাকে। হাফিজের বুকের কাছটায় সেই বউয়ের গরম নিঃশ্বাস এসে লাগে। পর মুহূর্তেই মৃত বিমর্ষতা ঢেকে যায়, সব রঙ সব ছায়। হাতের ফোলা জায়গায় মাছি বসেছে।'[২৯]

-লেখন এখানে হাফিজের অবচেতন মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে উন্মোচিত করে দেখিয়েছেন। বহির্বাস্তব আর চরিত্রগত অর্ন্তময় আতঙ্ক শিহরন মিলিয়ে কল্পনার জগতে হাফিজের অপূর্ন আকাঙ্খার রূপায়ণ ঘটে এভাবে। পুরুষতান্ত্রিক ছকের অদৃশ্য বলয়ে নারীর জীবনে ঘটে ছন্দপতন। হাফিজের মৃত্যুতে তার স্ত্রী আর সন্ত ানদের যে অপরিসীম দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তা লেখক সরাসরি উল্লেখ না করেও ঘটনার অনুসঙ্গ হিসাবে উপাস্থপন করেছন :

'বুবু আপনের এই মুখ দেখলে চিনতে পারব না, ডরাইব। অন্ধকারের অস্পষ্টতয় একটা দীর্ঘশ্বাস লুকায় হাফিজ, বাচ্চাটা যদি তাকে দেখে চিৎকার করে উঠে? এমন একটা ভাবনা হাফিজের মস্তিষ্ক এলোমেলো করে দেয়।' [৩০]

হাফিজের জীবনের এই যন্ত্রণা তার স্ত্রী সন্তানের জীবনেও প্রাণান্তকর এক দুঃখের হাতছানি প্রাত্যহিকতার সাথে মিশে যাবে। নারীর পরিসরে বাইরের দ্বন্দ্ব ধেয়ে আসে তারই জীবনে, তার একান্ত আপন গৃহে। লেখকের অন্য একটি গল্প 'বিকার' গল্পে দেখা যায়, শৈশবের একটি বীভৎস দৃশ্য গল্পের নায়ক মতিকে বিকারগ্রস্ত করে দেয়। সেই মতি একদিন বউয়ের তীল তীল করে জমন টাকা নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গাভী কিনতে যায় কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তারই সাইকেলের ধাক্কায় এক বৃদ্ধা মরে গেলে সেই টাকা বৃদ্ধার বিয়ের বয়সী মেয়ে দিয়ে বাড়ি আসতে হয়। তখন তার ভেতর ভীতিকর আতঙ্ক কাজ করে। বাস্তবতা আর অন্তর্দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে মতির দৃষ্টিকোণে ধরা দেয় স্ত্রীর কল্পিত অবয়ব:

' মনে হয় বউটি এখনই রাক্ষুসীর মুখ ধারণ করে বলবে- আমার বাচ্চার দুধ দ্যান, আমি শরীরের রক্ত পানি কইরা কত দিনে তিল তিল কইরা টাকাগুলি জমাইছি। আপনি আমার অক্ষম স্বামী, আপনি আমার একটা আশাও মিটাইতে পারলেন না। বিয়ের পর মতি তাহেরার সোনার দুলগুলো বিক্রি করে ফেলেছিল। বিয়ের আগে ঋণ ছিল। ঋণদাতা এক রকম তার গলায়ই পা দিয়ে বসেছিল। তাহেরাকে না জানিয়ে সে ওইগুলো বিক্রি করে মুক্ত হয়েছিল। এরপর থেকে খালি কাঁদত তাহেরা। এবং সে সময় থেকেই সে তার স্বামীর প্রতি আস্থা তো অনেক আগেই হারিয়েছে-ভালোবাসাও অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে। এরপর থেকে তাহেরা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রূপালি ঝিলিক তুলে হাসে নি। বিয়ের প্রথম প্রথম যেমন হাসত। মতির তখন মনে হতো মেয়েরা হয়তো স্বামীর চেয়ে গয়নাকেই বেশি ভালবাসে।'[৩১]

- এখানে পুরুষের দৃষ্টিতে একটি নারী কিভাবে ধরা পড়ে তার চিত্র লেখন তুলে ধরেছেন। এরপরও একজন বিকারগ্রস্ত পুরুষও সমাজে নারীর চেয়ে কত বেশী দাপট রাখে তারই প্রকাশ দেখা যায়। মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে বিচলিত মতি স্ত্রী তাহেরার পা চেপে ধরে চিৎকার দিলে বাচ্চাসহ তাহেরার ঘুম ভেঙ্গে যায় তখন স্ত্রী 'আল্লার একখান মরদ বানাইছিল' বললে মতি রেগে বলে ওঠে:

'চুপ কর হারামজাদি। হঠাৎ মিশ্র অনুভূতির ধাক্কায় ক্ষেপে উঠে মতি। বেশি লাই পায়া গেছস। এই মরদের গা চাইট্যাই তো খাইতাছস।'[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে সব পুরুষদের ভেতরই এমন সচেতন দৃঢ়তার প্রকাশ পাওয়া যায়। তাদের 'পৌরুষের কোথায় যেন খট করে লেগে যায় (পৃঃ ৩৯)' নারীর অবজ্ঞাময় ব্যাঙ্গোক্তিক তাদের সহ্য হয় না। নারী তাই পুরুষের 'পৌরুষের' ভয়ে সত্যকথাও বলতে দ্বিধান্বিত থাকে। 'মহীলতা' গল্পে পূরবী বসু পরিবারের ভেতর নারী বা মেয়েকে কি দৃষ্টিতে দেখে তাই তুলে ধরেছেন। গৃহকর্তা শামসের আলী নিউ ইউর্কের ম্যানহাটানে বসে মেয়েকে পড়াবার জন্য শিক্ষক খুঁজতে গিয়েও ধর্মীয় মানসিকতাকে পরিহার করতে পারেনি। তার মনে হয়েছে একই ধর্মের ছেলের কাছে পড়াতে দিলে মেয়েকে নিয়ে চলে যাবে সেই ছেলে। তার ভাষায়: 'বুঝলা বাবা, অনেক ভাইব্যা চিন্তাই তোমারে কাজটা দিলাম। তোমাগো কাছে মাইয়ারে পড়ইতে দিয়া যেইরকম নিশ্চিন্তে থাকতে পারুম, জাত ভাইয়ের কাছে দিয়া পারুম না। পড়াইতে আইস্যা মাইয়াকে লইয়াই ভাইগ্যা গেল আর কি? বুঝলা না? হের লেইগ্যাই তো। তা নাইলে কত পোলারা আইল, বেবাকরেই না কইরা দিলাম।'[৩৩] অর্থাৎ বিধর্মী ছেলের কাছে মেয়েকে পড়াতে দিলে তার মতো মেয়ের মধ্যে হৃদয় ঘটিত কিছু ঘটবে না। এখানে গৃহকর্তা ধর্মীয় আবরণে মেয়ের হৃদয়কে সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু গল্পের আবর্তনে দেখা যায়, মেয়ে রাবেয়া নিজেই গল্পের কথক মাষ্টারকে পছন্দ করে বসে আছে। তাই সে অবলীলা বলে বসে 'শুক্রবার আর রবিবার অবশ্য এখনও খারাপ লাগে। আপনি আসেন না তাই।'- মেয়ের মনের এই খবর মেয়ের পিতা শামসের আলীর রাখা সম্ভব হয়নি। পাপড়ী রহমানের একটি গল্প 'হলুদ মেয়ের সীমান্ত'। এখানে দেখা যায় পরিবারের দুর্দিনে মেয়েরা কতখানি উদয়াস্ত পরিশ্রম করে তবুও পুরুষদের কোনো সমবেদনার বিকার নেই। গল্পের একটি চরিত্র হিরামনের উক্তিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে:

> 'এদিকে হিরামনের মাথায় অন্য চিন্তা। দিবারাত্র সংসারের ঘানি টানার পরও দুলাল মিয়ার বর্বরোচিত নির্যাতন। উপার্জন বন্ধ হলে তার উপায় কী হবে? মালতি, রূপবানু, কলির মা চোখেমুখে আন্ধার দ্যাখে।'[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

রূপবানুরা একটি শিশু গাছের নিচে বসে পসরা সাজিয়ে তা বিক্রি করে যা আয় হয় তা-ই দিয়ে তাদের সংসার চলত। তাতে বাধ সাথে গ্রামেরই চেয়ারম্যান। সে হুকুম দিয়েছে শিমু গাছের নিচে বসা যাবেনা। এসব আতঙ্কের মাঝেও নারীদের পথ চলতে হয় জীবনেরই তাগিদে। বেঁচে থাকার আশায়। 'সূর্য উঠে' গল্পে রাজিয়া মজিদ দেখিয়েছেন একজন অসুস্থ নিঃসঙ্গ মানুষ কিভাবে জীবনের দুঃখ, কষ্টের মাঝে তাকে দূর দেশের একটি চিঠি সজীব আর সতেজ করে তুলতে পারে। গল্পের কথকের বন্ধু ডেভিড কথককে সেদেশে যাবার জন্য আমন্ত্রণ পাঠায়। তাতে ছিল সেদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা। চিঠি পেয়ে কথকের মুগ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি হলো:

> 'রোগ শয্যায় ডেভিডের চিঠি মার যন্ত্রণাকে অনেক লাঘব করেছে। এক অভূতপূর্ব বিশ্বাসে পরিণত করেছে আমার চেতনাকে।'[৩৫]

একটি চিঠি কথকে কতখানি শান্তি দিয়েছিল। তার জীবন-বিশ্বাসে উৎসাহ যুগিয়েছিল তার চিত্র পাওয়া যায়। 'চাকা' গল্পে রাজিয়া মজিদ দেখিয়েছেন যে, স্বার্থ পর আর নিষ্ঠুর পুরুষের যন্ত্রণায় নীল হয়ে গল্পের নায়িকা তামান্নার পথ চলার দৃশ্য। তামান্না ভালোবেসেছিল ডা. মামুনকে। কিন্তু সে ভালোবাসার মূল্য সে না দিয়ে অন্য একটি মেয়ে লিসাকে বিয়ে করে। বিপর্যস্ত পথ চলতে চলতে তামান্না একদিন গল্প শুনে এক রিক্সাওয়ালার, যার জীবনটাও ঠিক ওরই মত। এখানে দেখা যায়- ধনী বা গরীব শ্রেণীর মধ্যেই নির্যাতনের পথ সংকীর্ণ থাকে না। তাই রিক্সাওয়ালা যখন বলেছিল তার প্রেমিকা পিয়ারা শাড়ী গয়নার লোভে অন্যত্র বিয়ে করেছে তখন তারও মনে পড়ে যায় মামুনও ঠিক এমন করেই টাকার লোভে লিসাকে বিয়ে করেছে। তামান্না তাই আক্ষেপ করে বলেছে-

> 'পুরুষরা আরো বেশী চায় টাকার সংগে কিছু নগদ সুখ।' কারণ, 'হাসপাতালের ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে নার্স লিসা মামুনকে দিয়েছে অনেক সংগ। দিয়েছে রহস্যময় দেহতত্ত্বের বাস্তব সুখ আর দিয়েছে পাউন্ডের উপহার।'[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

এত কিছুর প্রাপ্তিতে মামুন ভুলেগেছে তামান্নাকে। নারী এভাবেই ঘরে-বাইরে পুরুষের স্বার্থের জৌলুসে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। 'ক্রসিং' গল্পে দেখা যায় নীলা আর ফয়সালের দাম্পত্য জীবনে একদিন ঘুরতে গিয়ে নীলা যখন ফয়সালের হাত ধরলো তখন সে নীলাকে তাড়াতাড়ি নরম আলিঙ্গনে জড়াতে চাইল এমন সময় তার পাশ দিয়ে একটা রিকশা ক্রস করে। তাতে বসা ছিল 'ঝলমলে এক তরণী'। -তখন কথক দেখলো যে,

> 'কার্বন লিপ্ত ঘোলাবাতাসে রিকশা পাশে পাশে তরুণীর মুখের হলোগ্রাম। নীলার শরীর জড়িয়ে রাখা আমার হাত কখন ঢিলা হয়ে এসেছে টের পাইনি। টের পাই-নীলা যখন ভ্রু-তে ফণা তুলে বলে- কে? তোমার চেনা নাকি? আমার চোখে আর একটি ঝলক। এরপর মেয়েটি। ক্রসিং ছুটে যায়।'[৩৭]

এখানে দেখা যায় পুরুষটি উন্মুখ হয়ে থাকে অন্য নারীর ঝলকের প্রতীক্ষায়। পাশে বসা স্ত্রীকে ধরা হাত অন্য মেয়ের চলার পথ দেখতে দেখতে আলগা হয়ে যায় যা যে উপলব্ধি করতে পারে না। এখানে বুঝা যায় মেয়েটির জীবন কিভাবে গৃহ ও বাইরের দ্বন্দ্বে এক চক্রাকার ধাঁধায় পড়ে যায়। মকবুলা মনজুর তার 'তুফান' গল্পে গ্রাম্য রাজনীতিতে কিভাবে খুনের ঘটনা ঘটে এবং তাতে পরিবারের নারীদেরকে কতটা যন্ত্রণাময় সময় পার করতে হয় তার চিত্র তুলে ধরেছেন। এখানে দেখা যায় গল্পের কথক তুফানের পিতা কছির উদ্দিনকে গ্রামের মাতাব্বর আনোয়ার শেখ তার প্রতিপক্ষকে খুন করতে বাধ্য করে। এরপর কছিরউদ্দিনের মা বউ আনোয়ার শেখের বাড়ী কাজ করে দিন যাপন করে। কিন্তু যখন তুফান বড় হলো তখন তাকে আনোয়ার শেখের মা কাজ করতে বললে তুফান ক্ষেপে বলে উঠে:

> 'কামলা লাগুম ক্যান? আমাগো দুই ভাইয়েরে লেখা পড়া শিখায় মানুষ কইরা দেওনের কথা আনু চাচার। ঠিকানা দ্যাস, আমি তারে সে কথ জিগামু। আসমা বিবি ভেংচে ওঠেন, মানুষ কইরা দিব! ক্যান ধান পান দেই নাই

Dhaka University Institutional Repository

তগো? খাইয়া ডাংগর হস নাই? আবার কি মানুষ হবি? শয়তান জানি কনেকার। - গাইল দিয়েন না বড় বিবিজান। বুজীরে খরচা পাতি কইরা বিয়া দিতে পারে নাই মায়ে। সেজন্য শ্বশুর বাড়ীতে দিন রাইত লাথথি ঝাঁটা খাইয়া গলায় ফাঁস দিয়া মরলো আমিনা বুজি। আনু চাচায় কইছিলো বুজীর বিয়ার খরচা দিবো, বাজানের নামে তিন কানি জমি লেইখা দিবো। তার মুখের কথায় বিশ্বাস কইরা এতবড় কামখান বাজান নিজের জান বদলা রাইখা করলো, এহন সেই সব কথা গেল কই?'[৩৮]

দিন বদলের হাওয়া এভাবে তুফানরা এখন বলতে পারে 'পাই নাই কিছুই এখন পাইতে চাই'। গ্রামীণ এই রাজনীতির প্রভাবে পরিবারের নারীদের উপর যে নির্যাতন হয় তা নারীকে পথ চলায় করে ক্ষত-বিক্ষত।

একজন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসো যার চিত্রের প্রধান অনুধ্যান ছিল নারী। নারীর জীবন যৌবন, নারী হৃদয়ের বিচিত্র বিন্যাস তিনি পরিমাপ করতেন রেখা চিত্রের মাধ্যমে। নারী-মানসের আবেগ ও স্বপ্নের রঙিন রেখা নানামুখি উপস্থাপনায় উপস্থাপিত হয়েছে যুগে যুগে। ছোটগাল্পিকগণও তাদের ছোটগল্পে নানাভাবে তুলে এনেছেন নারীর প্রতীকী। তাদের লেখায় নারী জীবনের চাওয়া-পাওয়া নিবন্ধিত হতে থাকে বিচিত্র বুননে। সমাজে নারী শুধু শোষণেরই শিকার হয়। সেটা আর্থ-সামাজিক পারিবারিক সব ক্ষেত্রেই। অনেক সময় নারী মানবিক অধিকার প্রত্যাশী হয়ে স্বাধিকারের চেতনায় হয় উজ্জীবিত। যদিও নারীর মানবিক গুণগুলোকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ স্বীকার করতে চায়না।

কখনো কখনো সমাজে প্রচলিত কিছু ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধেও নারীর দ্বন্দ্ব হতে পারে। বর্তমান যুগে অনেক নারীই কর্ম ক্ষেত্রে এসেছে। তাদেরকে পোহাতে হয় ঘরে-বাইরে উভয় জায়গায়ই দ্বন্দ্ব সংঘাতের সরব বা নিরব বাণী। গৃহে কর্তাব্যক্তিটি তার আধিপত্য ধরে রাখতে বদ্ধ পরিকর। অন্যদিকে বাইরের কঠিন বাস্তব জগৎ

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে পুরুষের পাশা-পাশি সমান অধিকার নিয়েই কাজ করতে হয় নারীদের। সুতরাং দ্বন্দ্বতো নারীর জন্য অনিবার্য এক পাঠ। বিংশ শতকের আধুনিক ও উন্নত জীবনের আশায় অনেক নারীই ঘরের বাইরে কর্মক্ষেত্রে এসছে। একজন কর্মজীবী নারীকে তাই সামলে নিতে হচ্ছে তার পারিবারিক জীবন অন্যদিকে তার কর্মজীবন। এই দুয়ের টানাপোড়েনে অনেক সময় তাকে হতে হয় ক্ষত-বিশ্বত শিকার হতে হয় নানা সামাজিক নির্যাতনের। কর্মময় নারী-জীবন ঘরে কিংবা বাহিরে পদে পদে তাকে বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। অর্থাৎ নারী জীবন ঘর কিংবা বাহির কোথাও সহজ নয়। পুরুষতন্ত্রিক এ সমাজ গভীরতা কতটুকু তাই ছোটগাল্পিকদের গল্পে প্রতিভাত হচ্ছে।

তথ্যপঞ্জি

১. ফারজানা সিদ্দিকা, শিক্ষিত নারীর মাথার ভেতর ভিন্ন রকম ভায়োলেন্স, নাগরিক উদ্যোগ বার্তা, চতুর্থ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, অক্টো-ডিসে-২০০৪, পৃ- ৬

২. দিলারা হাশেম, দিনযায় রাত আসে, গল্প সমগ্র মাওলা ব্রাদার্শ পৃ- ৪৫

৩. হেলেনা খান, বিসর্পিল, বৃষ্টি যখন নামল পৃ- ৩১

৪. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩১

৫. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, প্রচ্ছন্ন অনল, গল্প সমগ্র, ফেব্রুয়ারী-২০০২, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, পৃ-১৬২

৬. হেলেনা খান, অনাহূত ইচ্ছা, বৃষ্টি যখন নামল পৃ- ৬৭

৭. প্রাগুক্ত, সূর্যোদয়, কারাগারের ভেতরে ও বাইরে, পৃ- ২৬

Dhaka University Institutional Repository

৮. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৫

৯. প্রাগুক্ত, ধূপছায়া, কালের পুতুল, পৃ- ২৫

১০. প্রাগুক্ত, স্ফুলিঙ্গ, ফসলের মাঠ বুক ভিলা, ঢাকা-অক্টো-১৯৮ পৃ- ৪৯

১১. প্রাগুক্ত, সাগর শুকায়ে যায়, পৃ- ১৭

১২. প্রাগুক্ত, পৃ- ২০

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ- ২২

১৪. আকিমুন রহমান, নিরেট সত্য অথবা প্রতিভাসের গল্প, জীবনের পুরোনো বৃত্তান্ত, ফেব্রুয়ারী-২০০৭, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা। পৃ- ০৯,

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ-১০

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ-১২

১৭. রাবেয়া খাতুন, মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, ফেব্রু-১৯৮৬, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ- ৩১

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫

২০. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫

২১. মকবুলা মনজুর, নক্ষত্রের তলে, পল্লব পাবলিশার্স ১৯৮৯, পৃ-৩৬

২২. প্রাগুক্ত, পৃ-৩১

২৩. কাজী নজরুল ইসলাম অগ্নি-গিরি, রিক্তের বেদন নজরুল রচনা সম্ভার, পৃ-৪৬৮

Dhaka University Institutional Repository

২৪. সরদার জয়েন উদ্দিন, গোলাপীর সংসার, বীরকণ্ঠীর বিয়ে, ১ম সং বৈশাখ ১৩৬২, প্রকাশক আজিজুর রহমান চৌধুরী, কোহিনুর, লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃ-৬১

২৫. সেলিনা হোসেন, দু রকম যুদ্ধ, অনূঢ়া পূর্ণিমা, গল্প সমগ্র, ফেব্রুয়ারী-২০০২, সময় প্রকাশন, পৃ-৩৫৪

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫৬

২৭. লায়লা সামাদ, মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ, পৃ-৩৮

২৮. নাসরীন জাহান, কাঁটাতার, নির্বাচিত গল্প, পৃ-৬২-৬৩

২৯. প্রাগুক্ত, দাহ, নির্বাচিত গল্প, পৃঃ৩৯

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৫

৩১. প্রাগুক্ত, বিকার, বিচূর্ণ ছায়া, পৃঃ ৪০

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪

৩৩. পূরবী বসু, মহীলতা, নিরুদ্ধ সমীরণ, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৬, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ-২৬

৩৪. পাপড়ি রহমান, হলুদ মেয়ের সীমান্ত, হলুদ মেয়ের সীমান্ত, ফেব্রু'-২০০১, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ-৭১-৭২

৩৫. রাজিয়া মজিদ, সূর্য ওঠে, ভালবাসার সে মেয়েটি, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৫, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ-৭২

৩৬. প্রাগুক্ত, চাকা, পৃ-৭৫

৩৭. ঝর্ণা রহমান, ক্রসিং, অগ্নিতা, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ফেব্রু-২০০৪

৩৮. মকবুলা মনজুর, তুফান,শুকনেরা সবখানে, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৮, চিশতিয়া আর্ট প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ-১৬

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে মহিলা ছোটগল্পকারদের গল্পে নারীর আর্থ-সামাজিক জীবন

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্বাধীন ভূখন্ডে-স্বাধীনভাবেই বর্তমান সময়ে নারীরা পথ চলতে শুরু করেছে। তাদের নিজস্ব মতামত রাখার অধিকার ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও প্রকাশ করতে পারছে। নারী কোথায় কতটুকু বঞ্চিত হচ্ছে তা তারা বুঝতে শিখছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশেষ করে পরিবর্তিত সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থানকে এখন আগের যে কোন সময়ের তুলনায় আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। মহিলা ছোটগল্পকারদের গল্পে নারীর এই আর্থ-সামাজিক জীবনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বর্তমানের প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

বর্তমানযুগে তথ্যের আদান প্রদান নারীর জীবনে এনেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। নারীর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে জীবনযাত্রায় এসেছে বিস্তর পরিবর্তন। উন্মোচিত হচ্ছে নতুন পরিসরে নতুন নতুন নানা ভাবনার পূর্ণতা। যা তাদের দৈনন্দিন জীবনে এক শক্তিশালী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। পারিবারিক-আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান এবং ক্ষমতায়ন সম্পর্কে নারীদের ধারণার নব দিগন্ত উন্মাচিত রয়েছে। জীবন-যাপনে নারীরা হচ্ছেন সচেতন ও সক্রিয় যা তাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। নারী-জীবনের এই যে, চেতনাগত পরিবর্তন-পরিমার্জন এগুলো বাংলাদেশের মহিলা লেখিকাদের লেখনিতে নানা বর্ণিল প্রত্যাশায় উপস্থাপিত হয়েছে। তাদের লেখায় নারীর প্রাত্যহিক জীবন যাপন উদ্ভাসিত হয়েছে বৈচিত্রময় পরিচর্যায়। বাংলাদেশের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এখন অনেক নারীই অফিসে কর্তা বা কর্মী হিসেবে কাজ করেন। আইনজীবি, চিকিৎসক, শিক্ষক, পাইলট অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিচরণ করেন। নিষ্ঠার সাথে দায়িত্বপালন করেন তারা। প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় অবদান রাখেন। নারীরা শিক্ষিত হয়ে এত কিছু অর্জন করলেও এখনও নারীরা ব্যাপকভাবে বৈষম্যের শিকার হন। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, পুরুষতান্ত্রিক মন-মানসিকতা নারীর জীবন পরিধিকে করে দেয় অবগুণ্ঠিত সংকীর্ণ নারী, পুরুষের পাশাপাশি কর্মে অংশগ্রহণ করতে পারলেও ন্যায্য অধিকার তারা

Dhaka University Institutional Repository

পায়না, জীবনের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে পুরুষের হাতে। নারীর প্রতি সকল ধরনের শাসন-শোষণ বা বৈষম্যের অবসান তখনই হবে যখন নারীকে তার প্রাপ্য ক্ষমতায়ন করা যাবে। যদিও আমাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি'র ১০ (দশ) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

> 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।'[১]

সংবিধানের 'তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকার' অংশের ২৮নং অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় উপানুচ্ছেদেও একই কথা বলা হয়,

> 'রাষ্ট্র ও গণ জীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।'[২]

সংবিধানে নারীর জন্য কিছু আইন তৈরী হলেও তথাপি কিছু আইনি ফাঁক রাষ্ট্রই রেখে যান। নারীদেরকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার দেয় না। এখানে নারীকে পুরুষের অধিনস্থ করতেই ধর্মীয় আইনী বেড়াজালে ফেলা হয় নারীকে।

> 'সংবিধানে এই সমঅধিকারের স্বীকৃতি সত্ত্বেও পারিবারিক আইন তথা বিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকার স্বত্বের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য রয়েছে। নারীকে অন্যের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিতে পরিনত করা হয়েছে। নারী কিন্তু সন্তানের অভিভাবকত্ব কখনো পায় না, ৭ বছর পর্যন্ত দেখাশোনা করতে পারে মাত্র। এখানে আশ্চর্যজনক ঘটনা হল, নারীকে সন্তানের হেফাজতের দায়িত্ব দেওয়া হল অথচ অভিভাবকত্ব দেওয়া হল না, সন্তান কোথায় থাকবে, কোন স্কুলে পড়াশুনা করবে সবকিছু ঠিক করে দেবে বাবা। অর্থাৎ Person ও property র ওপর তারই পুরো কর্তৃত্ব রয়েছে।'[৩]

Dhaka University Institutional Repository

নারীরা পরিবার থেকে সমাজে, সমাজ থেকে রাষ্ট্রে এভাবেই বঞ্চিত হচ্ছে, হচ্ছে নির্যাতিত। আইন নারীকে এরকম ভাবেই পুরুষ আদিপত্যের কাছে মাথানত করে রাখিয়েছে। আধুনিক নারীরা বঞ্চিত হতে হতে এখন অবশ্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এটা বিশ্বব্যাপী একটি আশার আলো। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এভাবেই নারীকে সমৃদ্ধ করবে। নাজমা জেসমিন চৌধুরীর লেখায় এরই প্রকাশ দেখা যায়। তাঁর 'অন্য নায়ক' গল্পের নায়িকা রিনি চিন্তা-চেতনায় এবং প্রকাশ ভঙ্গিতে ভীষণ স্মার্ট। আমেরিকা প্রবাসী ডাক্তার পাত্র আসিফ যিনি বাংলাদেশের কুমারী মেয়েদের মায়েদের কাছে খুব দামী, সেই আসিফ রিনিকে বিয়ে করতে চাইলে নির্দ্বিধায় রিনি বলে উঠতে পারে-'আমি এখন বিয়ে করবো না।' এই যে তার সাবলীল স্বপ্রকাশ তাতে তার একটি নিজস্ব ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এ কথায় ক্রুদ্ধ আসিফ যখন প্রশ্ন করে 'এদেশের মেয়ে হয়ে একথা ভাবতে পারলে'। তখন রিনি শান্ত কিন্তু প্রত্যয়ী এক জবাব দেয়-

'এদেশের মেয়েরা এখন অনেক কথা ভাবছে যা তোমাদের ভাবনায় নেই।'[৪]

পরিবর্তিত সমাজ-চেতনা নারীকে অনেকখানি আত্মপ্রত্যয়ী করেছে। যে কারণে নারীরা অনেকদুর ভাবতে শিখেছে। তাদের নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করতে পারছে। লেখিকার 'পরের ঘর' গল্পেও দেখি, বলিষ্ঠ মনের অধিকারী একটি মেয়ে। যে খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারছে তার চারপাশ। বিয়ের আসরে বসেও তাই ওর মনে পড়ছে,

'সামনে অনার্সের ফল ঝুলছে। প্রথম শ্রেণী পাব তো?'[৫]

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার ছোঁয়া নারীর জীবনেও লেগেছে। হেলেনা খানের 'মানদন্ড' গল্পে দেখি রায়হান খান অফিসের বড় কর্তা হয়ে ঘুষ খেয়ে সমাজের উপরের স্তরে উঠার আপ্রাণ চেষ্টায় মগ্ন। এতে সাহায্যকারী হিসেবে স্ত্রী জেরিনের অবদানও কম নয়। তাই রায়হান সাহেব যখন

Dhaka University Institutional Repository

বলে 'অফিসের বড় কর্তা হয়ে একেবারে সরাসরি'- তখন সে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করে-

> 'সরাসরি কেন ? কায়দা মাফিক বাড়িতে ডেকে পাঠাবে, আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। দেখ আমি কিভাবে সব ম্যানেজ করে নিই। রায়হান পূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর প্রতি তাকাল। জেরিনের চাহনিটা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ। হ্যাঁ, রায়হান স্ত্রীর ওপর আস্থাশীল হতে পারে।'[৬]

পুরুষাধিপত্য চেতনা এখানে নারীর উপর আস্থা রাখতে সন্দিগ্ধ তবুও পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীরা আজ তাদের মনের ভাবনা প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে। 'হলুদ মেয়ের সীমান্ত' গল্প গ্রন্থের 'শ্যাওলা রেখেছে জমা রৌদ্র ও শিশির' গল্পে কুমু যখন টের পেল সে চতুর্থবারের মত মা হতে যাচ্ছে তখন খুশী হতে পারেনি তার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট মনে করে। ফেরিওয়ালা স্বামী যখন তৃতীয় সন্তান বুলু হওয়ার সময় বলছিল-

> 'ভোদ্দাই মাইয়ানুক-খাওন জোটাতে না পারলি বিয়োস কোন লাজে' ? তখন কুসুই উত্তর দেয়-'মুই কি মরয়ম বিবি হলাম নিহি ? এমুন কর‍্যা কয়্যা যান যেন নিত্যি এলকা এলকা পেট বাধাই থুছি।'[৭]

এতে আনুর বাপ খুশি না হয়ে বলে-

> 'মাইয়ানুক পত্যি ফলন দিলে সংসার রসাতলে যায়।' এ কথা শুনে কুমুও ঝাঁঝিয়ে ওঠে বলে,
>
> 'মোরে পত্যি ওয়াজ শুনায় কোন ফায়দা ? বন্দোবস্ত কি খালি মাইয়ানুকের জন্য বরাদ্ধ করা আছে। ছেলাপেলা যুদি মাতার বিষ তো আপনে খাসি করায়া আসেননা ক্যান!'[৮]

Dhaka University Institutional Repository

কুমুর এই উত্তরে তার পুরুষ স্বামীটি সুন্দর উত্তর দেয় অর্থাৎ সে বাচ্চা না হওয়ার বন্দোবস্ত করে 'খুতা' হতে চায়না-

-'মাগী কয় কি! মুই খাসি করালে তো জন্মের খুতা হবো। মুই চাইলে ও তো আর বাপ হবার পাবো না।'

-বাপ হওনের লালচ মর‍্যা যায় নাইতো মোরে বন্দোবস্ত নিতে কছেন ক্যান ? মুইক খুতা করি দশ দুয়ারে বাপ বনতি আপনের সুবিধা হবে বল্যা?'[৯]

পুরুষ তান্ত্রিকতা সমাজের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। এখানে পুরুষটি তার পৌরুষত্বকে ঠিক রেখে সে স্ত্রীকে দিয়ে বাচ্চা না হওয়ার কাজটি কৌশলে করাতে চেয়েছিল। সেলিনা হোসেনের 'লিপিকার বিয়ে এবং অত:পর' গল্পেও দেখা যায় পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য বিস্তারের উলঙ্গ প্রকাশ। লিপিকা বিয়ের পরে বাচ্চা নেবে কি নেবেনা তা যখন বল্ল-'বিষয়টা দুজনেরই ইচ্ছে-আনিচ্ছের ব্যাপার' তখন আফসার অবাক হয়ে যায় এবং জেদের সঙ্গে বলে ওঠে-'জেনে রাখো বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেবো আমি।' স্বামীত্বের অহং আর আধিপত্যবোধ এখানে আফসারের মধ্যে ভীষণভাবে প্রকাশ পায় অকারণ ক্ষমতা প্রদর্শনে আফসার হয়ে ওঠে অনমনীয়। লিপিকাও আধুনিক মনের অধিকারী এক মেয়ে। যে সনাতনী নিয়ম-নীতিকে তোয়াক্কা করেনা। তাইতো সে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে পারে নিজস্ব মতামত। আফসার যখন বলে :

'সমান অধিকার কি করে হবে ?

রোজগার তো আমি করছি, আমি কর্তা, আমার কথা তোমার শুনতে হবে।

-যদি তাই হয় তাহলে আমারও রোজগার আছে।

-তাই নাকি ? কেমন রোজগার?

...লিপিকা নিজের নগ্নদেহ আফসারের সামনে বাড়িয়ে ধরে বলে, আমার শরীর বিক্রি করবো তোমার কাছে।'[১০]

Dhaka University Institutional Repository

লিপিকার এ দুঃসাহসিক উচ্চারণ লেখিকার মন-মননের এক সাহসী প্রকাশ। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী এখন অনেক অহংবোধ সম্পন্ন এবং অধিকার সচেতন। 'নারীর ব্যক্তিত্ব পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের কাছে শুধুই কল্পনার বিষয় হলেও নারীর কাছে তা নয়। লিবারেল নারীবাদ এটাই দাবি করে যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীকে পরনির্ভর করে রেখে নারীর ব্যক্তিসত্তা বা আমিত্ব গঠনে বাধার সৃষ্টি করেছে। নারী যদি সুযোগ পায় তাহলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। সেজন্য লিবারেল নারীবাদ নারী মুক্তির কথা বলে। এই নারীবাদ মেধার ক্ষেত্রে, ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতার উপরে গুরুত্ব আরোপ করে। 'লিপিকার বিয়ে এবং অতঃপর' গল্পটি লিবারেল নারীবাদের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। লিপিকা খুবই স্বাধীনচেতা একটি মেয়ে যে আত্ম পরিচয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। নারীর স্বাতন্ত্র বজায় রেখে সংসার ধর্ম পালন করতে চায় লিপিকা। প্রচলিত ছকবাঁধা নারীত্বের গণ্ডি ভেঙে দিতে চাইছে লিপিকা, তাই সব কিছুতে স্বামীর পাশে সম-অধিকার দাবি করে- লেখাপড়া, ক্যারিয়র, ব্যক্তিত্ব অর্জন, প্রতিষ্ঠা লাভ সবকিছুতে। লিপিকা আধুনিক এক নারী। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে নারী মুক্তির জাগরণ এসেছিল লিপিকা তারই প্রতিনিধি। সত্তরের দশকে নারী মুক্তি আন্দোলনের ভিত্তি ছিল লিবারেল নারীবাদ। নারী পুরুষ সমতাকে সামাজিক ন্যায়ের একটি অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল ওই সময়। সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি যে বৈষম্য রয়েছে তা মুছে ফেলতে হলে নারীর মাঝে স্বসত্তা (আমিত্ব) সম্বন্ধে জাগরণ তুলতে হবে। এ জাগরণ নারীকে পুরুষের মতো 'মানুষ' হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ দিয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তা নারীর আত্মোপলব্ধি ঘটানোর প্রক্রিয়া থেকেই আমরা জ্ঞাত হই। সেলিনা হোসেনের এই গল্পটি সত্তরের দশকের লিবারেল নারীবাদের চেতনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।'[১১] 'নদোত্রলো বান' গল্পে সেলিনা হোসেন একটি নিম্ন শ্রেণীর মেয়ের মধ্যে নারীবাদী অনেক ভাবনার জন্ম দিয়েছেন এভাবে,-

Dhaka University Institutional Repository

'ক্ষত থেকে গলগলিয়ে বেরিয়ে আসে রক্ত মেশানো ভাবনা। জীবন কি ? সংগ্রাম কি ? সর্বনাশ কি ? সতীত্ব কি ? ভাবতে ভাবতে টাপারার বুক উজার হয়ে যায়-বুক খালি হয়ে যায় দীর্ঘশ্বাসের হু হু বাতাস ওকে ব্যথিত করে রাখে। ...ওর প্রচণ্ড কোলাহলময় জীবন আছে, জেদ আছে, বেপরোয়া হয়ে ওঠার সাহস আছে।'[১২]

অনেক ভাবনা তাকে বেপরোয়া করে। সমাজে একটি প্রচলিত বিশ্বাস 'মেয়েরা সব সময় পিতা স্বামী বা পুত্রের উপর নির্ভরশীল' এই বিশ্বাস বা এ জাতীয় কুসংস্কার রোধে নারী পুরুষ উভয়কেই সচেতন হতে হবে ছোটগল্পের ধারায় পূর্বসূরী লেখক আবু ইসহাকের 'কানাভূলা' গল্পে দেখা যায়, সংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন হওয়ার দিক নির্দেশ। গল্পে সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তীব্র ভাষায় চিত্রায়িত হয়েছে। ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাস থেকে সমাজে মানুষের মধ্যে পীর-ফকিরদের প্রতি দুর্বার এক দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। 'কানাভুলা' গল্পে এর বিরোধিতা দেখিয়েছেন লেখক খুব কৌশুলী হয়ে। এই কুসংস্কারে অগ্রগামী ছিল সমাজে নারীরাই বেশি। তাইতো গল্পে যখন দেখি রিক্সা চালক জাহিদকে তার প্রসবরতা স্ত্রীর জন্য তার মা পীরের পড়া পানি আনতে বললেন পীরের বাড়ি যায় পানি আনতে। তখন জাহিদ পীরের কথা শুনে দ্বিধায় পড়ে যায়। একটি লোকের কাশতে বমির সাথে রক্ত পড়ে শুনে শুকরিয়া জানিয়ে পীর বল্ল যে,

'ব্যারাম যখন দুই ভাগ হইয়া গেছে, তখন তার জোড়ও কইমা গেছে ইনশাল্লাহ।'[১৩]

পীরের মুখে এ কথা শুনে জাহিদ তার মাইনর স্কুলে পড়ার সময় বইয়ের কথার সাথে মিল খুজে পায় না তখন পীর সাহেবের কথাগুলো জাহিদের মধ্যে কেবলই জটলা পাকাতে শুরু করে। এমন সময় জাহিদ পীরের মেয়ের সন্তান হওয়ার সংবাদ শুনল এবং পীরের বাড়ির পেছন দরজা মহকুমা দিয়ে শহরের লেডি

Dhaka University Institutional Repository

ডাক্তার আর নার্সকে বেরিয়ে যেতে। তখন জাহিদ তাদের কে 'এক রকম জোড় করেই' তার বাড়িতে নিয়ে যায় এবং তাদের সাহায্যে তার যমজ একটি ছেলে একটি মেয়ে হয়। একদিন মায়ের চাপে পীরের বাড়ী রওয়ানা হয় কিন্তু তার মা দেখলো ছেলে হুজুরের বাড়ির দিকে না গিয়ে লেডি ডাক্তারের বাড়ির দিকে যায় তখন সে ভাবছে ছেলেকে হয়ত কানাভুলায় পেয়েছে তাই ছেলেকে জিজ্ঞেস করে কোথায় তাদের নিয়ে যাচ্ছে। এর উত্তরে জহিদ যা বলে তা সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে :

> 'ঠিক পথেই যাইতে আছি মা। .....না, মা, কানাভুলায় আর পথ ভুলাইতে পারব না, ঘাড় মটকাইয়া রক্ত খাইতে পারব না কোন দিন।
> -কিন্তু পীর সাব তো থাকেন উত্তরমুখী, পাইক পাড়া-
> তুমি কিছু চিন্তা কইর না মা। যার অছিলায় চান-সুরুয পাইছ, তার বাড়িতেই যাইতে আছি।'[১৪]

এখানে সমাজের একজন নিম্নবিত্তের মানুষেরও আত্ম সচেতন হওয়ার চিত্র ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে ধর্মীয় গোড়ামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠছে। এই প্রতিবাদে সমাজের নাগরিক হিসেবে নারীকেও উদ্যোগী হতে হবে। তবেই সমস্ত কুসংস্কারকে ভেঙ্গে দেয়া সম্ভব হবে। আবু ইসহাকের মত রোকেয়াও তৎকালীণ সমাজ ব্যবস্থা তথা নারীর অবস্থাকে তাঁর 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থের মাধ্যমে জানিয়েছেন। বর্তমান যুগ-প্রেক্ষাপটকে আরও স্পষ্ট করে বোঝার জন্য রোকেয়া রচিত কয়েকটি ঘটনা দেখান হল তৎকালীন অন্তপুরবাসী নারীদের চিত্র এতে সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। রোকেয়ার সময়কার নারীদের তুলনায় বর্তমান সময়ের নারীরা চিন্তা-চেতনায় প্রকাশ ভঙ্গিতে অনেক অগ্রগামী-অনেক আধুনিক। এই চেতনাকে আরও সামনে নিয়ে যেতে নারীদের সচেতন হতে হবে। শিক্ষিত হয়ে তাদের মেধার যোগ্য স্বাক্ষর রাখতে হবে। রোকেয়ার অবরোধবাসিনী'র আট নং গল্পে দেখা যায় এক বাড়িতে আগুণ লাগলে গৃহিণী বুদ্ধি করে তার সব অহংকার

Dhaka University Institutional Repository

একটি হাত বাক্সে পুরে ঘরের বাহির হলেন। কিন্তু দ্বারে এসে যখন দেখলেন সমাগত পুরুষেরা আগুণ নিচ্ছে তখন তিনি তাদের সামনে বের না হয়ে আবার ঘরের ভেতর ঢুকে খাটের নীচে গিয়ে বসলেন। রোকেয়ার ভাষায়-

> 'তদবস্থায় পুড়িয়া মরিলেন, কিন্তু পুরুষের সম্মুখে বাহির হইলেন না । ধন্য! কুল কামিনীর অবরোধ!'[১৫]

অবরোধ প্রথা ভারতীয় উপমহাদেশে কিরকম প্রভাব বিস্তার করেছিল তার আরেকটি উদাহরণ বার নং কহিণী। সেখানে দেখা যায়, এক হিন্দু রমণী এতই পর্দানশীল যে তার স্বামীকে পর্যন্ত সে দেখে নাই। একদিন গঙ্গা স্নানে গিয়ে বধুটি অন্য এক লোকের কাছার খুঁটি ধরে যাচ্ছিল। তখন তাকে প্রশ্ন করায় জানা যায়,

> 'সর্বক্ষণ মাথায় ঘোমটা দিয়া থাকে নিজের স্বামীকে সে কখনও ভাল করিয়া দেখে নাই। স্বামীর পরিধানে হলদে পাড়ের ধুতি ছিল, তাহাই সে দেখিয়াছে, এই ভদ্রলোকের ধূতির পাড় হলদে দেখিয়া সে তাহার সঙ্গ লাইয়াছে।'[১৬]

তের নং গল্পে নয় বৎসর একটি বালিকাকে তার অভিভাবক 'অন্ধবোরকা' পড়তে দেয়ায় সে পথ চলতে গিয়ে চায়ের পাত্রবাহী লোকের গায়ে ধাক্কা খেয়ে চা ফেলে দেয়। ছিচল্লিশ নং কাহিনীতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। কয়েকজন বোরকাধারিনী একত্রে জড়াজড়ি করে যাওয়ার পথে সামনের মহিলাটি মালগাড়ির ধাক্কায় পড়ে গেলে পিছনে থাকা প্রত্যেকেই হুড়মুড় করে পরে যায়। এর কারণ ছিল একমাত্র সামনের বোরকাপরিহিতার বোরকায় জাল ছিল সেজন্য পিছনের নারীদের টানে বোরকার জাল চোখে না থেকে তা মাথার উপর উঠে যায়। এই বোরকা ধারিনীগণ এতক্ষণ পথ না দেখেই পথ চলতেছিল। শুধু সামনের বোরকায় চোখের সামনে জাল ছিল বাকী সবার ছিল 'অন্ধ বোরকা' সামনের নারী দেখে দেখে পথ চলছিল অন্যসব মহিলারা তার বোরকা ধরে অন্ধেরমত হাটছিল। প্রথমজনের

Dhaka University Institutional Repository

চোখের জাল সরে যাওয়ায় সে জাল গাড়িটি দেখতে পায়নি সুতরাং প্রথমজন পরে যাওয়ায় বাকিরাও পরে গেছে। লেখকের ভাষায় :

> 'বিবিরা আপন আপন বোর্কা পরস্পরের বোর্কার সহিত বাঁধিয়া লাইয়াছিলেন এবং অগ্রবর্তিনীর বোর্কার দামন ধরিয়া সকলেই চক্ষু বুঝিয়া চলিতেছিলেন।'[১৭]

এরূপ পর্দা প্রথায় ধর্মীয় গোড়ামী ছাড়া ধর্মীয় কোন অনুভূতিরই খোঁজ পাওয়া যায়না। এটা শুধুই বাঙালী নারীদের দমিয়ে রাখার জন্য সমাজে পুরুষ কর্তৃক প্রচলিত প্রথা। যে দমন রীতি ধর্মীয় আবরণে পরিচালনা করা হতো। রোকেয়ার সময়কালীন যে সব চিত্র অবরোধবাসিনীতে অঙ্কিত হয়েছে তাতে দেখা যায়, পুরুষ শাসিত সমাজ তখন নারীর স্বকীয় সত্তার সামান্যতম স্বীকৃতিও দিতনা। নারী ব্যক্তিত্ব, নারী স্বাধীনতা কিংবা নারীর সম্ভ্রম সম্পর্কে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এক চোখা নীতি অবলম্বন করত। ধর্মীয় অনুশাসনের মিথ্যে বলয় তৈরী করে নারীদেরকে শোষণ করা হত। নারী ক্রমাগত এই অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে করতে আজ তাদের নিজস্ব জগৎ বা 'আমিত্ব' বোধ সম্পন্ন হতে পেরেছে। নারী এখন বুঝতে পারে সে কোথায়-কতটুকু শাসিত বা শোষিত হচ্ছে। সেলিনা হোসেনের 'ঘোষণা' গল্পে দেখা যায়, পঁয়ত্রিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের অতীতে তাকিয়ে জাকিয়া খাতুন স্মৃতি হাতরে ফেরে। লেখকের ভাষায়:

> 'যদিও জাকিয়া খাতুন দাম্পত্য জীবনের এই দীর্ঘ সময় থেকে খানিকটুকু আলাদা করে রাখে যেটুকু তার জন্য মোটেই ভালো সময় ছিল না আশরাফুল আলমের পরকীয়া প্রেমের কারণে। মহিলা বিদেশ চলে যাওয়াতে সম্পর্ক বেশিদূর এগোয়নি। আর আশরাফুল আলম জাকিয়া খাতুনকে এমন ধারণায় ঘায়েল করার চেষ্টা করেছে যে, পুরুষ মানুষের এসব একটু-আধটু থাকে। এ নিয়ে স্ত্রী বেশি বাড়াবাড়ি করলে সংসারে অশান্তি হয়।'[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

জাকিয়া খাতুনের জ্বলে ওঠা চোখ সংসারের শান্তির বাসনায় নিভে যায়। সংসার মানে তো কতগুলো ঘর, দুই ছেলে এক মেয়ে এবং স্বামীর সঙ্গে একটি বিছানা। স্বামীর মেনে নেয়া স্ত্রীর উচিত কে অনুচিত এ নিয়ে জাকিয়া খাতুন এখনও দ্বিধান্বিত: কিন্তু ওই যে ছেলেমেয়ে তাদের ভবিষ্যৎ এবং সুখ-শান্তি ইত্যাদি ধারণায় বোকাসোকা সরল জাকিয়া খাতুন ক্যাতকেতে আবেগে ক্রমাগত তলাতে থাকে। এই তার দোষ। লেখক গল্পের নায়িকা অর্পিতার ভেতর দিয়ে পুরুষতান্ত্রিকতার সর্বগ্রাসী স্বরূপটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন:

> 'নারী-পুরুষের সম্পর্ককে পুরুষতান্ত্রিক ধারণার ক্ষেত্রও বীজের সঙ্গে তুলনা করা হয়। নারী ক্ষেত্র, পুরুষ বপন করে বীজ। উৎপন্ন হয় ফসল। কিন্তু পুরুষ বুঝতে পারে না যে নারীর একটি বাড়তি শক্তি আছে। নারী ইচ্ছা করলে নিজেকে বীজমুক্ত করতে পারে। বীজ রক্ষা করা এবং বীজ প্রত্যাখ্যান করা দুই-ই নারীর ক্ষমতার আওতায় পড়ে। হাঃ, পুরুষ! অর্পিতা বড় করে শ্বাস ছেড়ে উড়িয়ে দেয় ছয় বছরের যাপিত সংসার জীবন। মাস ছয়েক আগে ওর ঘর ভেঙেছে।'[১৯]

অর্পিতার এ চিন্তা-চেতনা এক আধুনিক নারীর উপলব্ধি। সমাজে পুরুষ হিসেবে পরিচিত অর্পিতার স্বামী অরূপের মানস চেহারাটা বদলাতে বেশি দিন সময় লাগেনি। সে অন্য মেয়ের প্রেমে পড়ে যায় রাতারাতি এবং ডিভোর্স নেয় অর্পিতার সাথে। তখন অর্পিতার মা কান্নাকাটি করলে ওর মনে হয়:

> 'মেয়ের মা হলে তাকে কাঁদতে হবে কেন ?....অরূপের মা তো কাঁদবে না। ররং খুশি হয়ে বলবে, বাঁজা মেয়েটাকে বিদায় করে ভালো করেছিস্ বাবা।'[২০]

এরপরই অর্পিতার আরও মনে হয়:

Dhaka University Institutional Repository

'মেয়ের মায়েদের যেমন শেখাতে হবে, ছেলের মায়েদেরও তেমনি শিখাতে হবে। হাঃ ! কয়শ' বছর লাগবে! পাঁচশ' বছর কি? তারও বেশি হতে পারে। কারণ এরও বেশি সময় ধরে পুরুষরা নারীদেরকে নারীদের বিরুদ্ধে এত কিছু শিখিয়েছে যে সেখান থেকে তাদের বের করে আনা সহজ কাজ নয়।'[২১]

লেখকের অন্য একটি গল্প 'জেসমিনের ইচ্ছা পূরণ' গল্পে দেখা যায় সমাজে নারী পুরুষ কর্তৃক নির্যাতিত হয় নানাভাবে তার মধ্যে একটি বড় কারণ হলো মেয়ে সন্তান জন্ম দেয়া। এর ফলে দেখা যায় মেয়ে জন্মদানকারী নারীটিকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তখন নারী তার অসহায় অবস্থায় সাথে আরো কয়েকটি নারী সত্ত্বানিয়ে জীবন যুদ্ধে বেড়িয়ে পড়ে। সেলিনা হোসেন এ গল্পে দেখেছেন সমাজে পুরুষের এ আধিপত্যের বিরুদ্ধেও কিছু কিছু নারী সোচ্ছার হয়। গল্পে দেখি জেসমিনের মেয়ে বাচ্চা হলে স্বামীটি তার কোন দায়িত্ব নেয়-নি বরং নির্যাতন করেছে:

'স্বামী বাচ্চাটির দিকে ফিরে তাকায়নি, ছ'মাসের মাথায় আবার বিয়ে করে লোকটি, যেদিন ও নতুন বৌ নিয়ে বাড়িতে আসে সে দিনই বাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে আসে জেসমিন।'[২২]

জেসমিনের এ চলে যাওয়া পরিবর্তীত প্রেক্ষাপটেই কেবল সম্ভব হয়েছে। পরিবর্তিত বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীরা নিজেদের উপলব্ধি করতে পারছে এবং দৃঢ়তার সাথে নিজের চাওয়া-পাওয়ার কথা ব্যক্ত করতে পারছে এটা নারীর জন্য একটি সফল অধ্যায়।

'সঘন শর্বরী' গল্পে মকবুলা মন্জুর দেখিয়েছেন ভাগ্যের চাকা একটি নারীরজীবনকে কোথা থেকে কোথা নিয়ে যায়। গল্পের নাইকা কুলসুম যে একবছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে কিছুদিন মায়ের সাথে মামা বাড়ী থাকে। কিন্তু মায়ের অন্যত্র বিয়ে হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গেলে তার আশ্রয় মেলে চাচাদের কাছে 'বিনে মাইনের বাঁদী' হিসেবে। এমন সময় চাচারা টাকার লোভে তাকে ষাট বছরের এক বুড়োর কাছে চতুর্থ বউ হিসেবে বিয়ে দিবে। তখন কুলসুম ভাবছে:

> 'সে কেঁদে মরলেও কেউ তার কথা শুনবেনা। এ বিয়ে হবেই। জমিরমুন্সির অনেক টাকা। নিশ্চয় চাচারা তার কাছথেকে টাকা খেয়েছে.... কুলসুমের চোখে ঘুম নেই। শুকনো দু'চোখ মেলে সে ভাবছে। সামনে তার শাণিত ছোরা ঝিলিক দিচ্ছে, সে যেন কম্পিত কলেবর কোরবানীর পশু। কিন্তু না। এমন করে কুলসুম মরতে পারে না।'[২৩]

সারা বেলার বৃষ্টি গড়িয়ে রাতের প্রহর নামলে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু কুলসুমের চোখে ঘুম নেই। সে তখন দরজার খিল খুলে বেরিয়ে এলো মায়ের খোঁজে:

> 'আকাশে ঝড়ো মেঘ, হাওয়ার শন শন বিদ্যুতের তীক্ষ্মচাবুকে চিরে চিরে যাচ্ছে আকাশের কালো বুক। কুলসুম ছুটছে। আলোর পথে হোচট খেয়ে খেয়ে ছুটছে একটি সতেরো বছরের বিদ্রোহী সত্তা।'[২৪]

কুলসুমের এই ছুটে চলা বিদ্রোহী সত্তা ভাগ্যে নির্মম পরিহাসের শিকার হয়। মায়ের খোঁজে ঘর থেকে বের হয়ে আশা কুলসুম নদী পার হয়ে মামাবাড়ী যেতে চেয়েছিল কিন্তু নদীতে তখন উপস্থিত হাজী সাহেব তাকে নদী থেকে অচেতন অবস্থায় নৌকায় তুলে আনে। সকালে কুলসুমের জ্ঞান ফিরলে হাজী সাহেব সামনে এসে বসলেন। একটু কেশে বললেন- তবলীগ করতে বের হয়েছিলাম। পথে খোদা তোমাকে মিলিয়ে দিলেন। তা তোমার বিয়ে শাদী হয়েছে?' তখন কুলসুম 'না' সূচক মাথা নাড়লে হাজী সাহেব আস্বস্ত হয় এবং সে তার তৃতীয় বউ হিসেবে কুলসুমকে বিয়ে করে বাড়ী নিয়ে আসে। তখন তার দ্বিতীয় বউ আমিনা নীরবে বধূ বরণের

Dhaka University Institutional Repository

আয়োজন করে 'বড় গিন্নীর তর্জন গর্জন শাপশাপান্ত যেনতার কানেই ঢোকেনা। সে শুধু ভাবে যে আসছে তার মত হতভাগী আর কে? তার কি দোষ? এমন সময় নতুন বউ নিয়ে হাজী সাহেব উপস্থিত হলে-

'বাঁহাতে কুপিনিয়ে ডান হাতে বধূর ঘোমটা সরালো আমিনা। কুলসুম চোখ মেললো। বিস্ফারিত হল তার চোখ, আর্ত পশুর মত চীৎকার করে উঠলো- মা !

আমিনার হাত থেকে খসে পড়া কুপিটা কয়েকবার দপ্ দপ্ করে উঠে নিবে গেলো।'[২৫]

গল্পের শেষে দেখা গেল একই লোকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্ত্রী হল মা এবং মেয়ে। -নারী জীবনে এর চেয়ে যন্ত্রণাকাতর মুহূর্ত আর কি হতে পারে, সমাজ, ভাগ্য এবং সমাজের পুরুষদের কাছে নারী হল খেলনার পুতুল। যেমন ইচ্ছে তেমন করেই যেন সাজান যায়। গল্পে উপস্থিত এই নারীদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের কোন স্থানই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারা সমাজের কাছে, পুরুষদের কাছে এবং অর্থের কাছে পরাজিত হয়েছে চরমভাবে, হয়েছে অপমানিত, লাঞ্ছিত। লেখকের অন্য একটি গল্প 'জলো হাওয়ার গন্ধ' এখানে দেখা যায় এক নব দম্পত্তি হানিমুনে গিয়ে যে ডাকবাংলোয় উঠল চার বছর আগেও পুরষটি তার প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে একই ডাক বাংলোয় উঠেছিল। তখন নতুন স্ত্রী ইভুর মনের মধ্যে স্বামী মাশুকের প্রথম স্ত্রী ডালিয়ার মৃত্যুকে ঘিরে কিছু রহস্য তৈরী হয়। মধ্যরাতের হালকা শব্দে ইভু জেগে উঠে মৃদু আলোতে দেখলে: 'আশ্চর্য শাদা এক নারী দাঁড়িয়ে, তার ভেজা শরীর থেকে পানি ঝরছে; ঘরের ভেতর জলো জলো একটা গন্ধ ভাসছে। মেয়েটার কপালে গভীর একটা ক্ষতি চিহ্ন। ইভু কিছু বলার চেষ্টা করার আগেই মেয়ে ঘুমন্ত মাশুকের দিকে দীর্ঘ শাদা আঙ্গুল উচিয়ে মৃদু বাতাসের শব্দে বলে উঠলো-ও আমাকে সন্দেহ করতো, আমাকেও খুন করেছিলো।'[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

ডালিয়া মাশুকের প্রথম স্ত্রীর নাম। এখানে দেখা যায়, মাশুক তার স্ত্রীকে সন্দেহের কারণেই মেরে ফেলে। তারপর দিব্যি সে আবার দ্বিতীয় বিয়ে করে। পুরুষের এই অবধা আধিপত্য বিস্তার সম্ভব হয়েছে কেবল তার দৃঢ় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তির কারণে।

'আধার এলো বলে' গল্পে পুরবী বসু দেখিয়েছেন গ্রামের আবহে অসহায় নারী-চিত্র। গ্রামে অন্ধকার নামার সাথে সাথে সেখানে অবস্থানকারী মানুসের দুর্দশা কতখানি অসহনীয় হয়ে ওঠে তার চিত্র পাওয়া যায় মাখনের মায়ের উক্তিতে:

> 'কয়েকদিন ধরে রাত জুড়ে নিরন্তর অমাবস্যা এখানে। অন্ধকারের গা বেয়ে আকাশ থেকে নেমে আসে অজস্র জুজুবুড়ি। তখন এই পরিচিতি বাড়ি ঘর, ক্ষেত, ফসল, পুকুরকে আর পরিচিত মনে হয় না। জীবন জগৎ জুড়ে তখন কেবল তাণ্ডব করে বেড়ায় মানুষের মুখোশধারী কিছু হিংস্র জন্তু জানোয়ার।' এরকমই একটি সময়ে- 'সকলের চোখের সামনে মেয়েটাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে গেল। সারারাত ধরে তাকে পাওয়া গেল না। ভোররাতে আধমরা মেয়েটাকে ফেলে রেখে গেল খড়ের গাদায়।'[২৭]

একটি মেয়ের জীবনের এ সর্বনাশ পরিবারে কিংবা সমাজে তার অসহায়ত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে। নারীর এই সামাজিক জীবন নারীকে কিভাবে বাঁচতে শেখাবে। 'জরির দিন' গল্পে এরকমই নারীর অসহায়ত্বের চিত্র তুলে ধরেছেন রাজিয়া মজিদ। পরিবারে মেয়েদের মর্যাদা কোথায় এবং কতখানি নিচে গল্পটিতে তা খুঁজে পাওয়া যায়। গোরস্তানের তত্ত্বাবধায়ক রমিজ মিয়ার মেয়ে জরি। যারা সারাদিন কেটে যায় গোরস্তানে দু'চার পয়সার জন্য হাত পেতে আর বিভিন্ন রকম শাক কুঁড়িয়ে। এর মাঝেই জরি সাদ জাগে মোল্লা বাড়ির মেয়ের পরনের শাড়িটি পড়ার। সে কথা জরি তার মাকে বলতেই খেকিয়ে ওঠে মা করিমন:

> 'করিমন ঝঙ্কার দেয়, মুখে খালি পরণের কতা, এদিকে প্যাটে যে দানা নাই, ছেড়াটার মুখে এক ফোঁটা ওষুধ দেওনের নাই সেটা কিছু না। জরিও তেজের

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে বলে, ইস আমার কিছু সখের কতা কইলেই উনার জান পুড়ায়। খালি ছেড়া ছেড়া। বারো মাইসা রোগী, বাজান কি করব? হারামজাদী ভাইটারে দুই চোখে দেখতে পারে না। ছাওয়ালই যদি আমার মইরা যায় তা হলে মাইয়া দিয়া কি ধুইয়া খাইমু? জরির মুখ বিষন্ন হয়ে ওঠে। কিছু না বলে সে কবরখানার দিকে চলে যায়।'[২৮]

এখানে পুরুষতান্ত্রিক ছকে আত্মস্থ নারী করিমন তার ছেলে-মেয়ের মধ্যে ছেলেকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। জরির আর্তনাত, জরির চাওয়া পাওয়া অবশেষে প্রভুর পায়েই নিবেদিত হয়। রাতে জরির গায়ে জ্বর উঠে এবং মারা যায়। নারীর এই আর্থ-সামাজিক দিক নারীকে অনেক বেশি অসহায় করে রাখে।

'একটি মৃত্যু সংবাদ' গল্পে লেখিকা মকবুলা মনজুর বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের অস্থির সমাজ চিত্র এঁকেছেন। গল্পের নায়ক ইমরান যার পিতা যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর: ' সদ্য বিধবা মা শহীদের স্ত্রী হিসেবে একটা ব্যাংকে কেরানীর চাকরী পেয়েছেন। তারই উপার্জনে কোনমেত চলে সংসার। বড় বোনটার পড়া বন্ধ। চাকরী খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়ে উঠেছে। ছোট ভাই বোন স্কুলে যায়।' এদিকে ইমরান অস্থির সময়ের ঘুপচি গলিতে দাঁড়িয়ে নেশার উপকরণ খোঁজে। সদ্য স্বাধীন দেশে ঘুরপাক খাওয়া ইমরানকে ভাই বোনদের কষ্ট ছুঁয়ে যায় না। সে তার নেশার রসদ যোগাতে মায়ের মৃত্যুর মিথ্যে গল্প বানিয়ে মানুষকে বলে টাকা হাতিয়ে নেয়। যে মা তাকে একদিন কোলে নিয়ে ঘুম পড়াত, মাথায় চুমু দিয়ে দোয়া করত- 'সে মা যে এখন এক সর্বহারা বিষাদের অসাড় প্রতিমা।' যে 'ছেলের অধঃপতনে দুঃখ পেতে পেতে এখন পাথর হয়ে গেছেন।'[২৯] -এসব চিত্র সমাজে নারীদের করুণভাবে বেঁচে থাকারই চিত্রকে স্পষ্ট করে। দেখিয়ে দেয় নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান। 'ফসলের মাঠ' গল্পে দেখা যায়, এক জমিদার আরফান হোসেন অসুস্থ হলে তার তিন ছেলে কৌশলে সরে যাওয়ার জন্য নানা অজুহাত তোলে। একই লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে: 'এক একটি বাদ্যযন্ত্র বিভিন্ন আওয়াজ তুলে চমৎকার এক ঐকতান শুরু করল।'[৩০] আধুনিক মনোজগতের অধিকারী ছেলে-

Dhaka University Institutional Repository

বউরা নিজেদের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। যে কারণে বৃদ্ধ পিতা-মাতার দিকে তাকানোর সময় তাদের হয়ে উঠেনা। বর্তমান সময়ের আর্থ-সামাজিক পৃক্ষাপটে ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে পারিবারিক বন্ধন ক্রমশ হারিয়ে যায়।

'সর্পিল' গল্পে মকবুলা মন্জুর পিতৃহীন মেয়ে জরিনার জীবনের চক্রাকার সময়কে তুলে ধরেছেন। যে জরিনা পিতা মারা যাওয়ার পর মায়ের হাত ধরে মামু বাড়ী গিয়ে ওঠে। সেখানেই দালাল সালামের সাথে। বিয়ের দু'মাসের মাথায়ই সালামের আসল স্বরূপ জরিনার সামনে প্রকাশ পায়। মাতাল; দুশ্চরিত্র আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির সালাম নিজেই বলে:

> 'সে নাকি মেয়ে মানুষের দালালী করে। এমন তার ভাব যেন এটা অগৌরবের কিছুই না। কিন্তু লজ্জায়-ধিক্কারে জরিনা মরে যেতে পারলে বাঁচে। বিয়ের বছর না ঘুরতেই সালাম জরিনাকে চরিত্রহীনতার অপবাদে তালাক দিল।'[৩১]

এর পর জীবনের প্রয়োজনেই জরিনার আশ্রয় হয় আয়েশা বেগমের ঘরে কাজের ঝি হিসেবে। সেখানে তার জীবন নিতান্তই যন্ত্রের মত কাট ছিল। তখন- 'জরিনার মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে করে আয়শা বেগম তাকে কি ভাবেন? মানুষ? না আশা-ভরসাহীন অনুভূতি শূন্য একটি যন্ত্র।' নিষ্ঠুর এই সমাজে জরিনাদের জীবন কেবলই কেটে যায়। দানবের লাঞ্ছনায় মানুষের মত শুধু প্রশ্ন উকি দিয়ে যায় ভেতরে এর বেশি কিছু প্রাপ্তি তাদের জীবনে ঘটেনা। এরই মাঝে পরিচয় ঘটে সালাম রূপী আরেক পুরুষ আজিজের সাথে। সে আজিজের সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে বের হল ঘর থেকে। লেখকের ভাষায়:

> 'রাত আরও গভীর হলো। কালো অন্ধকার ডানা মেলে ঢেকে দিলো পৃথিবীর সব টুকু আরো সবুজ সতেজ লতাগুল্ম ঢাকা পৃথিবীর আদিমতম গুহা গুলি

Dhaka University Institutional Repository

থেকে শ্বাপদেরা পা টিপে টিপে হামাগুড়ি দিয়ে শিকারের দিকে অগ্রসর হলো। পৃথিবীর সমস্ত আদিমতম ফাটল থেকে সরীসৃপেরা বুকে হেঁটে, চেরা জিভ দিয়ে কাঁচা মাংসের ঘ্রাণ নিতে নিতে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। উঠোনে কালো ছায়া দেখলো জরিনা। অদ্ভুত এক ভয়ে থরো থরো শরীরে ঘর থেকে নেমে এসে আজিজের হাত ধরলো।

"জলদি চল, ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে।"

আজিজের চাপা কণ্ঠ কাল কেউটের মত হিস্ হিস্ করে উঠলো। পরম নির্ভয়ে আজিজের হাত ধরে আঁকা বাঁকা আলপথ পেরিয়ে নদীর ঘাটে এলো জরিনা।'[৩২]

লেখিকা এখানে জরিনার জীবনের সময়কে সুন্দর উপমার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। শিকারের দিকে স্বাপদেরা যেভাবে পা টিপে টিপে অগ্রসর হয় আজিজও তেমনি জরিনার দিকে কালো ছায়া নিয়ে এগিয়ে এসেছে। কালো রাত্রির অন্ধকারে আজিজ অবলীলায় জরিনার স্বপ্নকে 'মেয়ে মানুষের দালাল' সালামের হাতে তুলে দেয়। যখন আজিজ বলে যে, সে যাবে না এবং নৌকার মাঝি সালাম তখন:

'জরিনার বুকের ভেতর ধক্ করে ওঠে। কিন্তু একই নামের কত মানুষই তো আছে। ততক্ষণে নৌকা ছেড়ে দিয়েছে। জরিনার ইচ্ছে হলো। পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। কিন্তু ফিরে সে যাবে কোথায়?'[৩৩]

-জরিনার মধ্যে বাঁচার ইচ্ছে জাগলেও বাঁচার পথ সে খুঁজে পায়না। কেবলই অন্ধকারের ঘেরাটোপে বলী দিয়েছে জীবনকে। তার শেষ প্রশ্ন ফিরে সে যাবে কোথায়। সমাজ একটি নারীকে কত অসহায় করে রাখে। নারীর শরীর-শিকারী পুরুষ সমাজের সর্বত্রই 'বন কেউটের হিস হিস' শব্দের মত ছড়িয়ে আছে। যারা এসব অসহায় নারীকে পুঁজি করে তাদের জীবন চলার পথ খোঁজে। জরিনাদের জীবন বর্তমান পেক্ষাপটে এভাবেই বড় করুন হয়ে ধরা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই সমাজে নারী 'মানুষ' হিসেবে তার ন্যায্য অধিকার বা সম্মান থেকে কোথায় বঞ্চিত হচ্ছে তা তারা বোঝার ক্ষমতা রাখে। সমাজ এবং রাষ্ট্রের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণেই নারী জেণ্ডার বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাই অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রয়োজন। নারী সমাজ সব কিছু চেয়ে দেখে, উপলব্ধি করে আর বৈশ্বিক বন্ধিত্বের শিকার হয়। নারীর কোন কিছু মনে লাগুক আর না-ই লাগুক পরিবারের বা সমাজের কাছ থেকে 'মেনে নেয়া' শিখে নেয়। নারী মানুষ হিসেবে তার অহংবোধকে প্রকাশ করতে পারে না। জীবনের কোনকিছুর সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাখেনা। তাই আজ নারীদেরই উচিত নিজেদের প্রাপ্য সম্মান অধিকার অর্জন করে নেয়া। তাহলেই সম্ভব নারী অগ্রগতি-নারী মুক্তি তথা দেশের উন্নয়ন। বিকশিত করতে হবে নিজস্ব মেধার-যোগ্যতার। সমাজে নারীর অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে নারী পুরুষ উভয়েরই রাখতে হবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। নারীর ধ্যান-ধারণায় আনতে হবে শাশ্বত মানবতাবোধ। জীবন চলার দায়বদ্ধতা সচেতনভাবেই নারী পুরুষ উভয়কেই বহন করতে হবে। তবেই সম্ভব নারী তথা মানুষ বা মানবতার মুক্তি। 'পুরুষের অধীন নারী' এ মূল্যবোধ সমাজ থেকে নির্মূল করেত হবে। একটি নারীর মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বা মানুষ হিসেবে জীবন ধারণ নারীর জন্মগত অধিকার। এই অধিকার কে সমাজে সমন্বিত রাখতে হবে। নারীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্ম নির্ভরশীলতা বাড়াতে হবে। সেই 'কৃষি যুগের সুচনাকালে নারীকে গৃহের গন্ডিতে আবদ্ধ করে, বাধ্যতামূলক একগামী করে পুরুষের বহু গামিতা, পিতৃধারায় সন্তানের পরিচয়, সম্পত্তিতে নারীর অধিকারহীনতা, সতীত্ব রক্ষার দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখনো সেই ধ্যান ধারণা, সংস্কৃতি ও আইন বিশ্বের নারী-সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছে।'[৩৪] যুগ-যুগ ধরে এই পুরুষতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা নারীকে আবদ্ধ করে রেখেছে। যে কারণে এখনও সমাজে নারী প্রতিনিয়ত সহিংসতার শিকার হচ্ছে। সমাজে গড়ে উঠছেনা নারীর জন্য সার্বজনীন মানবতাবোধ। নারীকে দেয়া হচ্ছে না পারিবারিক-সামাজিক-আর্থিক ক্ষেত্রে তার প্রাপ্য অধিকার।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সংবিধান, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০০৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত, পৃ-৬

২. প্রাগুক্ত, পৃ-৬

৩. সুলতানা কামাল, নারী , মানবাধিকার ও রাজনীতি, ইত্যাদি,ফেব্রু-২০১০, গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা পৃ- ১৮

৪. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, অন্যনায়ক, গল্প সমগ্র, ফেব্রু-২০০২, বিদ্যা প্রকাশ, পৃ-৯

৫. প্রাগুক্ত, পরের ঘর, পৃ-২২

৬. হেলেনা খান, মানদন্ড, কারাগারের ভেতরে ও বাইরে, পৃ-৩২

৭. পাপড়ি রহমান, শ্যাওলা রেখেছে জমা রৌদ্র ও শিশির, হলুদ মেয়ের সীমান্ত, পৃ-১১

৮. প্রাগুক্ত, পৃ-১৩

৯. প্রাগুক্ত, পৃ-১৪

১০. রাশিদা আখতার খানম, নারীবাদী চিন্তা ও মতিজানের মেয়েরা, উলুখাগড়া, সম্পাদক: সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১২, ফেব্রুয়ারী-২০০৬, সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, ঢাকা, পৃ-১৮১-৮২

১১. সেলিনা হোসেন লিপিকার বিয়ে এবং অত:পর, মতিজানের মেয়েরা, গল্প সমগ্র, পৃ-৩৪৩

১২. প্রাগুক্ত, নদে এলাবান, পৃ-৩২১

Dhaka University Institutional Repository

১৩. আবু ইসহাক, কানাভুলা, হারেম, পৃ-১২

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ-১৪

১৫. রোকেয়া, অবরোধবাসিনী, রোকেয়া রচনাবলী, পৃ-৪৭৯

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৮১

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৫১০

১৮. সেলিনা হোসেন, ঘোষণা, নারীর রূপকথা, পৃ-৩৫

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮

২০. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯

২১. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯

২২. প্রাগুক্ত, জেসমিনের ইচ্ছে পূরণ, পৃ-৮৭

২৩. মকবুলা মনজুর, সঘন শর্বরী, নক্ষত্রের তলে, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৯, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ-৬৮

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ-৬৯

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ-৭১

২৬. মকবুলা মনজুর, জলোহাওয়ার গন্ধ, দিন রজনী, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৩, বস্তু প্রকাশন, ঢাকা, পৃ-১০৭

২৭. পূরবী বসু, আঁধার এলো বলে, নিরুদ্ধ সমীরণ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৬, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ-১৯

Dhaka University Institutional Repository

২৮. রাজিয়া মজিদ, জরির দিন, ভালবাসার সে মেয়েটি, প্রথম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৫, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ-৫৬

২৯. মকবুলা মনজুর, একটি মৃত্যু সংবাদ, শকুনেরা সবখানে, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৮, চিশতিয়া আর্ট প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ-২৩

৩০. হেলেনা খান, ফসলের মাঠ, ফসলের মাঠ, অক্টোবর-১৯৮৯, বুক ভিলা, ঢাকা, পৃ-৩৯

৩১. সর্পিল, নক্ষত্রের তলে, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৪

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ-৭৬

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ-৭৭

৩৪. মালেকা বেগম, নারীর জন্য বিশেষ আইন শিকল ছাড়া কিছুই নয়, কালি ও কলম, ১ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৪, পৃ-২৫

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ছোটগল্পে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় মানব-জীবনের কিছু খণ্ড সময়ের প্রতিচ্ছবি। উদ্ভাসিত হয় জীবনার্থ দেশ-কাল-সমাজ-সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের নিবন্ধ সমগ্রতাস্পর্শী শিল্পীত অবয়বে। সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্ক, নারীর জীবনের আদি অন্তিক, নানা নির্বন্ধ ব্যক্তিক সংগ্রাম সবই অনুরণিত হয় লেখকদের শৈল্পিক শব্দচিত্রে। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে নারীর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, নারীর অবস্থান, সমাজশৃঙ্খলে বন্দী নারীর জীবন জীজ্ঞাসা, নারী অস্তিত্বের অর্ন্তসংকট ও বর্হিসংকট নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধ কিংবা আত্মিক মর্যাদা বোধ বাংলাদেশের মহিলা ছোটগাল্পিকদের গল্পে জীবন কেন্দ্রিক শিল্প-চেতনায় ভাস্বর হয়ে আছে। নারীর ব্যক্তিক স্বাধীনতাকাঙ্খী মুক্তিকামী মনের রূপচিত্র ধরা পড়েছে তাঁদের লেখনিতে। গ্রামীণ-সমাজপ্রতিবেশ থেকে শুরু করে শাহুরিক আধুনিক জীবন যাপনে নারীর স্বপ্ন যন্ত্রণা বেদনার হার্দ্রিক শব্দরূপ ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে স্থান পেয়েছে। সংকীর্ণতা, কুসংস্কার আর পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবই সমাজ-ধর্ম-রাষ্ট্রে নারীর জীবনাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে। বদলে যাওয়া বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর সমাজ বাস্তবতা আর নারীজীবনের সীমাহীন অসঙ্গতি নারী সমাজকে করেছে গভীরভাবে আত্মসচেতন। ছোটগাল্পিকদের লেখায় উন্মোচিত হয়েছে নারীদের এসব প্রাত্যহিক জীবনের নানা নির্বেদ। নারীর নৈঃসঙ্গ্যতাবোধ, তাদের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, নারী পুরুষের আন্তঃ সম্পর্কের টানাপোড়েন মহিলা লেখকদের লেখায় প্রকাশ পেয়েছে নতুন দিক মাত্রায়। পরিবার বা সমাজ বা স্বামী কর্তৃক উপেক্ষিত নারীর মর্মযন্ত্রণা কিংবা নারীর প্রতিবাদ বিধৃত হয়েছে ছোটগল্পগুলোতে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নারীর অহংবোধ, আত্মসচেতন নারীর অধিকার চেতনা, পণ প্রথায় জর্জরিত নারী ও তাদের প্রতিবাদ, সনাতনী মূল্যবোধের বিরুদ্ধে নারীর ব্যক্তিক বিদ্রোহ, ধর্মীয় অনুশাসনে মোড়লদের শোষণের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদী রূপ, নারীর এই বহুমাত্রিক দিকগুলো

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মহিলা ছোটগাল্পিকদের রচনায় উঠে এসেছে। পরিবারের ভেতরে নারী-পুরুষ ব্যক্তিত্বের সংঘাত আর অর্থনৈতিক বৈষম্য একজন নারীকে মানসিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল করে রাখে। ঘরে পুরুষের আধিপত্যবাদী নীতির কারণে নারী নির্যাতিত হয় বেশি। নারী তার পরিবারে আপন মানুষদের দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার এসব চিত্র আগে প্রকাশ পেতনা। কারণ, নারীর সনাতনী মূল্যবোধ তা নিজের মধ্যে আত্মস্থ করার নিয়ম শিখিয়েছে। বর্তমান যুগের আধুনিক নারীরা এসব ঘটনার প্রতিবাদ করার তা সমাজে রাষ্ট্রে প্রকাশ পাচ্ছে যার ফলে নারী নির্যাতনের চিত্রগুলো সমাজে অবস্থিত অন্যান্য মানুষ জানতে পারছে, নারীরা হচ্ছে আপন আপন ক্ষেত্রে প্রতিবাদী। তাই এরই প্রভাব দেখা যায় সাহিত্যে তথা ছোটগল্পের জগতে পরিবারে বা সমাজে নারীকে ব্যক্তিক মর্য্যদা না দেয়ায় এবং সর্বত্র নারীকে পুরুষের অধীনস্থ করে রাখার জন্যই নারী-জীবনে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। পুরুষ তার পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটাচ্ছে ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় আইনী বলয়ে। তাই নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা বা ন্যায্যতার মাপকাঠিতে কোথাও নাগরিক অধিকার বন্টন করা হয় না। যার ফলে সমাজে নারী সহিংসতার ঘটনা বেড়েই চলছে এর থেকে মুক্তি পেতে নারীর প্রতি পুরুষদের শ্রদ্ধারোধ আর সহমর্মিতার হাত বাড়াতে হবে। সর্বোপরি হতে হবে আত্ম সচেতনতাকে বুঝতে হবে কোথায় সে বৈষম্য কিংবা বঞ্চনা বা শাসন শোষণের শিকার হচ্ছে। নারী নির্যাতনের এ শাশ্বত অবস্থা থেকে নারীকে মুক্তি করতে সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে এবং নারীদের একত্ব হতে হবে। নিজেদের অবস্থা ও অবস্থানের রূপ-রূপান্তরের জন্য জীবন যাপনে ইতিবাচক কৌশল অবলম্বন করতে হবে। ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে মানুষ হিসেবে নিজের মানবিক অধিকার অর্জন করতে হবে। ছোটগল্পগুলোতে নারী জীবনের নানা সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না বাস্তববাদী মনোলোকের নিরিখে লেখকগণ অনুপুঙ্খভাবে তুলে এনেছেন। পরিবারে যখন একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে শিশুটি ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন সে শিশুদের মধ্যে তাদের প্রতিবাদ বিকাশ কিংবা প্রকাশে, তাদের স্বপ্ন-ইচ্ছা তাদের কল্পনা শক্তির প্রস্ফুটনোর মধ্যে এমন কোন পার্থক্য থাকে না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটাই এমন যে, শিশুটি

Dhaka University Institutional Repository

একটু বড় হতেই তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় সে ছেলে শিশু না মেয়ে শিশু। এরপর তার খেলার ধরণ কিংবা কাজের পরিসর আলাদা করে বলা হয় এটা ছেলের কাজ, এটা মেয়ের কাজ যার ফলে পরিবারে বা সমাজে মেয়েটি উপলব্ধি করে চার দেয়ালে বন্দি নারী জীবন। শুরু হয় একটি মেয়ের স্বপ্নহীন, লক্ষ্যহীন, বাধাগ্রস্থ জীবন। অন্যদিকে একই বয়সী একটি ছেলেকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় বিশাল জগতের সাথে তাকে জানিয়ে দেয়া হয় প্রথমত: সে মানুষ দ্বিতীয়ত: সে পুরুষ মানুষ। সুতরাং তার জীবন হয় অবাধ, উদ্দাম, তেজস্বী আর ক্ষমতাধর। পুরুষের বিচরণ ক্ষেত্র সরা পৃথিবী সর্বোত্র অন্যদিকে নারীকে বন্দী করা হয় গৃহের সীমিত গণ্ডির মধ্যে। নারীর জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় ঘর রান্না আর সংসার সামলানো। এ দায়িত্ব নিয়ে নারী পৃথিবীর সব সুযোগ সুবিধা থেকে হয় বঞ্চিত। এভাবেই শুরু হয়ে যায় নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য। এ বৈষম্য নারীর জন্য রুদ্ধ করে দেওয়া জগতের সমস্ত দোয়ার। অপর দিকে তা-ই উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় পুরুষদের জন্য। ক্রমাগত নারী হারায় সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় সব ধরণের অধিকার। যার ফলে নারী জীবন পশ্চাৎপদতার দু:সহ যন্ত্রণা বয়ে বেড়ায়। বাংলাদেশের মহিলা লেখিকাগণ তাদের ছোটগল্পে নারীর এই সমগ্রতাস্পর্শী রূপ পরিশীলিত অবয়বে উদ্ব্যক্ত করেছেন।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে পুরুষ নারীকে কি দৃষ্টিতে দেখে, নারীর চোখে নারী ভাবনা কি, নারীর নিজস্ব জগৎ বা পরিসর, সনাতনী চিন্তা-চেতনা কিভাবে আধুনিক মানস দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বায়িত হয়েছে তা মহিলা ছোটগাল্পিকগণ সূক্ষ্মভাবে তাদের ছোটগল্পগুলোতে ফুটিয়ে তুলেছেন। সর্বোপরি আলোচিত হয়েছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীর আর্থ-সামাজিক জীবন। বাংলাদেশের মহিলা রচিত ছোটগল্পগুলোতে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ এবং সমাজে জেণ্ডার ভিত্তিক নারীর অবস্থা, নারীর বিষয়-আশয়, নারীর ভাবমূর্তী কিভাবে উপজীব্য হয়েছে তা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট্য-১

অধ্যায় অনুসারে আলোচিত গল্পের তালিকা

১. বাংলা ছোটগল্পে নারীজীবন : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

গল্পকার	গল্প	গ্রন্থ
পদকর্তা- ভুসুকুপাদানাম	৬ নং চর্যা	চর্যা পদ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	দেনাপাওনা	গল্পগুচ্ছ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	দিদি	গল্পগুচ্ছ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	মানভঞ্জন	গল্পগুচ্ছ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	মধ্যবর্তিনী	গল্পগুচ্ছ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	স্ত্রীরপত্র	গল্পগুচ্ছ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	পয়লা নম্বর	গল্পগুচ্ছ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ল্যাবরেটরী	গল্পগুচ্ছ
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মন্দির	শরৎ রচনা সমগ্র (২য় খন্ড)
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ছবি	শরৎ রচনা সমগ্র (২য়খন্ড)
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	সুবেহ সাদেক	রেকেয়া রচনা সমগ্র
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	অবরোধবাসিনী	রেকেয়া রচনা সমগ্র
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	সুগৃহিনী (মতিচুর ১ম খণ্ড)	রেকেয়া রচনা সমগ্র

Dhaka University Institutional Repository

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	তুচ্ছ	গল্প সমগ্র
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	পিদিমের নীচে	গল্প সমগ্র
সৈয়দ মুজতব আলী	নোনামিঠ	শ্রেষ্ঠ গল্প
কাজী নজরুল ইসলাম	নারী	কাব্য সঞ্চয়ন
কাজী নজরুল ইসলাম	ব্যথার দান	ব্যথার দান
কাজী নজরুল ইসলাম	রাক্ষুসী	রিক্তের বেদন
কাজী নজরুল ইসলাম	হেনা	ব্যাথার দান
কাজী নজরুল ইসলাম	রিক্তের বেদন	রিক্তের বেদন
কাজী নজরুল ইসলাম	মেহেরনিগার	রিক্তের বেদন
কাজী নজরুল ইসলাম	স্বামীহারা	রিক্তের বেদন
কাজী নজরুল ইসলাম	পদ্ম-গোখ্‌রো	রিক্তের বেদন
মানিক বন্দ্যোপধ্যায়	প্রাগৈতিহাসিক	প্রাগৈতিহাসিক
আবুল মনসুর আহমদ	হুজুর কেবলা	আয়না
আবু ইসহাক	ঘুপচিগলির সুখ	হারেম
আবু ইসহাক	কানাভুলা	হারেম
আলাউদ্দিন আল আজাদ	শিউলিঝরা দরোজা	আমার রক্ত স্বপ্ন আমার
সৈয়দ শামসুল হক	যারা বেঁচে আছে	প্রাচীন বংশের নিঃ স্বসন্তান
রাহাত খান	অরণ্য মৃত্যু	অনিশ্চিত লোকালয়
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	উৎসব	অন্য ঘরে অন্য স্বর
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	দুধেভাতে উৎপাত	অন্য ঘরে অন্য স্বর
আবদুল মন্নান সৈয়দ	জলপরি	চলোযাই পরোক্ষে
আবদুল মন্নান সৈয়দ	বাঘ	মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা
শওকত ওসমান	জননী, জন্মভূমি	জন্ম যদি তব বঙ্গে
রাবেয়া খাতুন	মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী	মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী

Dhaka University Institutional Repository

২. পুরুষের পৃথিবীতে নারী

গল্পকার	গল্প	গ্রন্থ
১. খালেদা এদিব চৌধুরী	বনকেউটে	নির্বাচিত গল্প
২. সেলিনা হোসেন	বৈশাখী গান	উৎস থেকে নিরন্তর, গল্প সমগ্র
৩. ঝর্ণা রহমান	জীবনের জল ও অনল	ঘুম-মাছ ও এক টুকরো নারী
৪. দিলারা হাশেম	পরিচয়	গল্প সমগ্র-১
৫. নাজমা জেসমিন চৌধুরী	বাপের বাড়ি	গল্প সমগ্র
৬. সেলিনা হোসেন	হৃদয় ও শ্রমের সংসার	মতিজানের মেয়েরা গল্প সমগ্র
৭. হেলেনা খান	সুন্দর দুটো আঁখি ও সূক্ষ্ম একটা ধূলিকনা	বৃষ্টি যখন নামল
৮. সেলিনা হোসেন	ইজ্জত	মতিজানের মেয়েরা
৯. সেলিনা হোসেন	লিপিকার বিয়ে এবং অত:পর	মতিজানের মেয়েরা
১০. ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ	অর্ক ও সিংহদ্বার	প্রমীলা সুন্দরী মালতী মালা থেকে মোনা রায়
১১. সেলিনা হোসেন	পারুলের মা হওয়া	মতিজানের মেয়েরা
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শাস্তি	গল্পগুচ্ছ
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	উদ্ধার	গল্পগুচ্ছ
১৪. নাসরীন জাহান	পুরুষ	নির্বাচিত গল্প
১৫ নাসরীন জাহান	ল্যাম্প পোস্টের নীচে	সূর্য তামসী
১৬. অনামিকা হক লিলি	উচ্ছিত্তি	নিলম্বন

Dhaka University Institutional Repository

১৭. অনামিকা হক লিলি	অবিভাজ্য যাতনা	নিলম্বন
১৮. অনামিকা হক লিলি	নিলম্বন	নিলম্বন
১৯. অনামিকা হক লিলি	শীতল বিরূপ	নিলম্বন
২০. অনামিকা হক লিলি	স্বাতী	নিলম্বন
২১. সেলিনা হোসেন	কুন্তলা অন্ধাকার	নারীর রূপকথা
২২. সেলিনা হোসেন	রইস্যা চোর	অনূঢ়া পূর্ণিমা
২৩. সেলিনা হোসেন	মর্গ	অনূঢ়া পূর্ণিমা
২৪. সেলিনা হোসেন	বিধবা	নারীর রূপকথা
২৫. মকবুলা মনজুর	জীবন আমার ভালবাসা	নক্ষত্রের তলে
২৬. মকবুলা মনজুর	শীতার্ত জোৎস্না	নক্ষত্রের তলে
২৭. রাজিয়া মজিদ	নাস্তিক	ভালবাসার সেই মেয়েটি
২৮. ঝর্ণা রহমান	দেবভূমিতে কয়েকজন মানবী	অগ্নিতা
২৯. ঝর্ণা রহমান	ট্রাফিক জ্যাম একটি মৃত্যু ও কয়েকটি বালিহাস	অগ্নিতা
৩০. মাফরুহা চৌধুরী	শেষ উপহার	কোথাও ঝড়
৩১. মাফরুহা চৌধুরী	সতর্ক থাকবো	কোথাও ঝড়
৩২. পূরবী বসু	আত্মরক্ষার দশ উপকরণ	নিরুদ্ধ সমীরণ
৩৩. পাপড়ি রহমান	মানা ও কুকুর বিষয়ক জটিলতা	হলুদ মেয়ের সীমান্ত
৩৪. মাফরুহা চৌধুরী	নিঃশর্ত করতালি	নিঃশর্ত করতালি

Dhaka University Institutional Repository

৩. সনাতন নারী ভাবনা বনাস আধুনিকতার দ্বন্দ্ব

১. সেলিনা হোসেন	মতিজানের মেয়েরা	মতিজানের মেয়েরা
২. সেলিনা হোসেন	লিপিকার বিয়ে এবং অতঃপর	মতিজানের মেয়েরা
৩. সেলিনা হোসেন	ইচ্ছার বাগান কবিতা আমার ভালোবাসা	মতিজানের মেয়েরা
৪. ঝর্ণা রহমান	জীবনের জল ও অনল	ঘুম-মাছ ও এক টুকরো নারী
৫. ঝর্ণা রহমান	বিন্দুর বৈধব্য	ঘুম-মাছ ও এক টুকরো নারী
৬. খালেদা এদিব চৌধুরী	ফেরা	নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ
৭. হেলেনা খান	দুই দিগন্ত	কারাগারের ভেতরে ও বাইরে
৮. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সতী	শরৎ রচনা সমগ্র ২য় খণ্ড
৯. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	দর্পচূর্ণ	শরৎ রচনা সমগ্র ২য় খণ্ড
১০. নাসরীন জাহান	জনক	নির্বাচিত গল্প
১১. লায়লা সামাদ	অমূর্ত আকাঙ্খা	অমূর্ত আকাঙ্খা
১২. নাসরীন জাহান	ঈর্ষা	নির্বাচিত গল্প
১৩. মকবুলা মনজুর	প্রিয় লেখিকা	নক্ষত্রের তলে
১৪. হেলেনা খান	বৃষ্টি যখন নামল	বৃষ্টি যখন নামল

Dhaka University Institutional Repository

৪. নারীর নিজের ঘর নিজের পৃথিবী

গল্পকার	গল্প	গ্রন্থ
১. দিলারা হাশেম	দিন যায় রাত আসে	গল্প সমগ্র
২. নাসরীন জাহান	এলেনপোর বিড়াল	নির্বাচিত গল্প
৩. দিলারা হাশেম	মেহেদী	গল্প সমগ্র
৪. হেলেনা খান	আমি কাঁদতে চেয়ে ছিলাম	বৃষ্টি যখন নামল
৫. রাবেয়া খাতুন	ভালোবেসেছিলাম	মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী
৬. রাজিয়া মজিদ	পাপী	ভালবাসার সেই মেয়েটি
৭. মকবুলা মনজুর	শকুনেরা সবখানে	শকুনেরা সবখানে
৮. খালেদা এদিব চৌধুরী	চেনা ঘর অচেনা মানুষ	অন্য এক নির্বাসন
৯. পাপড়ি রহমান	অন্ধকারে চন্দ্রের দহন	হলুদ মেয়ের সীমান্ত
১০. সেলিনা হোসেন	বৈধব্য	মতিজানের মেয়েরা
১১. সেলিনা হোসেন	মুখ	মতিজানের মেয়েরা
১২. সেলিনা হোসেন	মেয়েলোকটা	মতিজানের মেয়েরা
১৩. সেলিনা হোসেন	আকালীর স্টেশন জীবন	মতিজানের মেয়েরা
১৪. সেলিনা হোসেন	ঘর	অবেলা দিনক্ষণ
১৫. সেলিনা হোসেন	অরণ্য কুসুম	নারীর রূপকথা
১৬. লায়লা সামাদ	আলোকিত অন্বেষণ	অমূর্ত আকাঙ্খা
১৭. ঝর্ণাদাশ পুরকায়স্থ	মুখ ফেরানো দিন	প্রমীলা সুন্দরী মালতী মালা থেকে মোনা রায়
১৮. লায়লা সামাদ	অমূর্ত আকাঙ্খা	অমূর্ত আকাঙ্খা

Dhaka University Institutional Repository

১৯. নাসরীন জাহান	আমাকে আসলে কেমন দেখায়	নির্বাচিত গল্প
২০. পূরবী বসু	দুঃসময়ের অ্যালবাম	নিরুদ্ধ সমীরণ
২১. মকবুলা মনজুর	অবিচ্ছেদ্য	দিন রজনী
২২. মাফরুহা চৌধুরী	আকাশে উদ্যান	নিঃশর্ত করতালী
২৩. মাফরুহা চৌধুরী	কোথাও ঝড়	কোথাও ঝড়
২৪. রাজিয়া মজিদ	সূর্য ওঠে	ভালোবাসার সেই মেয়েটি
২৫. রাজিয়া মজিদ	চাকা	ভালোবাসার সেই মেয়েটি
২৬. পাপড়ি রহমান	মধ্য রাতের ট্রেন	হলুদ মেয়ের সীমান্ত
২৭. মকবুলা মনজুর	তৃষ্ণার্ত ধরিত্রী	সায়াহ্ন যুথিকা
২৮. হেলেনা খান	রঙ-ধনু আঁকা ছবি	ফসলের মাঠ
২৯. মাফরুহা চৌধুরী	ঝিনুকের মালা	নিঃশর্ত করতালি
৩০. হেলেনা খান	আমার মেয়ের মুখ	কালের পুতুল

৫. নারীর পরিসর গৃহ ও বাইরের জগতের দ্বন্দ্ব

গল্পকার	গল্প	গ্রন্থ
১. দিলারা হাশেম	দিনযায় রাত আসে	গল্প সমগ্র
২. হেলেনা খান	বিসর্পিল	বৃষ্টি যখন নামল
৩. হেলেনা খান	অনাহূত ইচ্ছা	বৃষ্টি যখন নামল
৪. হেলেনা খান	সূর্যোদয়	কারাগারের

Dhaka University Institutional Repository

		ভেতর ও বাইরে
৫. হেলেনা খান	ধুপছায়া	কালের পুতুল
৬. হেলেনা খান	স্ফুলিঙ্গ	ফসলেরমাঠ
৭. হেলেনা খান	সাগর শুকায়ে যায়	ফসলেরমাঠ
৮. রাবেয়া খাতুন	মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী	মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী
৯. মকবুলা মনজুর	নক্ষত্রের তলে	নক্ষত্রের তলে
১০. কাজী নজরুল ইসলাম	অগ্নিগিরি	রিক্তের বেদন
১১. আকিমুন রহমান	নিরেট সত্য অথবা প্রতিভাসের গল্প	জীবনে পুরোনো বৃত্তান্ত
১২. সরদার জয়েন উদ্দিন	গোলাপী সংসার	বীর কণ্ঠীর বিয়ে
১৩. সেলিনা হোসেন	দুরকম যুদ্ধ	মতিজানের মেয়েরা
১৪. লায়লা সামাদ	মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ	অমুর্ত আকাঙ্খা
১৫. নাসরীন জাহান	কাঁটাতার	নির্বাচিত গল্প
১৬. নাসরীন জাহান	দাহ	নির্বাচিত গল্প
১৭. নাসরীন জাহান	বিকার	বিচূর্ণ ছায়া
১৮. পূরবী বসু	মহীলতা	নিরুদ্ধ সমীরণ
১৯. পাপড়ি রহমান	হলুদ মেয়ে সীমান্ত	হলুদ মেয়ে সীমান্ত
২০. ঝর্ণা রহমান	ক্রসিং	অগ্নিতা
২১. মকবুলা মনজুর	তুফান	শকুনেরা সবখানে

Dhaka University Institutional Repository

৬. পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নারীর আর্থ -সামাজিক জীবনৎ

গল্পকার	গল্প	গ্রন্থ
১. নাজমা জেসমিন চৌধুরী	অন্যনায়ক	গল্প সমগ্র
২. নাজমা জেসমিন চৌধুরী	পরের ঘর	গল্প সমগ্র
৩. হেলেনা খান	মানদণ্ড	কারাগারের ভেতরে ও বাইরে
৪. পাপড়ি রহমান	শ্যাওলা রেখেছে জমা রৌদ্র ও শিশির	হলুদ মেয়ের সীমান্ত
৬. সেলিনা হোসেন	নদে এলো বান	মতিজানের মেয়েরা, গল্প সমগ্র
৭. সেলিনা হোসেন	লিপিকার বিয়ে এবং অতপর	মতিজানের মেয়েরা, গল্প সমগ্র
৮. সেলিনা হোসেন	ঘোষণা	নারীর রূপকথা
৯. সেলিনা হোসেন	জেসমিনের ইচ্ছে পূরণ	নারীর রূপকথা
১০. আবু ইসহাক	কানাভুলা	হারেম
১১. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	অবরোধবাসিনী	রোকেয়া রচনাবলী
১২. পূরবী বসু	আঁধার এল বলে	নিরুদ্ধ সমীরণ
১৩. রাজিয়া মজিদ	জরির দিন	ভালাবাসার সেই মেয়েটি
১৪. মকবুলা মনজুর	সর্পিল	নক্ষত্রের তলে
১৫. মকবুলা মনজুর	সঘন সর্বরী	নক্ষত্রের তলে
১৬. মকবুলা মনজুর	জলোহাওয়ার গন্ধ	দিন রজনী
১৭. মকবুলা মনজুর	ফসলের মাঠ	ফসলের মাঠ
১৮. মকবুলা মনজুর	একটি মৃত্যু সংবাদ	শকূনেরা সবখানে

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

মহিলা গল্পকারদের গল্পগ্রন্থ

১। সেলিনা হোসেন, গল্পসমগ্র, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা-২০০২, সময় প্রকাশন, ঢাকা

২। ঝর্ণা রহমান, ঘুম, মাছ ও এক টুকরো নারী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রু-২০০২ ঐতিহ্য, ঢাকা

৪। খালেদা এদিব চৌধুরী, নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ, বইমেলা-২০০২, শোভা প্রকাশ, ঢাকা

৫। অনামিকা হক লিলি, নিলম্বন, জানুয়ারী-১৯৮৩, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা

৬। দিলারা হাশেম, গল্প সমগ্র, ফেব্রুয়ারী-২০০১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

৭। নাসরিন জাহান, নির্বাচিত গল্প, বইমেলা-২০০২, অন্য প্রকাশ, ঢাকা

৮। পাপড়ি রহমান, হলুদ মেয়ের সীমান্ত, ফেব্রুয়ারী-২০০১, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা

৯। ঝর্ণাদাশ পুরকায়স্থ, প্রমীলা সুন্দরী মালতী মালা থেকে মোনা রায়, প্রথম প্রকাশনী বইমেলা-২০০২, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা

১০। হেলেনা খান, বৃষ্টি যখন নামলো, মে-১৯৭৮, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা

১১। হেলেনা খান, কালের পুতুল, অক্টোবর-১৯৭৮, মুক্তধারা, ঢাকা

১২। হেলেনা খান, কারাগারের ভেতরে ও বাইরে, ফেব্রুয়ারী-২০০০, মধুকুঞ্জ প্রকাশনী, ঢাকা

১৩। নাসরীন জাহান, বিচূর্ণ ছায়া. ফেব্রু-১৯৮৮, রূপম প্রকাশনী, ঢাকা

১৪। হেলেনা খান, ফসলের মাঠ, অক্টোবর-১৯৮৯, বুক ভিলা, ঢাকা

১৫। রাবেয়া খাতুন, মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৬, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা

১৬। রাজিয়া মজিদ, ভালবাসার সে মেয়েটি, প্রথম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৫, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা

১৭। মকবুলা মনজুর, দিন রজনী, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৩, বস্তু প্রকাশন, ঢাকা,

Dhaka University Institutional Repository

১৮। মকবুলা মনজুর, নক্ষত্রের তলে, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৯, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা

১৯। মকবুলা মনজুর, শকুনেরা সবখানে, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৮, চিশতিয়া আর্ট প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা

২০। মকবুলা মনজুর, সায়াহ্ন যূথিকা, জুন -১৯৭৮, মুক্তধারা, ঢাকা

২১। পূরবী বসু, নিরুদ্ধ সমীরণ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৬, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

২২। মাফরুহা চৌধুরী, নিঃশর্ত করতালি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী-১৯৮৪, মৌসুমী পাবলিশার্স, ঢাকা

২৩। লায়লা সামাদ, অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর-১৯৭৮, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা

২৪। নাজমা জেসমিন চৌধুরী, গল্প সমগ্র, ফেব্রুয়ারী-২০০২, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা

২৫। মাফরুহা চৌধুরী, কোথাও ঝড়, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৮০, মৌসুমী পাবলিশার্স, ঢাকা

২৬। আকিমুন রহমান, জীবনের পুরোনো বৃত্তান্ত, ফেব্রুয়ারী-২০০৭, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা

২৭। সেলিনা হোসেন, নারীর রূপকথা, প্রকাশক: মনিরুল হক, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী-২০০৭, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা।

২৮। সেলিনা হোসেন, অবেলার দিনক্ষণ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী-২০০৯, অন্বেষা প্রকাশনী, ঢাকা

২৯। নাসরীন জাহান, সম্ভ্রম যখন অশ্লিল হয়ে উঠে, জানুয়ারী-১৯৯৭, অন্য প্রকাশ, ঢাকা

৩০। নাসরীন জাহান, সূর্য তামসী, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৯, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা

৩১। নাসরীন জাহান, পথ হে পথ, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৯, অনিন্দ্য প্রকাশনা, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থঃ

১. সিমোন দ্য বোভোয়ার — দ্বিতীয় লিঙ্গ (হুমায়ুন আজাদ অনূদিত), দ্বিতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন-১৪০৮, ফেব্রুয়ারী- ২০০২, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

২. হুমায়ুন আজাদ — নারী, তৃতীয় সংস্করণ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ়-১৪১০, জুলাই-২০০৪, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

৩. মাহমুদা ইসলাম — নারীবাদী চিন্তা ও নারীজীবন, এপ্রিল-২০০২, জে,কে প্রেস, এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা

৪. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক — সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (চতুর্থ সংস্করণ), ১৯৯৮ সাহিত্য, সঙ্কলিত সংসদ, কলকাতা।

৫. মাহমুদা ইসলাম — নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ছিন্নপত্র, শ্রাবন ১৩৬৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থনা বিভাগ, কলকাতা

৭. আকিমুন রহমান — বিবি থেকে বেগম, ফেব্রুয়ারী-২০০৫, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা

৮. আনু মুহম্মদ — নারী পুরুষ ও সমাজ, বইমেলা-১৯৯৭, সন্দেশ বই পড়া, ঢাকা

৯. আগস্ট বেবেল — পূর্বাভাষ, নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে, অনুবাদঃ কনক মুখোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ, এপ্রিল-১৯৯০, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা

১০. সম্পাদনায় মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা — পদকর্তা-ভুসুকুপাদানাম ৬নং চর্যাপদ, চর্যাগীতিকা, তৃতীয় সংস্করণ,: শ্রাবন, ১৩৮৭ সন, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — গল্পগুচ্ছ, প্রতীক প্রকাশনী সংস্থা; ১৯৯৮, নভেম্বর, ঢাকা।

১২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — শরৎ রচনা সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), মার্চ-১৯৯৯ সালমা বুক ডিপো, ঢাকা

১৩. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন — রোকেয়া রচনাবলী, আদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী।

১৪.সৈয়দ মুজতবা আলী — শ্রেষ্ঠ গল্প, সম্পাদনা আবুশ শাকুর, ফেব্রুয়ার-২০০৬, বিশ্ব সাহিত্যকেন্দ্র, ঢাকা।

১৫. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — গল্প সমগ্র-১, ৪র্থ মুদ্রণ, শ্রাবন ১৪০১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলতা-৭৩

১৬. কাজী নজরুল ইসলাম — কাব্য সঞ্চয়ন, সম্পাদনা মুহাম্মদ আব্দুল হাই, ২য় সংস্করণ, চিত্র, ১৩৬৮, ষ্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ঢাকা

১৭. কাজী নজরুল ইসলাম — নজরুল রচনা সম্ভার, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী।

১৮. আবুল মনসুর আহমেদ — হুজুর কেবলা, আয়না (১৯৩৫),

১৯. চঞ্চল কুমার বোস — বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ, এপ্রিল ২০০৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

২০. ড. সায়েদাবানু — বাংলাদেশের ছোটগল্পে বাস্তবতার স্বরূপ, সেপ্টেম্বর-২০০০, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা

২১. আবু ইসহাক — হারেম, প্রথম সংস্করণ ১৯৬২, মুক্তধারা, ঢাকা

২২. রাহাত খান — অনিশ্চিত লোকালয়, প্রথম প্রকাশ বাং ১৩৮০, বর্ণবীথি প্রকাশন, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস — অন্য ঘরে অন্য স্বর, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৬, অনন্যা, ঢাকা

২৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ — চলো যাই পরোক্ষে, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল-১৯৭৩, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ঢাকা

২৫. শওকত ওসমান — জন্ম যদি তব বঙ্গে, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, মুক্তধারা, ঢাকা

২৬.আজহার ইসলাম — চিরায়ত সাহিত্য ভাবনা, ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

২৭. হাসনা বেগম — নারী ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রু-২০০২, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা

২৮. সরদার জয়েন উদ্দিন — বীরকণ্ঠীর বিয়ে, প্রথম সং বৈশাখ ১৩৬২, প্রকাশক আজিজুর রহমান চৌধুরী, কোহিনুর, লাইব্রেরী, ঢাকা।

২৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার — বাংলাদেশ সংবিধান, ২০০৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা

৩০. সুলতানা কামাল — নারী , মানবাধিকার ও রাজনীতি, ইত্যাদি, ফেব্রুয়ারী-২০১০, গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

৩১. কমলা ভাসীন — পিতৃতন্ত্র কাকে বলে ? অনুবাদঃ দেবারতি সেনগুপ্ত ও পামিতা ব্যানার্জি, স্কুল অফ উইমেনস্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত' ১৯৯৫ সেপ্টেম্বর, স্ত্রী ॥ কলকাতা ৭০০ ০২৬

৩২. রাসসুন্দরী দেবী — আমার জীবন, ১২৮৩, সূচারু যন্ত্র, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. শাশ্বতী ঘোষ	আর্ধেক অর্থনীতি, ১৯৯৭, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
৩৪. শাহীন রহমান	জেণ্ডার প্রসঙ্গে, ১৯৯৮, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, টাকা।
৩৫. সুজিৎ চৌধুরী	প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রধান্য, কিংবদন্তীর পুনবিচার, ১৯৯০, প্যাপিরাস, কলকাতা
৩৬. সুকুমারী ভট্টাচার্য	প্রাচিন ভারতে সমাজ ও সাহিত্য, ১৪০১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
৩৭. সোনিয়া নিশাত আমিন	বাঙ্গালী মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন (১৮৭৬-১৯৩৯), (অনুবাদঃ পাপড়ীন নাহার), ২০০২, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।
৩৮. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান	নারীর ক্ষমতায়ন রাজনীতি ও আন্দোলন (সম্পাদনা), ২০০৩ মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
৩৯. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান	বাংলাদেশের নারী ও সমাজ সম্পাদনা, ২০০৪, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
৪০. সুশীল কুমার গুপ্ত	নজরুল চরিত মানস, দে' জ পাবলিশার্স, ৩য় সংস্করণ, এপ্রিল-১৯৭৭, কলকাতা
৪১. জুলফিয়া ইসলাম,	সমাজ সংস্কৃতিতে নারী প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী- ২০০১, বিদ্যা প্রকাশ,
৪২. সৈয়দ আকরাম হোসেন	বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী- ১৯৮৫, ফাল্গুন - ১৩৯১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।
৪৩. শিশির কুমার দাশ	বাংলা ছোটগল্প, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা
৪৪. ড. ঊর্মি নন্দী	বণফুলঃ জীবন, মন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, করুনা প্রকাশনী, কলকাতা-৯,

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — সাহিত্য, ভাদ্র-১৩৮৮, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থবিভাগ কলিকাতা।

৪৬. শহিদুজ্জামান সম্পাদিত — পারিবারিক সহিংসতা (একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট) প্রকাশক: নিউজ নেটওয়ার্ক, ধানমণ্ডি, ঢাকা, জুলাই- ২০০২ ঢাকা

৪৭. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, — নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী-১৯৭৬, মুক্তধারা, ঢাকা,

৪৮. আজহারউদ্দীন খান, — বাংলা সাহিত্যে, নজরুল, ডি.এম, লাইব্রেরী, কলকাতা পঞ্চম সংস্করণ আশ্বিন, ১০৮০

৪৯. মুহম্মদ আব্দল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় সংস্করণ, জুন, ১৯৫৬, বইঘর, চট্রগ্রাম।

৫০. মুহাম্মদ মজির উদ্দিন, — রবীন্দ্র-ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশ চেতনা, বাংলা একাডেমী, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ ঢাকা।

৫১. আনোয়ার পাশা — রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা, ১৩৭৮ প্রথম খণ্ড, ইস্ট পাকিস্তন পাবলিশার্স , ঢাকা।

৫২. শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, — শরৎচন্দ্র (শরৎ সাহিত্যের আলোচনা), দ্বাদশ সংস্করণ, অগ্রহায়ন-১৩৮৪, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রা: লি:, কলিকাতা

৫৩. নাঈমা রহমান সম্পাদনা: ড. সৈয়দ আলী নকী — আর. এম. ম্যাকাইভারের সামাজিক বিজ্ঞানের মূলসূত্র অনুবাদ, ১ম ফেব্র-১৯৮৯, নও রোড কিতাবিস্তান, ঢাকা।

৫৪. সৈয়দ মুজতবা আলী — শ্রেষ্ঠ গল্প, সম্পাদনা আব্দুল শাকুর, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, মাঘ-১৪১২, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা

৫৫. মোরশেদ শফিউল হাসান, — বেগম রোকেয়া: সময় সাহিত্য, এপ্রিল, ১৯৮২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫৬. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ — লেখক অভিধান, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৮, বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান সম্পাদক — একাডেমী, ঢাকা।

৫৭. সম্পাদনা ভূঁইয়া ইকবাল — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মে ১৯৭৫।

৫৮. বশীর আলহেলাল — তাঁদের সৃষ্টির পথ, জুন-১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫৯. শহীদুজ্জামান (সম্পাদিত) — আমাদের অধিকার, মে- ২০০৭, নিউজ নেটওয়ার্ক, ঢাকা।

৬০. সেলিনা হাসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত — জেণ্ডার বিশ্বকোষ, ফেব্রুয়ারী ২০০৬, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৬১. উর্মি রহমান — পাশ্চাত্যে নারী আন্দোলন ২০০২, সাহিত্য প্রকাশ,ঢাকা

৬২. গোলাম মুরশিদ — রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়াঃ নারী প্রগতির একশ বছর, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী

৬৩. তাসলিমা নাসরিন — নির্বাচিত কলাম, ১৯৯২, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা

৬৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ — আমাদের সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল-১৯৯১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৬৫. নীরু কুমার চাকমা — অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, প্রথম পুনমুর্দ্রণ-অক্টোবর-১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক প্রবন্ধঃ

১. রাশিদা আখতার খানম — নারীবাদী চিন্তা ও মতিজানের মেয়েরা, উলুখাগড়া, সম্পাদক: সৈয়দ আকরাম হোসেন, প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১২, ফেব্রুয়ারী-২০০৬, সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, ঢাকা

২. গীতি আরা নাসরীন — বিটিভি বিজ্ঞাপনের রাজনৈতিক অর্থনীতি : একটি লৈঙ্গিক বিশ্লেষণ, রাজনীতি অর্থনীতি জার্নাল, সম্পাদক, ফেরদৌস হোসেন, পঞ্চম সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন ১৯৯৯, রাজনীতি গবেষণা কেন্দ্র, কক্ষ নম্বর- ১০৪৬, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. ড. সায়েদা বানু — পঁচিশ বছরের বাংলাদেশের ছোটগল্প, একুশের প্রবন্ধ-১৯৯৭, প্রকাশ আশফাক-উল-আলম জুন-৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৪. বশীর আল হেলাল — বাংলাদেশের ছোটগল্প, একুশে নির্বাচিত প্রবন্ধ (১৯৬৩-১৯৭৬), সংকলিত ও সম্পাদিত- মোবারক হোসেন, জুন-১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৫. ফারজানা সিদ্দিকা — শিক্ষিত নারীর মাথার ভেতর ভিন্ন রকম ভায়োলেন্স, নাগরিক উদ্যোগ বার্তা, চতুর্থ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, অক্টো-ডিসে-২০০৪

৬. মালেকা বেগম — নারীর জন্য বিশেষ আইন শিকল ছাড়া কিছুই নয়, কালি ও কলম, ১ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৪.

৭. সম্পাদনা; সরদার ফজলুল করিম — আমাদের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ১৯৬৯, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৮. মোবারক হোসেন সংকলিত ও সম্পাদিত — একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ(১৯৬৩-১৯৭৬) জুন ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

৯. আকিমুন রহমান — আমাদের উপন্যাসে নারী ভাবমূর্তি, একুশের প্রবন্ধ ৯৫, শামসুজ্জামান খান প্রকাশক, জুন ১৯৯৫ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১০. মঈন চৌধুরী — ভাষাভিত্তিক সাহিত্য-সমালোচনাতত্ত্ব প্রসংগঃ সাহিত্যে তার প্রয়োগ, উলুখাগড়া, সম্পাদক সৈয়দ আকরাম হোসেন, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী-২০০৬ সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক।

১১. বিশ্বজিৎ ঘোষ — বাংলা ছোটগল্পঃ রূপ-রূপান্তর, একুশের প্রবন্ধ ১৯৯৯, প্রকাশক, সেলিনা হোসেন, জুন ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১২. — একুশের প্রবন্ধ ১৯৯৭, জুন ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১৩. সম্পাদক মনসুর মুসা — বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৪৬ বর্ষঃ ২-৪ এবং ৪৭বর্ষঃ ১-২ সংখ্যা, জুলাই ২০০২-জুন ২০০৩ প্রকাশকাল- জুন ২০০৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১৪. বশীর আল হেলাল — বাংলাদেশের ছোটগল্প, একুশে নির্বাচিত প্রবন্ধ (১৯৬৩-১৯৭৬), জুন-১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১৫. আহমেদ কবির — স্বাধীনতা- উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তরঃ বিষয় ও প্রকরণ, প্রসঙ্গ-ছোটগল্প, একুশের প্রবন্ধ '৮৮, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন-১৩৯৪, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা